ত্রিপর্ণা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনায়

আদিত্য প্রকাশালয়

২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
সাধন বিশ্বাস
বি, বি, বুক কনসার্ন
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

বর্ণসংস্থাপনা ঃ
বাণীপীঠ গ্রন্থালয়
২০৬, বিধান সরণী
কলকাতা—৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ
হিন্দুস্থান আর্ট ইনগ্রেভিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
২৪, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, "শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়"। তাঁর ভিন্ন স্বাদের তিনখানি উপন্যাস ফেরিঘাট, ভুলসত্য ও নয়ন শ্যামা একত্রে "ত্রিপর্ণা" নামে প্রকাশ করা হলো। আশা করি পাঠক- পাঠিকারা বইখানি পড়ে মুগ্ধ হবেন।

"প্রকাশক"

সূচীপত্র



ফেরিঘাট

সিঁড়ির তলা থেকে স্কুটারটা টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করাল মধু, তার হাতে পালকের ঝাড়ন। মুছবে। মুছলেও খুব একটা চক্‌চকে হয় না আজকাল। রঙটা জ্বলে গেছে, এখানে ওখানে চটা উঠে গেছে। বেশ পুরনো হয়ে গেল স্কুটারটা।

জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় স্কুটারটা একটুক্ষণ অন্যমনে দেখল অমিয়। বহুকালের সঙ্গী। মায়া পড়ে গেছে। কল্যাণ তিন হাজার টাকা দর দিতে চেয়েছিল। জিনিসটা ইটালীয়ান বলে নয়, মায়া পড়ে গেছে বলেই বেচেনি অমিয়। তা ছাড়া একবার বেচে দিলে নতুন আর কেনা হবে না। অমিয়র দিন চলে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় টেবিলে সাজানো একপ্লেট টোস্ট, একটা আধসেদ্ধ ডিম, একগ্লাস দুধ, নুন-মরিচের কৌটো, চামচ—এসব আবার দেখে। সকাল আটটা কি সোয়া আটটা এখন। সাড়ে আটটায় সে রোজ বেরোয়। বেরোবার আগে সে রোজ টোস্ট ডিম নুন-মরিচ দিয়ে খায়। দুধ পান করে। আজ কিন্তু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেও তার অনিচ্ছা হচ্ছিল। খিদে নেই। বমি-বমি ভাব। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, বার বার উঠে সিগারেট খেয়েছে। সকালে অনেকক্ষণ স্নান করেছে চৌবাচ্চা খালি করে। তবু শরীর ঠিকমত ঠাণ্ডা হয় নি। খাওয়ার কথা এখন ভাবাই যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি রোজকার মত হাসি বসে নেই। শোয়ার ঘরের দরজায় হাসি দাঁড়িয়ে আছে: কাল রাতে হাসিও বোধহয় ঘুমোয়নি। ঘুমোলে যে ছোট ছোট অবিরল শ্বাস পড়ে ওর, সেই শব্দ তো কৈ শোনে নি অমিয়। বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরী ভারী সুন্দর একটা খাট শখ করে কিনেছিল হাসি, যখন অমিয়র সুদিন ছিল। পুরনো বড় খাটটা বেচে দিয়ে অমিয় কিনে নিল একটা সোফা-কাম-বেড। সেই থেকে দুজনের বিছানা আলাদা। বেতের খাটে হাসি, সোফা-কাম-বেডে অমিয়। সেইটাই কি

মারাত্মক ভুল হয়েছিল?

বস্তুত তো ছোটবেলা থেকেই অমিয় যৌথ পরিবারে মানুষ। সেখানে বড় খাটের সঙ্গে আর একখানা বড় খাট জোড়া দেওয়া। বিশাল মাঠের মত বিছানা, শামিয়ানার মত বড় মশারি। দাদু ঠাকুমা শুতো, আর সেই সঙ্গে তার রাজ্যের ছেলেপুলে। পরিবারের অর্ধেক এক বিছানায়। যারা সেই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছে তারা আজও কেউ একে অন্যের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় নি, যে যার কাজের ধান্দায় আলাদা হয়ে ভিন্ন সংসার করেছো, দাদু ঠাকুমা মরে গেছে কবে। তবু সেই প্রকাণ্ড বিছানার স্মৃতি আজও অমিয়র পিসতুতো, মাসতুতো, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, ভাই আর বোনদের কাছ থেকে খুব দূরে সরাতে পারে নি। দেখা হলে সবাই অকৃত্রিম খুশী হয়, এক-আধবেলা জোর করে ধরে রাখে, প্রাণপণে খাওয়ায়, কত পুরনো দিনের গল্প হয়।

অমিয় খেতে পারছে না। একদম না। একটা টোস্ট মুখে তুলে দেখল। ভাল টোস্ট হয়েছে, মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে দাঁতের চাপে। তবু অমিয়র কাছে কাঠের গুঁড়োর মত বিস্বাদ লাগে। ডিমটা থেকে আঁশটে গন্ধ আসে। দুধটাকে খড়িগোলা মনে হয়। অমিয় টোস্ট হাতে ধরে রেখে একবার চেষ্টা করে হাসির দিকে তাকায়। আসলে তাকাতে তার ভয় করছিল।

চোখে চোখ পড়ে। হাসির কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে অমিয় খুব কমই দেখেছে। অমিয়কে কখনো হাসি সমীহ করে নি। আজ পর্যন্ত বলতে গেলে হাসি সঠিক বৌ হয় নি অমিয়র। ইচ্ছে হয় নি বলে হাসি সন্তান-ধারণ করল না আজ পর্যন্ত। না করে ভালই করেছে। তাহলে এখন অসুবিধে হত। হাসি তাই অমিয়র চোখে সোজা চোখ রাখতে পারে। ভয় পায় না। অমিয়র কাছে তার কোন দায় নেই।

—আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। হাসি সকালে এই প্রথম কথা বলে।

অমিয় ভ্রূ তুলে বলে—কী বললে?

হাসি বলে—আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। এখানে তো আমার নিজস্ব কিছু নেই।

—কী নেবে?

—এই কয়েকটা শাড়ি ব্লাউজ, সাজগোজের জিনিস, একটা স্যুটকেস, কয়েকটা টাকা.....

অমিয় শান্ত গলায় বলে—নিও। বলার দরকার ছিল না।

—বলেই নেওয়া ভাল। দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। দরকার ফুরোলে ফিরিয়ে দেব।

শরীরের ভিতরটা চিড়বিড় করে অমিয়র। কিন্তু কিছু বলে না। বলা মানেই আবার অশান্তি। ছোট কথার ঢিল ছুঁড়ে হাসি দেখতে চায় মজা পুকুরটায় কি রকম ঢেউ ওঠে। মজা পুকুর ছাড়া অমিয় নিজেকে আর কিছু ভাবতে পারে না।

হাসি আবার বলে—এ সংসারে আমি তো কিছু নিয়ে আসি নি, কাজেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অমিয় উঠল। টেবিলে তার টোস্ট ডিম আর দুধের ওপর মাছি উড়তে লাগল, বসতে লাগল।

স্কুটারটা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় জানালা দিয়ে একবার দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেয়। দরজার ওপর একটা ছবি টাঙানো আছে। ছবির চারধারে একটা মালা কবে টাঙানো হয়েছিল, মালাটা গত বছরখানেক ধরে শুকিয়ে এখন রুদ্রাক্ষের মালার মত দেখায়। ছবিতে ধুলো পড়েছে। বেরোবার সময়ে রোজই একবার ছবিটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে বেরোয় সে। একবার হাতজোড় করার ভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

আজও তাকাল।

বেরোবার মুখে দরজা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—যা খুশী নিয়ে যাও।

হাসি বলল—যা খুশী নেব কেন? যা না হলে চলবে না সে রকম দু-একটা জিনিস ধার নেব। আবার ফিরিয়ে দেব।

অমিয় বলল—আচ্ছা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আর হাসির কথা মনে থাকে না। দু-চারদিন বৃষ্টির পর গরম কমে গেছে। আকাশ গভীর নীল। বাতাস পরিষ্কার। স্কুটারটা মৃদু গোঙানির শব্দ করে ছুটছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে যত অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়ে দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে দেয়। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে কালো রাস্তা। কলকাতার এক রকম সুন্দর গন্ধ আছে। বর্ষার পর রোদ উঠলে প্রায়ই গন্ধটা পায় সে। রাস্তার পর রাস্তা পার হয় অন্যমনে।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় তার অফিস। ফুটপাথ থেকেই সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে খাড়া। সিঁড়ির পাশেই ফুটপাথে একটা গেঞ্জী, ব্রেসিয়ার, রুমাল, আণ্ডারওয়্যারের স্টল চালায় আহমদ। অমিয়র স্কুটারটা সারাদিন

সে-ই পাহারা দেয়। রুমালটা আণ্ডারওয়্যারটা আহমদের কাছ থেকেই নেয় অমিয়। বদলে আহমদ স্কুটারটা নজরে রাখে। দরকারে অল্প অল্প টাকা ধার দেয়। অমিয়র দু-চারজন পাওনাদারকেও সে চিনে রেখেছে। নীচের তলা থেকেই তাদের তাড়ায়, বলে—তিনতলার সিঁড়ি খামোখা ভাঙবেন কেন, একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

সিঁড়িটা সত্যিই খাড়া। উঠতে জান্ বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির আট ধাপে একটা ছোট্ট চাতাল। সেই চাতালটা আহমদের একটা সংসার। দুপুরে তার ভাত আসে, কাছেই কোন স্কুলে পড়ে তার দুই ছেলে, টিফিনে তারাও এসে হাজির হয়। চাতালে বসে অন্ধকারে বাপ-ব্যাটারা ভাত খায়। গা ঘেঁষে লোকজন ওঠানামা করে, ধুলো ওড়ে, কাঠের সিঁড়ি কাঁপে, তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাতালের একদিকে আহমদের পোঁটলা-পুঁটলি, দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামাকাপড়, জুতো।

তিনতলায় উঠতে আজ বেশ কষ্ট হল। অফিস বলতে যা বোঝায় তা তো নয়। ঘরটা বড়ই, তার তিন অংশীদার। আসলে ঘরটার মূল ভাড়াটে কল্যাণ। দশ-বারো বছর আগে এই ঘর ভাড়া নিয়ে তৃষ্ণা অ্যাণ্ড কোং খুলেছিল। আজও কোম্পানী আছে, কল্যাণও আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই ঘরে পাশাপাশি টেবিলে আরো দুটো কোম্পানী চালু হয়েছে। একটা রজতের, একটা অমিয়র। তারা দুজন কল্যাণের সাবলেটের ভাড়াটে। একই ঘরে এ-রকম চার-পাঁচটা কোম্পানীও চলে। একটা টেলিফোন আর একটা ঠিকানা থাকলেই কলকাতায় ব্যবসায় নামা যায়।

মিশ্রিলাল বসে আছে। একমাত্র মিশ্রিলালকেই আহমদ কখনো ঠেকাতে পারে নি। ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঠিক তিনতলা পর্যন্ত উঠবেই, উঠে অমিয়কে না দেখলে বসে থাকে, বসে থাকতে থাকতে ঝিমোয়। বিকেল পর্যন্তও বসে থাকে সে। অমিয়কে দেখে মিশ্রি একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। হাতে একটা টেণ্ডারের চিঠি।

রাজের গ্লাসে ঢেকে জল রেখে গেছে। টেবিলে কাগজপত্র প্রায় কিছুই নেই। দুটো চিঠি। টেণ্ডার চিঠি দুটো দেখে রেখে দিল সে। চেয়ার টেনে বসল। রাস্তার ওপারে গভর্নমেণ্টের একটা স্টোর। লরী থেকে মাল খালাস করছে। রাস্তায় ট্রামের শব্দ হচ্ছে, বাস যাচ্ছে। কাচের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে শব্দ আটকাল অমিয়।

মিশ্রি বলল—কিছু দেবেন নাকি?

—ও সপ্তাহে।

—ও বাবাঃ, তিনমাস হয়ে গেল। আমিও মাল তুলতে পারছি না, একজনকে নিয়ে তো আমার কারবার নয়!

—ও সপ্তাহে এসো।

—পুরো চাইছি না, কিছু দিন।

—কোত্থেকে দেব? পেমেণ্ট চারমাস আটকে আছে।

—কেন?

—সেনগুপ্ত চারটে এয়ারকণ্ডিশনিং মেশিন কিনেছিল, চারটে স্ক্র্যাপ। মেশিন আমার অর্ডারে খাইয়ে ঝগড়া করে ক্যাপিটাল তুলে নিলে গেল। তখনো জানতাম না যে স্ক্র্যাপ মেশিন খাইয়ে গেছে প্যাটারসনে। প্যাটারসন থেকে সেদিন চিঠি এসেছে, মেশিন স্ক্র্যাপ, পেমেণ্ট হবে না। সব বিল আটকে রেখেছে। সাত হাজার টাকার।

চুক-চুক করে জিভে একটা ক্ষোভের শব্দ করে মিশ্রিলাল।

—সেনগুপ্ত ডুবিয়ে গেল একেবারে!

অমিয় একটু হাসে। বলে—ডুবিয়ে যাবে কোথায়? ঠিক পেয়ে যাব।

—বিলটার জন্য কবে আসব? আমার তো বেশী নয়, মোটে ন'শো টাকা। আমি গরীব মানুষ।

—মিশ্রি, বিলের আশা ছাড়। বরং আমাকে আরও কিছু ধার দাও। নগদ না দিলে মাল দাও। আমার হাতে তিনটে টেণ্ডার। দুটো লোয়েস্ট হয়েছে, আর একটাও পেয়ে যাব। এখন সেনগুপ্ত নেই, আমি একা। টাকা মার যাবে না।

মিশ্রি গলা চুলকোয়। বলে—তিনমাস পেমেণ্ট পাচ্ছি না। কী যে বলেন। পুরনো লোক বলে ছাড়ছি না আপনাকে। কিন্তু কম্প্রেসারের পার্টসের জন্য লোকে ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে। নগদ টাকার ছড়াছড়ি। এ-সব মাল এখন ক্রেডিটে দেয় কোন বুদ্ধু?

অমিয় জলটা একটু একটু করে খায়। স্বাদটা ভাল লাগে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। গ্লাসটা আবার ঢেকে রেখে বলে—এবার কাটো তাহলে।

—সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

—রোজ আসতে পার। কিন্তু লাভ নেই।

—বললেন যে আসতে। কিছু দেবেন। মোটে তো ন'শো টাকা।

ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঝগড়া করে না। করলে করতে পারত। কিন্তু শান্ত মুখেই উঠে যায়। আবার ঠিক আসবে।

অমিয় নতুন টেণ্ডারের চিঠি দুটো টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে অন্যমনস্ক

ভাবে; ছেঁড়া টুকরোগুলো টেবিলের ওপর সাজায় তাসের মত। চেয়ে থাকে। সেনগুপ্ত কোথাও না কোথাও আছে ঠিক। কলকাতা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, তাতে ডুবসাঁতার কাটা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন দেখা হবেই।

আজ-কালের মধ্যেই হাসি চলে যাবে। আজ বিকেলে বাসায় ফিরবার ইচ্ছে নেই অমিয়র। ফিরে খুব খারাপ লাগবে। হাসি যে কোথায় যাচ্ছে তা অমিয় জানে না। বোধহয় প্রথমে বাপের বাড়ি যাবে আসামে। তারপর বাগনানের কাছে এক গ্রামে, যেখানে ও চাকরি পেয়েছে, আগামী মাস থেকে চাকরি শুরু করবে। তারপর কী করবে হাসি? চাকরি করবে? তারপর? চাকরিই করবে! চাকরিই করে যাবে বরাবর! কিছু মনে পড়বে না! একা লাগবে না। খারাপ লাগবে না!

কল্যাণ টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে! তৃষ্ণা কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন কর্মচারী আউটডোরে ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে কেবল অফিসটা দেখতে হয় আর ইনকাম-ট্যাক্স। কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেলে আর তেমন ভাবনা নেই। রজতের টেবিল খালি। বড় একটা থাকে না রজত, প্রচণ্ড খাটে আর ঘোরে। দাঁড়িয়ে যাবে।

অমিয় নিঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবনা-চিন্তা করার মত মাথার অবস্থা নয়। মনে হয় বেশী ভাবতে গেলেই মাথায় সমুদ্রের মত বিশাল ঢেউ উঠে সে পাগল হয়ে যাবে।

বসে থাকলে এ রকম হবেই, অমিয় তাই উঠল।

কল্যাণ একবার তাকিয়ে বলল—কোন দিকে যাচ্ছেন?

—যাই একবার প্যাটারসনে। ওদের কাল মিটিং গেছে। লাহিড়ী বলছিল একটা ডিসিশন হবেই। যদি কিছু হয়ে থাকে দেখে আসি।

—মিশ্রিলাল কত পায়?

—ন'শো।

—গতকাল আমি একটা পেমেণ্ট পেয়েছি। শ' চারেক দিতে পারি। মিশ্রিকে আপাততঃ কাটাবেন না, কিছু দিয়ে হাতে রাখুন।

—কেন?

—ফুড সাপ্লাইয়ের টেণ্ডারটা ধরে রাখুন। মিশ্রিকে কিছু খাওয়ালে ক্রেডিটে আবার মাল দেবে।

—আপনি তো দুশো অলরেডি পান।

—দেবেন এক সময়ে। পালাবেন কোথায়?

আবার চোখ বোজে। কল্যাণ ও-রকমই। খুব মহৎ কাজ ও খুব অবহেলার সঙ্গে করে। অমিয় ঠিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে না। মনটা সেরকম নেই। সেনগুপ্ত পালিয়েছে, হাসি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা ঝুল।

নীচে এসে স্কুটারটা চালু করে সে। ভীড় কাটিয়ে ধীরগতিতে এগোয়।

কাঁচের টেবিলে ছায়া পড়তেই লাহিড়ী মুখ তোলে।

—ভাল খবর মশাই।

—কী?

—আবার অর্ডার পাবেন। আপনার টেণ্ডার আমরা নেবো। কাল খুব লড়ালড়ি হল আপনার জন্য।

—কত টাকার অর্ডার?

—কম। হাজার পাঁচেক। কিন্তু ব্যাড বুকে আছেন এখন, এই অর্ডারই আপাততঃ পাঁচলাখের সমান। মেশিনগুলো যদি পাল্টাতে না পারেন তবে অন্ততঃ মেরামত করে দেবেন, বিল কিছু ছাঁট-কাট হবে। সাত হাজারের জায়গায় হাজার চারেক পেয়ে যাবেন। কিন্তু সেটা পাবেন মেশিন মেরামতের পর।

অমিয় ম্লান মুখে বসে থাকে। খবরটা ভালই। খুব ভাল। কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্ডার ধরাও মুশকিল। পেমেন্টটা আটকে রইল।

লাহিড়ী চা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে, খারাপ দেখছি যে!

—কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।

—বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

লাহিড়ী গম্ভীর ভাবে বলে—ড্রিঙ্কস্?

—একটু-আধটু।

—মেয়েছেলে?

—নীল।

—স্মোক?

—দিনে চল্লিশ পঞ্চাশটা।

—চেক-আপ করান। হার্ট, ব্লাড, ইউরিন।

চা-এসে যায়। দামী চায়ের গন্ধ। ভাল-লাগে অমিয়র। আস্তে আস্তে

চেখে চেখে খায়। প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশান পুরনো কোম্পানী। ব্রিটিশারদের হাত থেকে গত বছর কিনল এক পাঞ্জাবী। দশ বছর ধরে প্যাটারসনের সঙ্গে ব্যবসা করছে অমিয়। সকলের সঙ্গেই চেনা হয়ে গিয়েছিল, গুডউইল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পুরনো সাপ্লায়ার বলে প্যাটারসন অমিয়কে ছাড়াল না, কিন্তু নীচু নজরে দেখবে এখন, বেশি টাকার অর্ডার দিতে ভয় পাবে।

লাহিড়ীর খাঁই বেশী নয়। ওয়ান পার্সেণ্ট নেয় বিল থেকে। অন্য পারচেজ-অফিসারদের বায়নাক্কা অনেক। সেই তুলনায় লাহিড়ী দেবতা।

অমিয় উঠে বলল—অনেক ধন্যবাদ।

লাহিড়ী হাসল। বলল—সেনগুপ্তর খবর কী?

—খবর নেই।

—ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ!

—ওসব মাল আমরা চিনি। আপনিই চিনতে পারেন নি।

অমিয় দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

নীচে এসে আবার স্কুটার চালু করে অমিয়। কোথাও যাওয়ার নেই। সব জায়গায় পাওনাদার বসে আছে। হাজার দশ-বারো টাকার ক্রেডিট বাজারে। গোটা দুই বিলের পেমেণ্ট সামনের সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তার আগে অমিয়র কোথাও যাওয়া হবে না। পেমেণ্ট পেলেই কিছু ধার শোধ হবে। হাতে কিছুই থাকবে না।

প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশন পিছনে ফেলে অমিয়র স্কুটার ধীরগতিতে, ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

চললে বাতাস লাগে। থেমে থাকলে গুমোট। একটা পেট্রোল পাম্পে থামতেই গুমোটটা টের পায় সে। তিনটে গাড়ি তেল নিচ্ছে কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কাঁচা পেট্রোলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। গন্ধটা বরাবর ভাল লাগে তার। মন চনমন করে ওঠে। বুক ভরে সে পেট্রোলের গন্ধ নেয়। ঝিমোয়। কয়েক মুহূর্তেই শার্টের নীচে ঘাম কেঁচোর মত শরীর বেয়ে নামে। হাতের তেলো ভিজে যায়।

পিছনে একটা গাড়ি তীব্র হর্‌ন্ দেয়। অমিয় ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ চায়। সামনের গাড়ি চলে গেছে। অমিয় এগোয়। ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেল নেয়। আবার স্কুটার ছাড়ে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকে।

মধ্য-কলকাতার অফিসপাড়ায় কত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। দারুণ দারুণ

বাড়ি, লাখ লাখ টাকা খরচ। ভিতরে কোটি কোটি টাকার লেন-দেন।

অফিস, কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমার বাড়ীর ছায়ায় ছায়ায় অমিয় তার স্কুটার চালায়। শরীরের ঘাম মরে আসে। হাসি কিছু টাকা চেয়েছে। কত টাকা তা বলেনি— ষ্টীলের আলমারীতে শ' তিনেক আছে মনে হয়। অমিয়র পকেটে বড়জোর শ' খানেক। হাসি জানে, অমিয় এখন দড়ির ওপর হাঁটছে, তাই বেশি নেবে না বোধহয়। হাসি টাকা চায় না। মুক্তি চায়। কিন্তু ওকে এ সময়ে কিছু টাকা দিতে পারলে অমিয় খুশি হত।

সোনাদা যে ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই ব্যাঙ্কটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামে অমিয়। বছর তিনেক আগেই সোনাদা অ্যাকাউন্টস্ অফিসার ছিল। এখন কি আর একটু ওপরে উঠেছে! সাহেবী ব্যাঙ্ক, একগাদা টাকা মাইনে পায় সোনাদা। কপালটা বড় হয়ে হয়ে অনেকটা মাথা জুড়ে টাক পড়েছিল। এখন বোধহয় টাকটা পুরো হয়ে গেছে। সোনাদা বরাবর গম্ভীর। দেখা হলে হাসে না, কথাও বেশি বলে না। পাত্তা না দেওয়ার ভাব। কিন্তু অমিয় জানে, সোনাদা মানুষটা বাইরে ঐরকম, ওর মুখে কথা কম, ভাবের প্রকাশ কম। কিন্তু এখনো অমিয়কে দেখলে ওর চোখের পাতা কাঁপে। স্নেহে, মমতায়। কত কষ্ট করেছে সোনাদা! বড় কষ্টে মানুষ।

অমিয় স্কুটার থেকে নেমে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কটায় ঢুকে যায়। সোনাদার কাছে কোন কাজ নেই। তবু একবার অনেকদিন বাদে দেখা করে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মনটা ভাল নেই।

কাউন্টারে ভীড়। অজস্র সুন্দর কাউন্টারে ছাওয়া চারদিক। রঙীন দেওয়াল, টিউব-লাইট—সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কটার ভিতরটা বড় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করতেই একজন পিওন সোনাদার ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘষা কাচের পাল্লা। বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। একটা টেবিলের ওপর সাজানো স্লিপ, ডটপেন।

নিজের নাম লিখে অমিয় স্লিপ পাঠায়। একটু পরে বেয়ারা এসে ডাকে।

প্রকাণ্ড টেবিলের ওপাশে সুন্দর পোশাকের সোনাদাকে প্রথমটায় আত্মীয় বলে ভাবতে কষ্ট হয় তার। গোলাপী রঙের টাক মাথায়, নীলাভ কামানো গাল, খুব ব্যস্ত।

একবার চোখ তুলে আবার কাগজপত্রে ডুবে গেল। বসতেও বলল না। অমিয় একটু হেসে নিজেই বসে।

সোনাদা ঐরকমই। বসতে বলে না। জানে, বসতে বলার কিছু নেই।

অমিয় তো বসবেই। এটা তার সোনাদার ঘর নয় কি?

ছোটবেলা থেকে তারা ভাইবোনরা একে অন্যকে আপন বলে ভাবতে শিখেছিল। যৌথ পরিবার ঐ একটা রক্তের গূঢ় সর্ম্পক তৈরি করে দিয়ে গেছে। এ জীবনে ওটা আর ভাঙবে না।

সোনাদা একবার একফাঁকে প্রশ্ন করে—শরীরটা দেখছি শেষ করেছিস?

—হুঁ।

—কেন?

—শরীরটা ভাল নেই।

—কোম্পানী লালবাতি জ্বালেনি তো?

—জ্বালছে।

—জ্বালাই উচিত। তখন যদি ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিতিস, আজ কত মাইনে হত জানিস?

—কত?

—হাজার খানেকের ওপরে। গর্দভ।

—মাসে ওর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার আমি করেছি। ব্যবসা বলে তোমরা গুরুত্ব দাও না। বাঁধা মাইনের লোকেবা ব্যবসাকে ভয় পায়।

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায়। কোথায় একটা গোপন বোতাম টেপে, বাইরে রি-রি করে বেল বাজে। বেয়ারা এলে সোনাদা চা আনতে বলে। তারপর আবার কাজেকর্মে ডুবে যায়।

ঠাণ্ডা ঘরখানা। অমিয়র ঝিমুনি আসে।

সোনাদা আবার চোখ তুলে তাকে দেখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কী?

—তুমি বুঝবে না। অমিয় শ্বাস ছাড়ে, তারপর বলে—সোনাদা, তুমি কি প্রমোশন পেয়েছ?

—চাকরিতে থাকলে প্রমোশন হয়। তোর মত ব্যবসাদাররা চিরকাল ব্যবসাদার থেকে যায়।

—তুমি কি খুব বড় পোস্টে আছ?

সোনাদা হাসে। মাথা নাড়ে।

—তাহলে আমার ব্যবসার জন্য তোমার ব্যঙ্ক থেকে কিছু ধার পাইয়ে দাও না!

—তোকে ধার দেবে কেন? ইণ্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার হলেও না হয়

সোনাদ।

হেলান দি—যদি সিকিউরিটি দেখাই, যদি হাই ইন্টারেস্ট দিই?

প্যাৰে সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে বলে—তোর আবার সিকিউরিটি কী? একটা পুরনো স্কুটার, ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় একখানা ভাগের অফিস। আর কী আছে তোর? বড়জোর একখানা রিফিউজি সার্টিফিকেট, তা সেখানাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিস! কাজে লাগাতে জানলে রিফিউজি সার্টিফিকেটও একটা মস্ত অ্যাসেট—কিন্তু তা তুই লাগালি কোথায়?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সোনাদা আবার জিজ্ঞাসা করে—প্রবলেমটা কী?

অমিয় উত্তর দেয়—তুমি বুঝবে না। মানুষ কতরকম গাড্ডায় যে পড়ে সোনাদা!

—তোর গাড্ডাটা কী রকম?

অমিয় শুধু হাসে। চারদিকে একবার তাকায়। যে চেয়ারে সে বসে আছে তা ফোম্ রাবারের গদীওয়ালা, টানলে শব্দ হয় না, ভীষণ ভারী। টেবিলখানা লম্বা এল্-এর মত। ঘষা কাঁচের দরজা, ঢেউখেলানো কাচ দিয়ে তৈরী ঘরের পার্টিশন। ওপাশে লোকজন চললে কাচের ঢেউয়ে বিচিত্র প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই একখানা চেম্বার করতেই ইন্টিরিয়র ডেকরেটর অন্ততঃ দশ বিশ হাজার কি তারও বেশী নিয়েছে। এ-রকম একখানা অফিস-ঘর বানাবার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। হবে না আর। এ-রকম নিস্তব্ধ, কাচের ঘর, মাছি উড়লে যেখানে শব্দ পাওয়া যায়, এ-রকম ঠাণ্ডা ঘর, ফোম্ রাবারের গভীর তলিয়ে-যাওয়া গদী, বিচিত্র ডিজাইনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আলো—এইসব আর কোনদিন হবে না।

—লাঞ্চে তুমি কী খাও সোনাদা?

—তোর মুণ্ডু।

—এই ঘরটা সাজাতে কত খরচ পড়েছে?

—তোর মত দশটা ব্যবসাদারকে বিক্রি করলে যত ওঠে।

—এরা তোমার বাড়ি-ভাড়া দেয়? গাড়ি?

সোনাদা তাকে গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। কিন্তু সোনাদার কপালে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয়। কাজ করতে করতেও এক-আধবার চোরা চোখে অমিয়কে দেখে নেয়।

অমিয় বলে—উঠি।

—বোস। প্রবলেমটা কী বলে যা।

—কিছু না।

—টাকা সত্যিই চাস?

অমিয় মাথা নাড়ে—না।

—দরকার হলে ম্যাক্সিমাম হাজারখানেক নিতে পারিস। ব্যাঙ্কের টাকা নয়, আমার টাকা।

—কোনদিন নিয়েছি?

সোনাদা চুপ করে থাকে।

অমিয় বলে—তুমি যদি সাপ্লায়ার হতে, কিংবা সুদখোর মহাজন, কি আমার ক্লায়েন্ট, তো নিতাম। তুমি আমার সোনাদা, কিন্তু আমার ব্যবসার কেউ নও। তোমার কাছ থেকে নিলে আমি তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মত নীচু হয়ে যাব।

—তার মানে?

অমিয় হাসে—আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সাকসেসফুল। তোমার কাছ ঘেঁষে বহু আত্মীয় ঘোরাফেরা করে, আমি জানি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি তাদের দলে নই।

সোনাদা একটু হাসে।

—সোনাদা, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব? শুনবে ঠিক?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ছোট্ট একটা নড় করে।

—আমি প্রায়ই একটা ষ্টীমারঘাটকে দেখতে পাই।

সোনাদা নড়ে-চড়ে বসে বলে—কী রকম?

—আমি যেন উঁচু বালির চড়ায় বসে আছি। অনেক দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি গড়িয়ে গেছে—আধমাইল—একমাইল—তারপর ঘোলা জল—একটা জেটি—প্রকাণ্ড নদী দিগন্ত পর্যন্ত। কখনো কখনো দেখি, রাতের ষ্টীমারঘাট—কেবল বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে, জেটির গায়ে জলের শব্দ—ওপারে ভীষণ অন্ধকার। কেন দেখি বল তো?

সোনাদা তাকিয়ে থাকে।

—এ কি মৃত্যুর-প্রতীক নাকি? অমিয় বলে।

—ইয়ার্কি হচ্ছে?

—ইয়ার্কি নয় সোনাদা। কাজ কর্মে, ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে ঐ বালিয়াড়ি, আর বালিয়াড়ির পর জেটি, জল—এই-সব ভেসে ওঠে।

সোনাদার চোখ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ব্যস্ত সোনাদা একটু হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ইণ্ডিয়া কিংসের সোনালী প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ অমিয়র নাকে এসে লাগে। সোনাদার সামনে খায় না, নইলে এই মুহূর্তে তারও একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যৌথ পরিবারের শিকড়-বাকড় সব রয়ে গেছে ভিতরে। সোনাদার সামনে কোনদিনই আর সিগারেট খাওয়া যাবে না।

সোনাদা বলে—এ সবই নস্ট্যালজিয়া। আমারও হয়। দেশের বাড়িতে করমচা তলার ছায়ায় মাটির ওপর শ্যাওলা গজাত। সেই ঠাণ্ডা জায়গাটার কথা হঠাৎ কেন যে মনে পড়ে।

অমিয় মাথা নাড়ে—না এটা শৈশব-স্মৃতি নয়। ষ্টীমারঘাট আমি আর ক'বার দেখছি। দু তিন বার বড় জোর। তারপরই তো কলকাতায় পার্মানেন্ট চলে এলাম। তাছাড়া সেই ষ্টীমারঘাট তো দেশে যাওয়ার গোয়ালন্দী ঘাট নয়। এটা কেমন যেন ধু ধু বালুর চর, নির্জন অথৈ ঘোলা জল, ওপারটা দেখা যায় না।

সোনাদা হাসে। বলে—ভাল খাওয়া-দাওয়া কর। হাসিকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে টাইরে ঘুরে আয়।

অমিয় অবাক হয়ে বলে—কেন?

—তাহলে ওসব সেরে যাবে।

—সারাতে চাইছে কে? আমার তো খারাপ লাগে না। কলকাতার ভীড়ভাট্টা, গরম, ঘাম, কাজকর্মের ভিতরে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছুটি পেয়ে একটা অচেনা ষ্টীমারঘাটে চলে যাই, বালিয়াড়িতে বসে থাকি, বেশ লাগে। একে সারাব কেন? শুধু জানতে চাইছি, ব্যাপারটা কী। তুমি জানো?

উত্তর দেওয়ার সময় পায় না সোনাদা। স্টেনোগ্রাফার পার্সী মেয়েটি ঘরে ঢোকে। লম্বা ফর্সা, ভাঙাচোরা মুখ। তবু মুখে একটা অদ্ভুত শ্রী আছে। দারুণ একখানা বাটিকের শাড়ি পরনে। মেয়েটা সোনাদার ডানদিকে গিয়ে নিচু হয়ে একটা টাইপ করা চিঠি দেখায়। কথা বলাবলি হয়। ততক্ষণ অমিয় মেয়েটার শাড়ি দেখে। হয়তো বা এরকম শাড়িতে হাসিকে ভাল মানাত। হাসির কথা মনে পড়তেই অমিয়র একধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। বুক পেট জুড়ে একটা তীক্ষ্ণ বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ধড়ফড় করে। একটা চেক-আপ বোধহয় অমিয়র দরকার ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, ইর্‌রেগুলার জীবন, অতিরিক্ত চা আর

সিগারেট, ব্যবসার উত্তেজনা, শক, সব মিলিয়ে ভিতরটা ভাল থাকার কথা নয়। হাসিকে এই শাড়ীটায় বোধহয় এখনো মানায়। নীলের ওপর হলুদ বাটিকের কাজ। পকেটে একশোর কাছাকাছি টাকা আছে। বাজার ঘুরে একবার খুঁজে দেখবে নাকি শাড়িটা। অবশ্য তা আর হয় না। হাসি বড় অবাক হবে, তাকিয়ে থাকবে বা দু-একটা বিদ্রূপাত্মক কথাও বলতে পারে। দরকার নেই। হাসি নিষ্ঠুর। তার হৃদয় নেই।

মেয়েটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে কাগজপত্র ঘাঁটে। সোনাদা আবার কাজকর্মে ডুবে যায়। একজন দুজন করে অফিসে লোকজন আসে। সুন্দর পোশাকের চটপটে লোকেরা। সোনাদা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে, চমৎকার ইংরেজীতে কথা বলে। বিজনেসের পিক-আওয়ার। সোনাদার দম ফেলার সময় নেই।

এক ফাঁকে অমিয় বলে—সোনাদা, উঠি।

কাগজপত্র ঘেঁটে কী একটা খুঁজে পায় সোনাদা। সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে অমিয়কে বলে—সামনের সোমবার নিণ্টুর জন্মদিন। তোর বৌদি হয়তো হাসিকে খবর দিয়েছে। তবু বলে রাখছি, বিকেলের দিকে হাসিকে নিয়ে চলে যাস, রাতে খেয়ে একেবারে ফিরবি।

—আচ্ছা।

—তোর স্টীমারঘাটের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।

অমিয় হাসে। জন্মদিনে যাওয়া হবে না। স্টীমারঘাটের কথা সোনাদা ভুলে যাবে।

ব্যাঙ্কটা থেকে বেরোতেই জ্বরো কলকাতা চেপে ধরে। কী তাপ রোদের। গুমোট।

অমিয় তার স্কুটার চালু করে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না, তবু যায়। যেতে থাকে।

টিফিন। কিন্তু টিফিনের সময়েও সোমাদি বাইরে যায় না, আড্ডা মারে না। নিজের জায়গায় বসে থাকে। প্রকাণ্ড হলঘরের একধারে টাইপিস্টদের সারি সারি মেশিন। সব খালি। কেবল সোমাদি ঠিক বসে আছে। ডান হাতে একখানা এক-কামড় খাওয়া টোস্ট, আলতো ভাবে ধরা, বাঁ হাত মেশিনে ছোবল মারার জন্য উদ্যত। অমিয় এগিয়ে যেতে শুনল টুক করে মেশিনের একটা অক্ষর লাফিয়ে উঠল। অমিয়র করুণা হয়।

সোমাদির বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা! রোগা গড়নের বলে বয়স খুব বেশী দেখায় না, কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তির ছাপ আছেই। নাকের দুঁধার দিয়ে গভীর রেখা নেমে গেছে, মেচেতার ছোপ ধরেছে মুখে। বছরে বড়জোর এক দুদিন ছুটি নেয়। চোদ্দ বছর টানা চাকরি করছে আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কন্ট্রোলে, তবু চাকরি পাকা হয়নি। কন্ট্রোল উঠে যাবে বলে চাকরি কারোই পাকা নয় এখানে। ওর বিয়ের জন্য কেউ তেমন করে চেষ্টাই করল না। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর চাকরিই করে গেল। বার দুই দুটি ছেলেকে বোধহয় ভাল লেগেছিল। তাদের একজন ছিল ভিন্ন জাতের, অন্যজনের ছিল কম বয়স। হল না। হবেও না। সোমাদি তা জানে বলেই কোথাও আর যায় না। মনপ্রাণ দিয়ে চাকরি করে! ছুটি পেলে হাঁফ ধরে যায়।

টোস্টটা আর এক-কামড় খাওয়ার জন্য মুখের কাছে এনে সোমাদি তাকায়। প্রথমটায় বোধহয় চিনতেই পারে না। তাকিয়ে থাকে।

—সোমাদি, কেমন আছ?

সোমাদি টোস্টটা রেখে দিয়ে একটু চেয়ে থেকে বলে—বেরো, বেরিয়ে যা।

—কেন?

—লজ্জা করে না? একবছরের মধ্যে একবার মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হয় নি? কতবড় অসুখ গেল মা-র, তোকে দেখার জন্য আকুলি-বিকুলি, তিনটে চিঠি দিলাম, একটা উত্তরও দিসনি। বেরো—কেন এসেছিস?

—তুমি কত মাইনে পাও?

—তাতে কি দরকার? চালাকি ছাড়।

—চালাকি না। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি।

—ভারি তো ব্যবসা। অফিসে মাছি ওড়ে, সেই ব্যবসা করেই তোর সময় হয় না। অমানুষ!

একটা চেয়ার টেনে অমিয় বসে নিজের থেকেই। মাঝখানে মেশিন, ওপাশে সোমাদি। বলে—এর পরের জেনারেশনে আর এইসব চোটপাট শোনা যাবে না সোমাদি। যা বকাবকি করার তা তোমরাই করে নিলে।

—তার মানে?

—আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যামিলি আছে। স্বামী স্ত্রী আর

বাচ্চা ছেলে একটা। একদিন সাজগোজ করে বিকেলে কোথায় বেরোচ্ছে, ছেলেটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাচ্ছ বাবু? সে উত্তর দিল—ঠাকুমার বাড়ি। বুঝলে সোমাদি, কথাটা সেই থেকে বুকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। ঠাকুমার বাড়ি! মাই গড, ঠাকুরমার বাড়ি যে একটা আলাদা বাড়ি, সেখানে যে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া যায় তা আমরা ভাবতেই পারি না এখনো। ঠাকুমার বাড়ি আবার কী। ঠাকুমা যে আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে আছে—তার বাড়ি কী করে আলাদা বাড়ি হয়। এই যে তুমি আমাকে বকছ, পিসিমাকে দেখতে যাইনি বলে, এসব সম্পর্কের টান আমাদের সময়েই শেষ। এরপর পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে দেখা হলে হয়তো হাতজোড় করে নমস্কার করবে, আপনি আপনি করে কথা বলবে। বলবে—একদিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন, কেমন। খুব খুশী হব।

সোমাদি একটু হাসে। বলে, তোর সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক তাই দাঁড়িয়ে গেছে। একবছরে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা যাওয়ার সময় হয় না, কী করে বুঝব যে সম্পর্ক রাখতে চাস?

—গত একবছর ধরে আমি ভাল নেই সোমাদি।

—কী হয়েছে?

—তুমি কত মাইনে পাও বললে না?

—জেনে কী হবে?

—এমনিই। কৌতূহল। বল না।

—সব কেটে ছেঁটে পৌনে আটশো। হাসি কেমন আছে?

—ভাল। গত বছর তুমি একটা ষ্টীলের আলমারী কিনেছ, আর একটা সিলিং ফ্যান, না?

সোমাদি হাসে—এ বছর একটা সুতোর কার্পেট কিনেছি, ড্রেসিং টেবিল করেছি, গ্যাসের উনুন কিনেছি। দেখে আসিস।

—পৌনে আটশোর মধ্যে কী করে ম্যানেজ করো? তোমার তো উপরিরও রাস্তা নেই।

—এসব জানতেই এসেছিস? হাসিকে নিয়ে কবে যাবি বল?

-তোমার পোষ্যও তো কম নয়। পিসিমা, নীতা, তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাই তোমার কাছেই থাকে, কী করে ম্যানেজ করো?

—কী তোরা ভাইরা তো আর মাসোহারা দিস না, ওতেই কষ্টে-সৃষ্টে ম্যানেজ করে নিই। একটা টোস্ট দিয়ে টিফিন সারি, বিড়ি

সিগারেট খাই না, সাদামাটা পোশাক করি, সিনেমা দেখি কালে-ভদ্রে, কোথাও বেড়াতেও যাই না। তোমাদের তো তা নয়। হাসির খবর কিছু বললি না, বাচ্চা কাচ্চা হবে নাকি?

—তুমি খুব কষ্ট করো, না সোমাদি?

—দূর পাগলা, তোর হয়েছে কী? এসব বলছিস কেন?

—তুমি এত কষ্ট করছ কেন?

—কেন আবার, নিজের জন্য।

—দূর! নিজের জন্য কষ্ট করে সুখ কী। কষ্ট করলে করতে হয় ভালবাসার মানুষের জন্য। তুমি সবচেয়ে বেশী কাকে ভালবাস সোনাদি?

—কী জানি? তোর হয়েছে কী?

—কিছু না!

—হাসিকে নিয়ে কবে যাবি? হাসি তো আমাদের ভাল করে চিনলই না।

—যাব একদিন ঠিক। আগে বল, তুমি কার জন্য এত কষ্ট করছ?

—বললাম তো, নিজের জন্য।

—তবে তো তুমি নিজেকে ভালবাস।

—বললাম তো, বাসি।

—আমি বাসি না।

—তুই হাসিকে বাসিস। ভালবাসলেই হল।

—নিজেকে ভালবাসলে হাসিকেও ভালবাসা যায়। এই যে তুমি নিজেকে ভালবাস বললে, স্বামী-পুত্র হলে তাদেরও বাসতে, বাধা হত না। ভালবাসা তো মাস মাইনে নয় যে টান পড়বে।

—হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী হয়েছে বল? দরকার হলে আমি না হয় গিয়ে হাসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিটমাট করে আসি। মাত্র তিন বছর হল বিয়ে, এখনই ঝগড়াঝাঁটি হলে—

—পাকামী করো না। ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে তুমি কী জান? ঐ ব্যাপারে আমি তোমার সিনিয়র।

—তা হলে এই গরম দুপুরে ঘামে নেয়ে এসে ভালবাসা-ভালবাসা করছিস কেন? কিছু খাবি? বেয়ারা ডেকে কিছু আনিয়ে দিই। একটা ডিমভাজা—না গরমে একটু দৈ খাবি?

—আমার মুশকিল কি জানো?

—কী?

—আমি হাসিকে ভালবাসতাম, ব্যবসাকে ভালবাসতাম, স্কুটারকে ভালবাসতাম, কিন্তু এইসব ভালবাসার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট এসে পড়ছে।

—ষ্টীমারঘাট?

—হুঁ।

সোমাদি চেয়ে থাকে। বলে—কী বলছিস?

—খুব উঁচু বালিয়াড়ি থেকে তুমি কখনো কোন নির্জন ফেরীঘাট দেখেছ? একটা জেটি—তারপর বিশাল ঘোলা জলের নদী—ওপারটা ধূ ধূ করে—দেখা যায় না। দেখেছ? আমি চোখ বুজলেই দেখি।

সোমাদির মুখটা কেমন হয়ে যায় যেন। বয়েস হয়ে যাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপ-ওলা নীরস মুখ সোমাদির। তবু কয়েক পলকের জন্য যেন একটা কোমলতা গাছের ছায়ার মত মুখে খেলা করে। মুখের কর্কশ রেখাগুলি লাবণ্যের সঞ্চারে হঠাৎ ডুবে যায়।

—কোন্ ষ্টীমারঘাটের কথা বলছিস? কলকাতার গঙ্গা, নাকি গোয়লন্দ, আমিনগাঁতেও ফেরীঘাট দেখেছিলাম।

—ওসব নয়। এ একটা অন্যরকম ফেরীঘাট। বহু দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি, তারপর ঘোলা জল—চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষণ ভয় করে, আবার ভীষণ ভালও লাগে।

—আমি ঠিক জানি, তুই হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস। কিংবা ব্যবসাতে মার খেয়েছিস। কত টাকা রেখে গিয়েছিল মামা?

—হাজার দশেক।

—সেটাই ভুল হয়েছিল। কে যে তোর মাথায় ব্যবসা ঢুকিয়েছিল। বাঙালী ছেলে আবার কবে ব্যবসা করতে শিখেছে। তার চেয়ে একটা বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে গেলে—

—*ষ্টীমারঘাটটার কথা তুমি কিছু জান না, না?*

—কী জানব? তোর মাথায় যতসব পাগলামীর পোকা। হাসিকে নিয়ে কবে আসবি বল?

—তোমার কিছু মনে হয় না? ষ্টীমারঘাট বা ওরকম কিছু?

সোমাদি হাসে। বলে—আচ্ছা জ্বালাতন! ভাবনা-চিন্তা করার সময় কোথায় আমার বল তো? সকাল সাড়ে আটটার লেডীজ স্পেশাল ধরতে বেরোই, মাইলখানেক হেঁটে বাস-রাস্তা, অফিসে সারাক্ষণ কাজ, ফিরতে ফিরতে আটটা হয়ে যায়। তখন শরীরে থাকে কী? খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি,

স্বপ্নও দেখি না।

অমিয় শ্বাস ফেলে। বলে—তুমি কাঠ হয়ে গেছ।

একটু ইতস্তত করে সোমাদি বলে—তোর দেশের পুকুরঘাটের কথা মনে পড়ে। খুব বড় বড় কচুপাতা বাতাসে নড়ত। মাছ ফুট কাটত জলে। কদমগাছের ছায়ায় আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলতাম। মনে হওয়ার কি শেষ আছে! কত কী মনে হয়। ওসব নিয়ে ভাবনার কী। হাসির সঙ্গে ভাব করে ফেল। ফেরার সময়ে একখানা শাড়ি আর দুটো সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে যা। কালকের দিনটা হোটেলরেষ্টুরেণ্টে খাস। এরকম একটু আধটু করলেই দেখিস আর ঝগড়া হবে না।

—তুমি এসব কবে থেকে ভেবে রেখেছ সোমাদি! বিয়ে হলে বরের সঙ্গে কী রকম সব মান-অভিমান হবে, সব ভেবে রেখেছিলে। আর বলছ, ভাববার সময় পাও না!

—সোমাদি হেসে ওঠে। বলে—ঠিক বলেছিস।

একজন দুজন করে মেশিনগুলোর সামনে মেয়েরা এসে বসছে। টিফিন শেষ।

অমিয় উঠে দাঁড়ায়।

—চলি।

সোমাদি গ্লাস পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে তাকায়। চোখে অন্যমনস্কতা। বলে—সম্পর্কটা রাখিস অমিয়। মাকে গিয়ে দেখে আসিস। হার্ট ভাল না, কখন কী হয়ে যায়।

—যাব।

অফিসে এসে অমিয় দেখে, কেউ নেই। দুপুরের ডাকে ইন্সিওরেন্সের একটা চিঠি এসেছে। গতবছরের প্রিমিয়াম বাকী। বছর তিনেক আগে, বিয়ের পরই দশ হাজার টাকার একটা পলিসি করিয়েছিল। দু বছর প্রিমিয়াম টেনেছে। যাকগে, পেইড-আপ্ হয়ে যাবে।

গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে কল্যাণ একটা চিঠি রেখে গেছে—বাগচী, হায়দার তাগাদায় এসেছিল। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিদায় করেছি। ইনকাম-ট্যাক্সের অজিতকে একবার ফোন করবেন, ওকে আপনার কথা বলা আছে। ওর দাদা একটা লোন সোসাইটির মেম্বার, একটা লোন পাইয়ে দিতে পারে। আমি সিনেমায় যাচ্ছি, আজ ফিরব না। রাজেনের কাছে চারশো

টাকা রাখা আছে। কাল সকালেই গিয়ে মিশ্রিলালকে দিয়ে আসবেন। ফুড-সাপ্লাইটা ছাড়বেন না.....

চোখটা একটু ঝাপসা লাগে। চিঠিটা রেখে দেয় অমিয়। অফিস ঘরটা নির্জন। পাখার হাওয়ায় কোথায় যেন একটা কাগজ উড়বার শব্দ হয় কেবল। অমিয় বসে হাই তোলে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

—বিকেলের দিকে রজত ফিরে এসে ডাকে—বাগচী—

—উঁ।

—আমার কাছে কেউ এসেছিল?

—না।

—দূর! কেউ আসে নি!

—রাজেনকে জিজ্ঞেস করুন তো।

—করেছি। ও তো বিশবার বাইরে যাচ্ছে চা খাবার সিগারেট আনতে। আমার মোটর পার্টস্‌টা দিয়ে গেল না শালা রায়চৌধুরী। কাল ডেলিভারী নিতে আসবে।

অমিয় আড়মোড়া ভাঙে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে এখনো ফর্সা রোদ।

রজত তার চেয়ার টেনে বলে—ব্যবসার মুখে পেচ্ছাপ। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি কাল।

—কবে রওনা?

—দিন পনেরোর মধ্যে। প্রথমে ডুসেলডর্ফে যাব মাধুর কাছে। সেখান থেকে বন্‌ হয়ে কাজের জায়গায়। দাঁড়ান, আজ আমি চা খাওয়াব, সন্দেশ খাবেন?

—খাব। খুব খিদে পেয়েছে। অমিয় বলে।

বেল বাজায় রজত। রাজেন এলে চা সন্দেশ আনবার পয়সা দেয়। তারপর অমিয়কে বলে—খুব দামী সিগারেট কী আছে বলুন তো?

—আপনি তো খান না।

—আজ খাব।

—ইণ্ডিয়া কিংস।

রাজেনের দিকে ফিরে রজত বলে—ইণ্ডিয়া কিংস এনো, এক প্যাকেট, আর দেশলাই। বাগচী, যাওয়ার আগে একটা পার্টি দেব।

অমিয় হাসে।

—শুধু একটা ভয়, বুঝলেন বাগচী!

—কী?

—এর আগে গুরুপদ গিয়েছিল। ল্যাংগুয়েজ জানত না বলে ওকে ফেরত পাঠিয়েছে। আমিও ভাল জানি না। ওদিকে ব্রজগোপালদাকে দিয়ে জার্মান ভাষায় করেসপণ্ডেন্স করেছি, নিজে শেখবার সময়ই পেলাম না। শেষে গুরুপদর মত ফেরত পাঠাবে না, তো?

—সকলের কপাল সমান না।

চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে একটু দোল খায় রজত। ভাবে। বলে —অবশ্য মাধুও জানত না। কোম্পানী ওকে তবু রেখে দিয়েছে।

অমিয় রজতকে একটু দেখে। অন্তত দশ বছরের ছোট রজত। বাচ্চা ছেলে। কোন জমিতেই শেকড় নেই। কলকাতায় জন্ম-কর্ম। অমিয়র মনে হয়, কলকাতায় জন্মালে মাটির টান থাকে না। রজতের খুব ইচ্ছে, আর ফিরবে না। একটা আবছায়া স্টীমারঘাট চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমিয় ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখে। একটা মেয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় একটা কলসী, কোমরের কলসীটা কাৎ করে ধরা তা থেকে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে।

রজত মুখ তুলে বলে—আমার একটা লাভ অ্যাফেয়ার প্রায় ম্যাচিওর করে এসেছিল, বুঝলেন বাগচী!

—হুঁ।

—সেটার কি করব বলুন তো?

—আপনার কী ইচ্ছে?

—ইচ্ছে নেই।

—অমিয় চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলে—চলেই যাচ্ছি যখন, তখন আবার এখানে একটা ফ্যাকড়া রেখে যাই কেন! মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করবে। করতে করতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। এক ফাঁকে এসে অবশ্য বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর কী দরকার! ওখানেই যখন বরাবর থাকব তখন ওদিকেই বিয়ের সুবিধে। তাই মেয়েটাকে সব বুঝিয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাব। ভাল হবে না?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে—হবে।

রজতকে খুশি দেখায়। সে একবার শিস্ দেয়, দু'কলি গান গুণ গুণ করে গায়।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ আসছে। টপ করে নিজের

অজান্তেই উঠে পড়ে অমিয়।

—রজতবাবু, কেউ এলে কাটিয়ে দেবেন। আমি বোসের ঘরে ফোন করতে যাচ্ছি।

রজতের অভ্যাস আছে। অনেকদিন ধরেই অমিয়র সময় ভাল যাচ্ছে না। রজত মাথাটা হেলিয়ে একটু হাসল—ঠিক আছে ঠিক আছে। বাগচী, উই আর কমরেডস আফটার অল—

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে সে যে-ই হোক অল্পের জন্য অমিয়কে ধরতে পারল না। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এল অমিয়।

বোস বুড়ো মানুষ। দুই ভাই পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকে। এক সময়ে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে একটু নাম ছিল। এখন কিছু নেই। অফিস আছে। এই পুরো তিনতলাটা তাদের লীজ নেওয়া। লীজ নিয়ে কল্যাণের তৃষ্ণা এবং আরও কয়েকজনকে অফিস ভাড়া দিয়েছে। ওইটাই আয় এখন। জটাওয়ালা একজন তান্ত্রিক এসে প্রায়ই দুই ভায়ের মুখোমুখি বসে থাকে। আজও আছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে তিনজন বয়স্ক নিস্তব্ধ মানুষ। কোন কাজ নেই।

টেলিফোনটার সামনে একটু দাঁড়ায় অমিয়। কাকে ফোন্ করবে বুঝতে পারে না। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়, ডায়াল টোন শোনে। কিড়-কিড় শব্দ হয়। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু অমিয় আঙুল বাড়ায়। দুইয়ের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে ডায়াল ঘোরায় তারপর তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত.....। অপেক্ষা করে। টেলিফোন একটু নিস্তব্ধ থাকে। তারপর খুট করে একটা শব্দ হয়। পরমুহূর্তে হঠাৎ অমিয়কে চমকে দিয়ে ওপাশে একটা দীর্ঘ টানা মুমূর্ষু চীৎকার শোনা যায়—অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও—

অমিয় কেঁপে ওঠে প্রথমে। 'কে'? বলে চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বুঝতে পারে, ওটা এনগেজ্ড সাউণ্ড। ধীর কান্নার মত বিষণ্ণ শব্দ। কতবার শুনেছে সে। আসলে মনটা ঠিক জায়গায় নেই। ফোনটা আবার রেখে দেয় অমিয়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটু আগে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল তা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধকার সিঁড়িতে আবছায়া নতমুখ একটা অবয়বকে এক ঝলক দেখেছিল। একটু সময় কাটানো দরকার।

আবার ডায়াল ঘোরায় অমিয়। সম্পূর্ণ আন্দাজে। কোন্ নম্বরে আঙুল তা তাকিয়ে দেখে না। খুব খিদে পেয়েছে অমিয়র । মুখটা তেতো-তেতো। বোধহয় পিত্তি পড়েছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খায়নি। মাথাটা

ঘোরে। শরীর দুর্বল লাগে। এর পর থেকে অফিসের নীচে, খোলা রাস্তায় আর স্কুটারটা রাখা যাবে না। নীচে স্কুটারটা দেখে সবাই বুঝতে পারে, অমিয় অফিসে আছে। আহম্মদকে বলবে একটা গোপন জায়গার বন্দোবস্ত করতে। ঘড়ির দোকানের পাশে একটা এঁদো গলি আছে—সেখানে রাখলে কেমন হয়?

ফোনটা কানে চেপে ধরে থাকে অমিয়। ডায়াল টোন থেমে গেছে। এইবার নম্বর আসবে। অমিয় অপেক্ষা করে। স্পষ্ট শুনতে পায় ওপাশে দু-একটা কলকব্জা নড়ছে, লিভার উঠছে। প্রথমে ভার্টিকাল তারপর হোরাইজন্টাল. খোঁজ শুরু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র! কিন্তু নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজছে—প্রাণপণে খুঁজছে যন্ত্রটা। খুঁজে পাচ্ছে না। অমিয় অপেক্ষা করে। যন্ত্রের শব্দ থেমে যায়। নম্বরটা কি পাবে না অমিয়? সে অপেক্ষা করে।

যন্ত্রটা অস্ফুট শব্দ করে, তারপর প্লাগ দেয়। রিং করার শব্দ হয় না, এনগেজ্‌ড্‌ থাকারও শব্দ হয় না। কিন্তু তবু কনেকশন ঠিকই পায় অমিয়। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওপাশে টেলিফোন হাতে নিয়েছে এক গভীর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতায় খুব উঁচু থেকে বালিয়াড়ি নেমে গেছে বহুদূর। ধু ধু বালিতে শব্দহীন জোৎস্না পড়ে আছে। হাড়ের মতন সাদা বালি—গড়ানে—তারপর অন্ধকার জেটি, ঘোলা জল। শেয়ালের চোখের মত চক চক করে ওঠে জোনাকি পোকা। এ-পাড়ে দিনের আলো থেকে ও-পাড়ে গভীর রাতের মধ্যে চলে যায় টেলিফোন। সেখানে বাতাসের শব্দ নেই, জলের শব্দ নেই। বালির ওপরে একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালিতে ঢেউয়ের দাগ। বহু দূর-দিগন্তব্যাপী সেই নিস্তব্ধতা টেলিফোন ধরে থাকে ওপাশে। অমিয় সেই নিস্তব্ধতাকে শোনে।

ক'দিন ধরেই ইঁদুরের খুটখাট সারা বাড়িময় শুনছে হাসি। কখনো ওয়ার্ডরোবে, কখনো খাটের তলায়, জুতোর র‍্যাকে, রান্নাঘরে। অবিরল দাঁতে কেটে দিচ্ছে সংসার। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে মাঝে মাঝে শুনেছে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চি-চিক-চিক আনন্দিত চিৎকার ছুটে যাচ্ছে। কুড়-কুড়-কুড়-কুড় কাটার শব্দ হয়েছে। হাসি তেমন গা করেনি। কাটছে কাটুক।

সকালে অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই হাসি গোছগাছ করতে বসেছে।

থাকে থাকে শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার জমে গেছে। এতসব পরার সময় হয় নি। ট্রাঙ্ক ভর্তি রয়েছে শাড়ি, র‍্যাকে নানারকমের জুতো, ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজের অসংখ্য টুকি-টাকি। এসব কিছুই নেবে না সে। দু-চারটে মাত্র নেবে—যা নাহলে নয়।

নীচের থাক নাড়া দিতেই হাসি দেখতে পায় ইঁদুরের কাটার চিহ্ন। তার শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের এখানে-সেখানে ফুটো । গরম জামার থাক ভর্তি জামাকাপড় কেটে রেখেছে। কত কি কেটেছে দেখার জন্য হাসি সব জামাকাপড় নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করে। একটা পুরোনো ফুলহাতা সোয়েটারে জড়ানো দু-বাণ্ডিল চিঠি। চিঠির বাণ্ডিল তুলতেই ঝুর-ঝুর করে কাগজের টুকরো ঝরে পড়ে। অমিয় দু দফায় দিল্লি আর কানপুর গিয়েছিল। প্রথমবার দু-মাস, দ্বিতীয়বার মাসখানেকের জন্য। আর দুবার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন করে ছিল হাসি। সেইসব সময়ে অমিয় লিখেছিল এইসব চিঠি। ইঁদুর নষ্ট করে গেছে। সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা খুলে কয়েক পলক দেখে হাসি। ছিদ্রময় প্রেমপত্র। 'প্রিয়তমাসু.....' হাসি পড়তে থাকে—'তোমার জন্য ভীষণ (ফুটো) হয়ে আছি। কবে আসছ? তোমার জন্য এমন (ফুটো) লাগছে যে কি বলব। আমার (ফুটো) ভিতরটা তো তুমি (ফুটো) পাও না......রাণী আমার, আমার (ফুটো), কবে (ফুটো)? তোমার জন্য আমি সব (ফুটো) পারি। তাড়াতাড়ি চলে (ফুটো)......'

হাসি একটু হাসে। চিঠিটা দেখে নয়। প্রেমপত্র লিখতে অমিয় জানে না। দু-চারটে দুর্দান্ত এলোমেলো আবেগের লাইন লিখেই তার সব কথা ফুরিয়ে যায়। কোনো ইন্‌ল্যাণ্ডের একটার বেশী ফ্ল্যাপ ভর্তি করতে পারেনি সে।

ছিদ্রময় এই চিঠিগুলো নিয়ে কি করবে তা ঠিক করতে পারে না সে। নিয়ে যাবে? নাকি পুড়িয়ে ফেলবে? ভাবতে ভাবতেই আবার পুরনো পুলওভারে চিঠিগুলো জড়িয়ে ওয়ার্ডরোবে আগের জায়গায় রেখে দেয়। থাকগে। থাকতে থাকতে একদিন পুরোনো হয়ে হয়ে ধুলো হয়ে যাবে আপনা থেকে।

মধুকে ডেকে হাসি ন্যাপথলিন আনতে বলে, আর ইঁদুর মারা বিষ। তারপর একে একে ট্রাঙ্ক, বাক্স, স্টিলের আলমারী—সবই খুলে ফেলে সে। জামাকাপড় নামায়, ছিদ্র খুঁজে দেখে। সব জায়গাতেই হয়েছে ইঁদুরের দাঁতের দাগ। ভিতরে ভিতরে সব ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে। আবার সব গোছ করে তুলতে বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে নেওয়ার জন্য সাদামাটা

কয়েকটা জামাকাপড় আলাদা করে রাখে হাসি। দু একটা প্রসাধন। কিছু টাকা। কবে যাওয়া হবে তার কিছু ঠিক নেই। দার্জিলিং মেলে এখন সামার-রাশ। জামাইবাবুকে রিজার্ভেশন করতে বলা আছে।

ঘর-দোর আবার ঝাঁট দেয় হাসি, আটার গুলিতে বিষ মিশিয়ে রাখে ওয়ার্ডরোবে, খাটের তলায়, রান্নাঘরে। স্নান করে খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বাজে।

মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে একটু গড়িয়ে নেয় হাসি। মেঝে থেকে শীতভাব উঠে আসে শরীরে। বাইরে রোদের মুখে ছায়া পড়েছে। মেঘ করল নাকি! বুকের ওপর সিলিং ফ্যানটার ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের রঙের ব্লেডগুলো একটা প্রকাণ্ড স্থির বৃত্ত তৈরী করেছে। ঘুর্ণিঝড়ের মত। বাতাস নেমে এসে মেঝেতে চেপে ধরে হাসিকে! মধু রান্নাঘর ধোলাই করছে। কলঘরে জলের শব্দ। দূরে মেঘ ডাকছে। জানালা-দরজায় সব পর্দা ফেলা। ঘরে একটা সবুজ আভা। হাসি একটু চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না। দেখার জন্য সে চেয়েও নেই। দুই ঘরের এই যে ছোট্ট বাসা, এই কি সংসার? খাট, আলমারী, খাওয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের আয়না—দৃশ্যমান যা কিছু আছে, যা ধরা-ছোঁয়া যায় তার কোনোটাই কি একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষকে আটকে রাখতে পারে? ঘরে দরজা দিয়ে দাও, শরীরে শরীর মিশিয়ে ফেল, সারাবেলা বল ভালবাসার কথা, পোষা পাখীর মত, ওয়ার্ডরোবে জমে উঠুক প্রেমপত্র—তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। সরকারী দপ্তরে হাসি আর অমিয়র বিয়ের দলিল নব্বই কি একশো বছর ধরে জমা থাকবে—অতদিন ধরে তাতে লেখা থাকবে যে তারা আইনগত ভাবে স্বামী-স্ত্রী। তবু কিছু প্রমাণ হয় না। হাসি পাশ ফিরে শোয়।

খামের ওপর সাঁটা একটা ডাকটিকিট জলে ভিজিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিচ্ছে হাসি। খামের ওপর টিকিটের চৌকো চিহ্ন একটা থেকে যাবে—থাকগে। নাকি কোনদিনই টিকিটটা ঠিকমত সাঁটা ছিল না খামের গায়ে? দুটো শরীর কেবল পরস্পরকে ডাকাডাকি করেছে এতকাল? মন নয়, বিশ্বাস নয়, নির্ভরতা নয়।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা কলকাতা!

গরীব ঘরেই জন্ম হয়েছে হাসির। তার বাবা কাছাড়ের এক ছোট্ট চা-বাগানের কেরানী। তারা ছয় ভাইবোন। হাসি চতুর্থ। লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিল না। শিলচরে থাকত এক মাসী, তার ছেলেমেয়ে নেই। সেই

মাসীই নিয়ে গেল হাসিকে, পালত পুষত। শিলচর কলেজ থেকেই সে বি-এ পাস করে, শিলচরেই শেখে মণিপুরী নাচ। লেখাপড়া, নাচ, গানবাজনা—এ সবই হাসি শিখত প্রাণ দিয়ে। এই সব লোকে শেখে কত কারণে। হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। হাস্যকর সে কারণ, তবু কত সত্য।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা! চা বাগানে তার ছেলেবেলা কেটেছে। চারদিকে ঘন গাছের বেড়াজাল, বৃষ্টি পড়ত খুব, আবার রোদ উঠলে চা-পাতার মাত্‌লা গন্ধে ম-ম করত বাতাস। রাতে ফেউ ডাকত, শেয়াল কাঁদত, তাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে এঁটোকাঁটা খেতে আসত শুয়োরের মত মুখওয়ালা বাগডাশা। ঝিঁঝির ডাক রাতে অরণ্যকে গভীর করে তুলত। শীতকালে পড়ত অসহ্য শীত, মাটির ভাপ কুয়াশার মত হয়ে বর্ষাকালে চরাচর আড়াল করত। পাহাড়ী পথ হঠাৎ বাঁক ঘুরে রহস্যে হারিয়ে যেত। তারা ভাইবোনেরা উৎরাই ভেঙে দৌড়ে দৌড়ে খেলত ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দীনদরিদ্র ছিল তাদের পোষাক, আসবাব। তাদের ছোট্ট বাড়িটিতে তাদের অতজনের ঠিক আঁটত না। সেই বাগানে তাঁর ছেলেবেলায় প্রথম বাবার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। বেশীরভাগই কলকাতার দৃশ্যের গল্প, গাড়িঘোড়া আলো দোকান আর লোকজনের গল্প। বাবা গল্প বলতেন সুন্দর আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে প্রতিটি দৃশ্য যেন নিজেও প্রত্যক্ষ করতেন। সেই সব গল্পে তাঁর যৌবনকালে কলকাতার ছাত্রজীবনের নানা দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকত। আর থাকত কলকাতা ছেড়ে আসবার বিরহ-যন্ত্রণা। হাসির মনে সেই প্রথম কলকাতার নাম বীজের মত ঢুকে যায়। সে বাবাকে বলত—চল না বাবা, কলিকাতা যাই। বাবা স্থির থেকে বলত—দূর! আর যাওয়া হবে না। সেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কোন কাজও নেই সেখানে, খামোখা টাকা-পয়সা খরচ করে চারদিনের রাস্তার ধকল সয়ে কার কাছে যাব? হাসির মন বলত—কেন, কলকাতার কাছে।

শিলচর ছিল সুন্দর ছিমছাম শহর। লোকজন বেশী না, গাড়িঘোড়া বেশী না, চারদিকে জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট শহর। সেখানে মাসীর বাড়িতে এসে সে প্রথম শহরের স্বাদ পায়। সুন্দর সেই স্বাদ। তখন তার মনে কলকাতার বীজটি ফেটে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে পারে—শহর—শহরের মত জায়গা নেই। সাতবছর সে শিলচরে কলকাতার আরো বিচিত্র গল্প শোনে বন্ধুবান্ধবীর কাছে। মাসীদের আত্মীয় হারুকাকার ক্যান্সার হয়েছিল, সে গেল চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। শচীন নামে কলেজের

একটি ছেলে বেশ কবিতা লিখত, সে গেল কলকাতায় বড় কবি হওয়ার জন্য। অনুরাধা ক্লাসিকাল গাইত গৌহাটি রেডিও থেকে। সে প্রায়ই বলত—মফস্বলে কিছু হয় না, শিখতে হলে যেতে হবে কলকাতা। হাসির মন বলতে থাকে—কলকাতা, কলকাতা। তুমি গান গাও? নাচো? কবিতা লেখো? তুমি চাকরি চাও? উন্নতি চাও? তোমার মরণাপন্ন অসুখ! তবে কলকাতা যাও। যাও কলকাতায়। একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এস। মানুষকে কলকাতা সব দিতে পারে। খ্যাতি, টাকা, প্রাণ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যারা শিলচরে ফিরে যায় সেই সব বন্ধুদের কাছ ঘেঁসে কলেজে বসত হাসি। দেখত—ঠিক। ওদের মুখে-চোখে আলাদা দীপ্তি, ঝলমলে আনন্দিত ওদের পোশাক, গায়ে কলকাতার মিষ্টি গন্ধ। মাসীকে বলত—মেসোকে বলত—কী গো তোমরা! ভারী ঘরকুনো, চল একবার কলকাতা যাই। মাসী মেসো সমস্বরে বলত—সে ভারী দূরের রাস্তা; পথের কষ্ট খুব, একগাদা টাকা খরচ, তা সেখানে গিয়েই বা হবে কী? যা ভীড়, গণ্ডগোল, মারপিট—আমাদের মত সুন্দর নিরিবিলি শহর নাকি সেটা? চোর পকেটমার, রকবাজ ছেলে, রাজনীতি—দূর দূর—

যাওয়া হত না। হত না বলেই হাসির কল্পনায় কলকাতা ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ব্যাপক রাজত্ব স্থাপন করে। কলকাতায় যেন বা আলাদা সূর্য ওঠে, আলাদা চাঁদ, কলকাতা শূন্যে ভাসমান বুঝি বা। কলকাতাকে ঘিরে যে সব কল্পনা হাসির—সে সব কল্পনা কলকাতার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের মত তার ভিতরটা তছনছ করে দিয়ে যেত। কলকাতা কল্পনা-লতা তার ওপর দু'চোখের পল্লবের ছায়া ফেলেছিল। কলকাতা বলে বোধহয় কিছু নেই তবে। লোকে কেউ কখনো যায় নি। সবাই মিলে যোগাযোগ করে বানিয়েছে গল্প। যারা কলকাতার কথা জানে তারা নিজেদের মধ্যে চোখ-টেপাটেপি করে, কানাকানি করে, যুক্তি করে, হাসিকে এক কাল্পনিক শহরের কথা শোনায়। কলকাতার খণ্ডিত ছবি সে অনেক দেখেছে ভূগোলের বইতে, খবরের কাগজে, ক্যালেণ্ডারে। কখনো জি-পি-ও-র ঘড়ি, হাওড়া ব্রীজ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেণ্ট, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কলকাতার দৃশ্য নয়, রাস্তা ঘাট আলো নয়; নয় তার দোকানপাট কিংবা বিচিত্র পসরা—এ সবের অতীত, কিংবা এসব মিলিয়ে কলকাতা এক মন্ত্রের মত। কিংবা কলকাতা কি জ্বলন্ত পুরুষ, তার বুকে রহস্যের শেষ নেই, সীমাহীন তার নিষ্ঠুর উদাসীনতা, চুম্বকের মত তার আকর্ষণ! দূর দূরান্ত থেকে, প্রেমিকারা চলেছে কলকাতার দিকে। কেবলই

চলেছে!

কলকাতা এক প্রেমিকেরই নাম। জ্বলন্ত দুর্বার এক প্রেমিক পুরুষ। কলকাতায় একবার গেলে আমি আর ফিরব না, ভাবত হাসি।

হাসি লেখাপড়া শিখত কলকাতায় যাবে বলে। গান শিখত, নাচ শিখত—কলকাতায় যেতে হলে কোন্‌টা যে দরকার হবে, কোন্‌টার সূত্রে কলকাতায় যাওয়া হবে তা বুঝতে পারত না। কিন্তু হাস্যকর হলেও এ কথা খুবই সত্য যে তার সব কিছুর পিছনেই ছিল কলকাতা, কলকাতা। বিয়ের সম্বন্ধ মাসীই খুঁজছিল। হাসি একদিন খুব লজ্জার সঙ্গে তাকে বলে—যদি বিয়ে দাও তো কলকাতায় দিও। মাসী অরাজী ছিল না। কিন্তু অত দূরের পাল্লায় ঠিকমত যোগাযোগ কে করে!

সেই সময়ে ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে চমৎকার সম্বন্ধ এসে গেল হাসির। বিলেত-ফেরত ছেলে, বেশ স্মার্ট চেহারা, দেড় দুই হাজার মাইনে। হাসিকে পাত্রপক্ষ পছন্দও করে গেল। মণিপুরী নাচে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শিলচরে তখন হাসির বেশ নাম। রঙ চাপা হলেও বড় সুশ্রী ছিল হাসি। সবাই জানত হাসির ভালই বিয়ে হবে। হয়েও যাচ্ছিল। পাত্রের ঠাকুমা মারা গিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে, চারমাস পর কালাশৌচ কাটবে। তখন অস্থি বিসর্জন দিয়ে বিয়ে হবে—ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেল পাটিপত্র, এমন কি আশীর্বাদের ব্যাপারে কালাশৌচ ওঁরা মানেননি। হাতে তখন চারমাস সময়। মাসীর অ্যালবামে পাত্রের ফটো সাঁটা হয়ে গেছে, পাশে হাসির ফটো। মাসী মাঝে মাঝে হাসিকে অ্যালবামের সেই পাতাটা খুলে দেখাত—দ্যাখ হাসি।

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা। বহু দূরে এক বিশাল পর্বতের মতো বহ্নিমান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিককে কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে টানছে চুম্বক পাহাড়ের মত। সেখানে গেলে ফিরত না হাসি। যাওয়া হবে না কি!

কাছাড়ের এক লোকনাট্য দল সেবার কলকাতায় যাচ্ছে। তারা হাসিকে দলে নিতে রাজী। হাসি মাসীকে গিয়ে ধরল—এখনো চারমাস বাকী। একবার ঘুরে আসি মাসী। মাত্র তো পনেরোটা দিন।

—বিয়ের আগে কলকাতায় গিয়ে নাচবি গাইবি, সেটা কি ভাল দেখাবে? পাত্রপক্ষ যদি কিছু মনে করে!

হাসি হাসে—কলকাতার জলে রঙ ফর্সা হয়, জানো না?

অনেক বলা-কওয়ায় মাসী রাজী হল।

কলকাতা কী রকম দেখতে, তা আজও হাসি সঠিক জানে না। প্রথম

দিনের মতই। বহুদূর থেকে একটা যৌবনকালের প্রতীক্ষা নিয়ে সে যখন কলকাতায় নামল তখন আর রাস্তার কষ্টের কথা মনেও ছিল না, খুব পিপাসা পেয়েছিল, বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরিয়ে আসার সময়ে যে গুম গুম আওয়াজ করেছিল রেলগাড়ি, সেই আওয়াজ শিয়ালদা পর্যন্ত তার বুকের ভিতরে কলকাতার শব্দতরঙ্গ তুলেছিল। শিয়ালদার ঘিঞ্জি কলকাতা সে তো চোখে দেখেনি। শুভদৃষ্টির সময়ে কেউ কী বরের মুখ ঠিকঠাক দেখতে পায়, নির্লজ্জ ছাড়া? সে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দুরন্ত পুরুষের প্রকাণ্ড উষ্ণ বুকের মধ্যে চলে এল। গর্জমান এক কামুক পুরুষ যার শিরা-উপশিরায় প্রাণস্রোত, যার আদরে অবহেলায় সর্বক্ষণ জীবন বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম পুরুষটির আদরে লজ্জায় চোখ বুজেছিল বুঝি হাসি। চোখ আর খোলা হল না। কলকাতা তার চারদিকে সর্বক্ষণ এক শিশু বয়সের বিস্মৃত রঙীন মেলার মত কাল্পনিক হয়ে রইল।

জ্যাঠতুতো দিদির বাড়িতে উঠেছিল হাসি, চিৎপুরের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে সে একদিন লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানও করল। কিন্তু সারাক্ষণ সে কেবলই তার শিরায় শিরায় উল্লসিত রক্তের স্পন্দনে কলকাতার শব্দ শুনল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে টের পেল তার যুবতী বুক কলকাতার পাথুরে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। একের হৃৎস্পন্দন মিশে যাচ্ছে আর একজনের। সঙ্গে আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে আবার ফিরে যাব—মনে মনে বলত হাসি।

পাশের ফ্ল্যাটে এক দম্পতি ছিলেন, আর ছিল অমিয়। দম্পতি অমিয়রই দিদি জামাইবাবু। এ ফ্ল্যাটে হাসিরও দিদি জামাইবাবু। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল। সামনের বারান্দাটা কমন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে হাসি কতদিন দেখেছে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুন্দর পোশাক পরে অমিয় বেরোচ্ছে, নীচে রাস্তায় রাখা তার স্কুটার। স্কুটারে চলে যেত ছেলেটা, যাওয়ার আগে তাকে লক্ষ্য করত। কিন্তু অমিয়কে কেন লক্ষ্য করবে হাসি? কলকাতার প্রেমিকা কেন গ্রাহ্য করবে অন্য পুরুষকে?

দুই পক্ষের দিদি জামাইবাবুরা প্রায় রাতেই খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ফিস খেলার আসর বসাতেন। হাসি থাকত, অমিয়ও। দুপক্ষের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাসি আর অমিয়কে ঘেঁষে যেত। সে সব ঠাট্টার গুরুত্ব ছিল না। হাসির দিদি জামাইবাবু জানতেন হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাসি অমিয়কে তেমন করে লক্ষ্য করত না ঠিকই, কিন্তু তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা।

অমিয় খুব বেশীমাত্রায় লক্ষ্য করেছিল হাসিকে। কতটা তা হাসি টের পায়নি। কিন্তু একদিন অমিয় খুব দুঃসাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেছিল—চলুন, আমার স্কুটারে আপনাকে কলকাতা দেখিয়ে আনি। প্রথমদিন হাসি রাজী হয়নি। কিন্তু কয়েকদিন পরে হয়েছিল। কলকাতার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরই হাসি চলে যাবে।

মসৃণ, সুন্দর ক্যাথিড্রাল রোড হয়ে ময়দানের দিকে স্কুটার ছুটিয়ে অমিয় প্রস্তাব দিয়েছিল—যদি কিছু মনে না করেন—

কলকাতা—কেবলমাত্র কলকাতার জন্য হাসি থেকে গেল। কয়েকটা কাগজপত্রে সই করে বিয়ে, বাড়িতে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানো, তারপরই ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাট।

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা!

হাসির জীবনে অমিয় কোথাও ছিল না। যৌবনকালে একশো ছেলে ভালবেসেছে হাসিকে। শিলচর জুড়ে ছিল তার প্রেমিকেরা। তাদের মধ্যে ছিল আমাদের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট খেলোয়াড়, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রনেতা, ভবঘুরে। তাদের অনেকের সঙ্গে হাসির দীর্ঘকালের সম্পর্ক। কোথায় ছিল অমিয়! পাত্র হিসেবেও অমিয় তো কিছুই না। সদ্য ব্যবসা শুরু করেছে। কয়েকটা অর্ডারে লাভ পেয়ে কিনেছে স্কুটার, দু'হাতে টাকা ওড়ায়, পোশাক কেনে। সেই অমিয় হাসির জীবনে এসে গেল! এসে গেল, আবার এলও না। সারাদিন টাটা-বিড়লা হওয়ার আশায় সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করে যখন অমিয় ফিরত, তখন সদর খুলে অমিয়কে দেখে একটু অবাক হয়ে এক পলকের জন্য হাসি ভাবত—আরে এ লোকটা কে? স্বামী? তার মনে পড়ত, সারাদিন সে অমিয়র কথা ভাবেইনি!

শরীরে শরীরে কথা হত ঠিকই। অমিয়র প্রথম দিকের ভালবাসা ছিল তীব্র, শরীরময়, আক্রমণাত্মক। হাসি সেই খেলায় আগ্রহভরে অংশ নিয়েছে; কিন্তু সে কতটুকু সময়ের ভালবাসা? শরীর জুড়োলেই তা ফুরোয়। তারপর আর আগ্রহ থাকে না অচেনা পুরুষটির প্রতি। হাসি তখন থেকে নিষ্ঠুর।

চিৎপুরের দিদি-জামাইবাবু এসে বলতেন—হাসি, তোমার বাবা-মা আমাদের দোষ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আমরা কী লিখব ওদের?

—দোষ! আপনাদের দোষ কী?

—দোষ নেই ঠিকই, তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমাদের বাসায় থেকেই তো ব্যাপারটা ঘটল।

ভালবাসা! হাসি ভারি অবাক হত। ভালবাসা কিসের! কাকে!

অমিয়কে? অমিয়কে তো সে কোনকালে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল কলকাতাকে। বিশাল কলকাতার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয়? অমিয়কে জানালায় এসে বসা চড়াইপাখীর মত তুচ্ছ মনে হত তার। যার সঙ্গে হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল বা তার শিলচরের অন্য প্রেমিকেরা—তাদের তুলনাতেও অমিয় কিছুই না। কিছুই না। অমিয় কেবল কলকাতায় হাসিকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিয়ের ছ'মাস পরে মাসী আর মেসোমশাই এসেছিলেন।

—এটা কী করলি হাসি? সেই ডিগবয়ের ছেলেটা বিয়েই করল না।

হাসি উত্তর দেয়, আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

—কী চেয়েছিলি?

হাসি মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল—কলকাতা।

তিন বছরে ডাকটিকিটটা ভিজে ভিজে আলগা হয়ে এসেছে। খামের গা থেকে এবার সাবধানে তুলে নেবে হাসি, একটা চৌকো দাগ থেকে যাবে কী? থাক। শরীর বহতা নদীর মত, শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না। অমিয়কে শরীরের বেশী দেয়নি হাসি।

সিলিংফ্যানের ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ঘূর্ণী বৃত্তটা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসি। উঠে দেখল রোদের মুখে বসেছে কালো মেঘ। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। পূবের বাতাসে পর্দা উড়ে আসছে। উদ্ভিদহীন কলকাতায় প্রকৃতির বন্য গন্ধ নিয়ে আসে বৃষ্টি।

পাশ ফিরতেই খুব অবাক হয়ে হাসি দেখে, শতরঞ্চির একধারে তার মাথার কাছেই একটা ছোট লালচে ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শিশু শরীর ইঁদুরটার, উদোম ন্যাংটো, মুখে নির্দোষ একখানা ভাব, চুপ করে মরে গেছে কখন। আহা রে! এত দূর এসেছিলি কেন? কিছু বলতে চেয়েছিলি আমাকে? লাল টুকটুকে হাত-পা, সুন্দর সতেজ লেজ, রেশমের মত রোমরাজি, ঠোঁটে গোঁফের নরম সাদাটে চুল। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাসি। তার একটু কষ্ট হয়। বিষ সে নিজে মিশিয়েছিল।

উঠে মধুকে ডাকে হাসি—ঘরগুলো খুঁজে দেখ মধু, ইঁদুরগুলো কোথায় কোথায় মরে পড়ে আছে। পচে গন্ধ বেরোবে।

চারটে বেজে গেছে। জমাইবাবুকে একটা ফোন করা দরকার। রিজার্ভেশনটা যদি পাওয়া যায়!

জলে কলকাতার ভঙ্গুর প্রতিবিম্ব পড়েছে, ভেঙে যাচ্ছে। জল হলে

এক কলকাতা অনেক কলকাতা হয়ে যায়। ঢাকুরিয়া থেকে বাস ধরে হাসি গড়িয়াহাটায় এসে পেট্রোল পাম্প থেকে জামাইবাবুর অফিসে টেলিফোন করে।

—জামাইবাবু, আমি হাসি।

—বল।

—আমার রিজার্ভেশনের কী হল?

—হয়নি। দার্জিলিং মেলে ভীষণ ভীড় হচ্ছে। এখন সামার-রাশ।

—রেলে যে কে আপনার বন্ধু আছে চেকার?

—থাকলেই বা, সিটি বুকিংগুলো দেখে এস না। তিনদিন ধরে লাইন দিয়ে বসে আছে লোক—কোথায় কত টিকিটের কোটা আছে সব তাদের মুখস্থ, একটা টিকিট কম পড়লে আস্ত রাখবে?

—এত লোক যাচ্ছে কোথায়?

—কলকাতা থেকে পালাচ্ছে ; আবার কলকাতায় পালিয়ে আসবে বলে।

—আমার মনে হয়, আপনি গা করছেন না।

—তা তো করছিই না।

—কেন?

—তুমি সুখের পাখী উড়ে যাবে, আর আমরা পড়ে থাকব হাঁফিয়ে ওঠা ভ্যাপসা কলকাতায়—তা কী হয়!

—আমার যে যাওয়াটা দরকার।

—কেন?

—যাব না কেন?

ওপাশে জামাইবাবু একটা শ্বাস ফেলে।

—হাসি, গতকাল অমিয় আমার কাছে এসেছিল।

হাসি তীক্ষ্ণ গলায় বলে—কেন?

—ভয় পেও না। সে তোমার চলে যাওয়া আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে আসে নি।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ও এসেছিল একটা ষ্টীমারঘাটের কথা বলতে।

—ষ্টীমারঘাট!

—ষ্টীমারঘাট। ও আজকাল মাঝে মাঝে একটা ষ্টীমারঘাট দেখতে পায়।

—তার মানে?

—তার মানে তোমাকেই আমারা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। ষ্টীমারঘাটের কথা আমি কী জানি। কোথাকার ষ্টীমারঘাট।

—তার আগে বল, ওর ব্যবসার অবস্থা কী?

হাসি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—বোধহয় ভাল না। বাজারে অনেক ধার জমে গেছে।

—আর এ সময়ে তুমি সুখের পাখী উড়ে যাচ্ছ?

—আমি কী করব জামাইবাবু?

ওপাশে জামাইবাবু আবার চুপ।

—আমার রিজার্ভেশনের কী করবেন বলুন? কাছে-পিঠের রাস্তা হলে আমি রিজার্ভেশন ছাড়াই চলে যেতাম। কিন্তু চারদিন ধরে যাওয়া তো সে ভাবে সম্ভব না।

—দেখছি।

—আমার কিন্তু সময় নেই। আর পনেরো দিনের মাথায় খুশীর বিয়ে। তারপর ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব। বুঝলেন?

—বুঝেছি। কিন্তু অমিয়র ষ্টীমারঘাটের কী হবে?

—আমি কী জানি।

—হাসি, অমিয়র ওজন কত?

হাসি হেসে ফেলে। বলে—আমি কী দাঁড়িপাল্লা?

—না। কিন্তু বৌরা তো স্বামীর ওজন জানে। জানা উচিত।

—ফোন রেখে দেব কিন্তু।

—আমি ইয়ার্কি করছি না। অমিয়কে দেখে মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি কে.জি.ওজন কমে গেছে।

হাসি একটা শ্বাস ফেলে। অমিয় বোধহয় তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তাতে হাসির কিছু যায় আসে না।

—জামাইবাবু, আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করি নি। আমাদের মধ্যে কোন ভুল-বোঝাবুঝি নেই।

—তোমার দিদির সঙ্গে আমার রোজ চারবার করে ঝগড়া হয়, আর ভুল বোঝাবুঝি? আমরা জীবনে কেউ কাউকে বুঝব না। কিন্তু গত চারমাসেও আমার ওজন দুই কে.জি.বেড়েছে।

—ওজনের কথা বলছি না।

—আমি ওজনের পয়েন্টেই স্টিক্ করতে চাই। হাসি, অমিয়র ওজন

কমে যাচ্ছে কেন?

—আমার রিজার্ভেশনের কথাটা মনে রাখবেন। ছেড়ে দিচ্ছি—

—ছেড়ো না। শোন, ষ্টীমারঘাটের কথা ও তোমাকে কখনো বলে নি?

—না।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্যের কী? ও আমাকে অনেক কথাই বলে না।

—কিন্তু ষ্টীমারঘাটের ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।

—কেন?

—ষ্টীমারঘাটটা ও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, আর এমন ভাবে বলে যে আমিও যেন সেটা দেখতে পাই। শুনতে শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

—কী রকম ষ্টীমারঘাট সেটা?

—খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি বহুদূর গড়িয়ে নেমে গেছে.....কিন্তু ফোনে অত সব বলা যায় না। তুমি ওর কাছে শুনো।

—আমি শুনব কেন জামাইবাবু? আমার কৌতূহল নেই।

—তুমি আসাম থেকে কবে ফিরবে হাসি?

—বললাম তো, খুশীর বিয়ে হয়ে গেলেই। ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব।

—সেটা তো ফেরা নয়। স্কুলে মানে বাগনানের কাছে যাবে, গ্রামে। কিন্তু তুমি অমিয়র কাছে কবে ফিরবে হাসি?

হাসি উত্তর দেয় না। ফোনটা খুব আস্তে ক্রাডলে নামিয়ে রাখে।

আজ কলকাতা বৃষ্টির পর বড় সুন্দর সেজেছে। সূর্যের শেষ আলো সিঁদুর-গোলা রঙ ঢেলেছে রাস্তায় রাস্তায়। গড়িয়াহাটার বাড়িগুলোর গায়ে সেই অপার্থিব রঙ জ্বলে ছায়াছবি। রাস্তাগুলো ভেজা, রাস্তার নীচু অংশে পাতলা জলের স্তর জমে আছে। সেই জল থেকে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব উঠে আসে। একা একা হাঁটতে বড় ভাল লাগছে হাসির। মোড়ের দোকানগুলোর শো-কেসে সে সুন্দর শাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল একটু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। কী ভীড় চারদিকে! তবু এ ভীড় বড় রঙীন। বাগনান থেকে হয়তো প্রায়ই আসা হবে না, কিন্তু পুরোনো ভালোবাসার টানে ছুটি-ছাটায় ঠিক চলে আসবে হাসি, উঠবে চিৎপুরে দিদি জামাইবাবুর কাছে। একা একা ঘুরবে কলকাতায় যেমন সে গত তিনবছর ধরে ঘুরেছে

এবং ক্লান্ত হয়নি। কলকাতার রূপ কখনো ফুরোয় না।

একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামতে বেড়ালটাকে ডিঙিয়ে গেল হাসি। পচা গন্ধ, কাছেই বসে কোনো নেমন্তন্ন-বাড়ীর এঁটো-কাটার রাশ খবরের কাগজে জড় করে বসেছে এক ভিখিরি মেয়ে তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। হাসি ট্রাম লাইন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তার মন বলে, আজও বলে— কলকাতা, কলকাতা।

চলে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমিয়, ঠিক সে সময়ে নিঃশব্দ পায়ে কালীচরণ এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হয়নি। অমিয় একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—চলে যাচ্ছিলেন? কালীচরণ জিজ্ঞেস করে। তার মুখে ঘাম, উৎকণ্ঠা।

—হুঁ।

—আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অমিয় চুপ করে থাকে।

—গত দুমাস কিছু চাইনি! জানতাম আপনি অসুবিধেয় আছেন। কিন্তু এখন আমার বড় ঠেকা। পেমেন্টের একটা তারিখ দিন এবার।

অমিয় জিজ্ঞেস করে—সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ হয়নি কেন কালীচরণ?

কালীচরণ একটু থমকে যায়। চেয়ে থাকে। অমিয় হাত বাড়িয়ে ওর ঘেমো হাতখানা ছুঁয়ে বলে—কাঠের সিঁড়িটা বড় পুরনো হয়েছে, বেড়াল বাইলেও শব্দ হয়। তুমি কী করে শব্দ না করে উঠলে? তুমি বেঁচে আছ তো! ভূত হয়ে আসনি তো কালীচরণ? কিংবা পাখায় ভর করে?

কালীচরণ একটু হেসে একটা ময়লা রুমালে মুখ মোছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হার্ডওয়ার বাজার যদিও কালীচরণের পায়ের তলায়, কিন্তু তবু বাইরের চেহারায় সে ভদ্রলোক থাকেনি। ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে লংক্লথের হাফ-হাতা জামা, পায়ে টায়ারের চটি।

—বাগচীবাবু, আমার মেয়ের বিয়ে। তিনহাজার যদি আপনার কাছে আটকে থাকে তো আমি গরিব, কী দিয়ে কী করব?

অমিয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে—দুটো সরকারী

অর্ডার আছে কালীচরণ, পনের হাজার টাকার। করবে?

—আপনি পেয়েছেন?

অমিয় মাথা নাড়ে—আমারই। কিন্তু আমি করব না। তুমি করো তো তোমাকেই ছেড়ে দিই।

কালীচরণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে—আপনি কত পারসেণ্ট নেবেন?

—এক পয়সাও না। শুধু পেমেণ্টের জন্য আমাকে একটু সময় দাও।

—অর্ডার দেখি—বলে কালীচরণ হাত বাড়ায়।

অমিয় অর্ডারের কাগজপত্র বার করে দেয়।

কালীচরণ কয়েক পলক অর্ডারের কাগজপত্র দেখে বলে—মাত্র আট পারসেণ্ট উঁচু দর দিয়েছেন! তাও হচ্ছে একমাস দেড়মাস আগেকার দর। গত একমাসে মেশিন পার্টস, কয়েল আর স্প্রীংয়ের দর দশ থেকে কুড়ি পারসেণ্ট বেড়েছে। পনেরো হাজার টাকার অর্ডার, অফিসার আর বিল ডিপার্টমেণ্টকে খাইয়ে হাজারখানেকও ঘরে তোলা যাবে না। পরিশ্রম পোষায়?

—তুমি করবে না?

কালীচরণ একটু হাসে—করব না কেন? ব্যবসা চালু রাখতে হলে কাজ ধরতেই হবে, লোকসান হলেও।

গায়ের জামা খুলে স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে রজত টেবিলের উপর শুয়ে ছিল। তার রায়চৌধুরী এখনো আসেনি। শুয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল—কালীচরণ, বাগচীর জায়গায় আমি হলে অর্ডার দুটো কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

—কেন?

—সরকারী অর্ডারের জন্য হাজারটা লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে। তুমি ভদ্রলোক হলে লোকসানের কথা বলতে না। পনের হাজারে তোমার অন্তত ছ'হাজার মার্জিন থাকবে।

কালীচরণ বিড় বিড় করে বলে—দেনা-পাওনার কথা উঠলেই সব জায়গায় খিচাং—

রজত ধমক দিয়ে বলে—দেনা-পাওনা আবার কী? বাগচীর তিন হাজার ঐ অর্ডারে শোধ হয়ে গেল। আর এসো না।

—তার মানে? তিন হাজার টাকা আমি এখনো পাই—

—না পাও না। তোমাকে সেনগুপ্ত এনেছিল, তার আমলে তুমি

সাপ্লায়ার ছিলে। পারো তো তাকে খুঁজে বের করো।

—তাকে পাব কোথায়?

—বাগচী তার কী জানে কালীচরণ? ছোট কোম্পানী, আট-দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল, আর লায়বিলিটি সব রেখে গেল—এটা কী মগের মুল্লুক?

—আমি তার কী জানি!

—তোমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তর ষাট আছে, আমি জানি! সে-ই তোমাদের পাঠাচ্ছে তাগাদায়। যাতে বাগচী বিপদে পড়ে। বাগচী ভাল লোক কালীচরণ, দেনা সে সব মেনে নিচ্ছে, সরকারী অর্ডার বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো গড়বড় করলে ঝামেলা হবে।

কালীচরণ চুপ করে থাকে।

রজত হাই তুলে বলে—সকলের দিন সমান যায় না। বাগচী তোমাদের অনেক বিজনেস দিয়েছে। এখন বেরোও—

কেউ তার হয়ে বোঝাপড়া করুক, কিংবা তাকে করুণা করুক, এটা আজও পছন্দ করে না অমিয়। সেইটুকু অহঙ্কার তার এখনো আছে। তবু সে কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

দুর্বল চোখে একটু চেয়ে থেকে কালীচরণ উঠে পড়ে।

শ্লথ ভঙ্গীতে টেবিল থেকে রজত তার চেয়ারে নেমে বসে। অলস ভঙ্গীতে বুশ-শার্টটা চেয়ারের পিঠ থেকে খুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে অমিয়র দিকে তাকায়। চোখে ভর্ৎসনা।

কেমন লজ্জা করে অমিয়র। চোখ সরিয়ে নেয়। অর্ডার দুটো রাখবার জন্য তাকে অনেকবার কল্যাণ বলেছিল। তিন-চার মাস কোন অর্ডার পায়নি অমিয়, এই দুটো পাওয়াতে দিন সাতেক আগে তারা তিনজন অফিসঘরে একটা ছোট্ট উৎসব করেছিল। সবীর থেকে রেজালা আর তন্দুরী রুটি এসেছিল, আর কে-সি দাসের সন্দেশ। কল্যাণ মুখার্জী, রজত সেন আর অমিয় বাগচী—তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। একটা ঘরে তিনটে টেবিলে তাদের তিনটে আলাদা কোম্পানী। যে যার ব্যবসার ধান্দায় ঘোরে। রোজ দেখাও হয় না। কিংবা খুব কম সময়ের জন্য দেখা হয়। তবু কী করে যেন তাদের মধ্যে বুনো মোষের মত পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা এসে গেছে। তারা কেউ কখনো তিনটে কোম্পানীকে এক করার কথা বলেনি। তারা বন্ধুও নয় তাহলে কী? তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বাগচীর কিছু হলে আপনা থেকেই রুখে দাঁড়ায় মুখার্জী আর সেন, যেমন সেনের

কিছু হলে রুখে ওঠে বাগচী আর মুখার্জী। বোধহয় এই ঘরটাই তাদের এই সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে।

সেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমিয় মাথা নীচু করে ছিল।

রজত ইণ্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় অমিয়র টেবিলে। বলে—আপনার ঠোঁটে সন্দেশের গুঁড়ো লেগে আছে বাগচী, মুছে নিন।

অমিয় একটু হাসে। সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে—আমার দ্বারা সাপ্লাইটা হত না সেন।

রজত ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে—গত তিন মাস আপনি বিজনেস পাননি বাগচী। এই অর্ডারটা ছাড়তে আপনাকে আমরা বারণ করেছিলাম।

—আমি পারতাম না।

—আমবা চালিয়ে দিতাম। আফটার অল উই আর কমরেডস।

রজত ওঠে। তার ডেস্ক, আলমারী বন্ধ করতে করতে হঠাৎ একটু হেসে বলে—জার্মানী থেকে আপনাকে কী পাঠাব বলুন তো! ঘড়ি? শেভার? নাকি কলম? তার চেয়ে জব ভাউচার একটা পাঠিয়ে দেব বরং—কী বলেন?

রজত নিজেই হাসে—কিন্তু মিসেসকে রেখে আপনি তো যাবেন না। গিয়েও শান্তি পাবেন না। ম্যারেডদের ঐ এক বিপদ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমিয় তার গভীর অন্যমনস্ক মুখ তুলে বলে—সেন, লক্ষ্য করেছেন কালীচরণের পায়ের কোন শব্দ হয় না!

—কী বলছেন? রজত ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—বলছি, যাদের পায়ের শব্দ হয় না তারা খুব ডেঞ্জারাস। সেনগুপ্তরও হত না।

সেনগুপ্তর উল্লেখে রজতের মুখটা ঝুলে পড়ে। চাপা গলায় সে বলে—বাস্টার্ড। আপনাকে কী সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ করেছিল বাগচী? কী করে তবে সে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিল, আদায় করে নিল চার চারটে বিল-পেমেন্ট, সমস্ত লায়বিলিটি কী করে আপনার ঘাড়ে ফেলে গেল?

অমিয় একবার হাত উল্টে তার অসহায়তা প্রকাশ করে মাত্র। কথা বলে না। হতাশ গলায় রজত বলে—ব্যবসা আপনার কর্ম নয় বাগচী। আপনি ভীতু হয়ে যাচ্ছেন, লোককে দাবড়াতে পারেন না।

সেনগুপ্তর পায়ের কোন শব্দ হত না—এই সত্যটা আবিষ্কার করে

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অমিয়। কালো ছিপছিপে সুপুরুষ এবং হিংস্র সেনগুপ্ত ছিল বার্ড কোম্পানীর চাকরে। চাকরি নামে মাত্র, সে ছিল কোম্পানীর টিমের নাম-করা গোলকীপার। খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছিল। পোস্ট থেকে পোস্টে উড়ে শট আটকাত, বহুবার পেনালটি ধরেছে। অবধারিত একটা লিফট্ পেত, কিন্তু সেবার হাঁটুর মালাইচাকী ভেঙে পড়ে রইল ছ'মাস। উন্নতির আর আশা নেই দেখে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে এল অমিয়র সঙ্গে।

তখন অমিয় মারাত্মক পোশাক পরত, দারুণ হাসত, পীচের রাস্তার মত গড়গড়ে ইংরাজী বলত। সাপের মত সাবলীল ছিল তার নড়াচড়া, ক্রূর চোখ, ঘন ভ্রূ। সেনগুপ্ত তার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকত। একটা সময় ছিল যখন সেনগুপ্তর মত বিপজ্জনক ছেলেকে নিপুণ ভাবে চালাত অমিয়। তখন সাপ্লায়ারেরা সাবধানে মাল দিত, ছ'মাস ন'মাস তাগাদা করত না। অর্ডার আসত ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখা, চালাক, সাহসী অমিয় হিংস্র মারকুট্টা সেনগুপ্তকে ব্যবহার করত ব্যবসার ডেকর হিসেবে, কখনো তাকে বানাত দেহরক্ষী, কখনো তাকে আউটডোরে ঘুরিয়ে আনত সেলসম্যান হিসেবে! সেনগুপ্তকে তৈরি করেছিল সে-ই। তারপর কবে থেকে—কবে থেকে যেন—বহু দূরের এক অচেনা নির্জন ফেরীঘাট জাহাজের মত ধীরে অমিয়ের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। তখন থেকেই সে মাঝে মাঝে সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে চমকে উঠত। সে দেখতে পেত—তার সামনে স্বাভাবিক পোশাক পরা সেনগুপ্ত নয়—সেনগুপ্তর পরনে কালো শর্টস্, লাল টুকটুকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা দুটো হাত থাবার মত উদ্যত হয়ে আছে, মাথায় টুপি, টুপির ছায়ায় দুটো আলপিনের মত চোখ, ফণা তুলে দুলছে এক হিংস্র গোলকীপার, অমিয়র সব রাস্তা বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে।

মানুষের পতনের কোন শব্দ হয় না। তবু আশপাশের কিছু লোক ঠিক কেমন করে টের পায়, এ লোকটার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কোনদিন দীর্ঘ টেণ্ডার টাইপ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সেনগুপ্ত হয়তো দেখেছিল, অমিয় ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। কিংবা হয়তো কোনদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে দুজনে বেরোনোর সময় অন্ধকার সিঁড়িতে সেনগুপ্তর আগে আগে নামতে দ্বিধা করেছে। কিংবা এরকমই কোন তুচ্ছ কিছু লক্ষণ দেখেছিল সেনগুপ্ত। বুঝেছিল ব্যবসাতে অমিয়র দিন শেষ, তার শুরু। বুঝেছিল সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা। বুঝেছিল আরো

অনেকে। সবার শেষে বুঝেছে অমিয়। স্পষ্টই নিজের ভেতরে সে এখন এক দিনাবসান টের পায়, প্রত্যক্ষ করে সূর্যাস্ত। বহু দূর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এক নির্জন ফেরীঘাট, তার জেটি, তার অতলান্ত জল....অমিয় মুখ তোলে—কিছু বলছেন সেন?

—একটা মেয়েকে কী করে রিফিউজ করতে হয় বাগচী? আমি কোন ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি জার্মানীতে গিয়ে চিঠি দেব?

অমিয় একটু হাসে—ল্যাংগুয়েজের দরকার হয় না সেন। রিফিউজাল মনে থাকলেও লোকে ঠিক বুঝে নেয়। ডোণ্ট বদার।

—মাইরি! তাহলে বেঁচে যাই।

অমিয় হাসে।

—চলি বাগচী। সিগারেটের প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন। যদি রায়চৌধুরী আমার মোটর পার্টস্ নিয়ে আসে তবে আমার হয়ে ওর পাছায় তিনটে লাথি কষবেন—তিনটে— ভুলবেন না—

অমিয় অনেকক্ষণ বসে থাকে। অফিসঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। অমিয় আলো জ্বালে না। রাস্তার নানা আলোর ছায়াছবি এসে সিলিংয়ে কাঁপতে থাকে, দেয়ালে চমকায়। কাকের পাখার মত অবসাদ নেমে আসে অমিয়র শরীর জুড়ে।

বাড়ির দেয়ালের কোন গোপন কোণে হঠাৎ উঁকি দেয় এক অশ্বত্থ চারা। কেউ লক্ষ্য করে না। কলতলায় শ্যাওলা জমে, দেয়ালের চাপড়া খসে পড়ে। কেউ লক্ষ্য করে না। কিন্তু ঐ ভাবেই অলক্ষিতে শুরু হয় একটা বাড়ির ক্ষয়। অমিয় নিজের ভিতরে সেই অশ্বত্থের গোপন চারাটিকে খুঁজছে। অনুসন্ধান করছে। শ্যাওলা জমল কোথায়, কোথায়ই বা খসে পড়ছে চাপড়া। খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এ তো ঠিকই যে সে সেনগুপ্তকে ভয় পেতে শুরু করেছিল একদিন। অথচ ভয়ের তেমন কারণ ছিল না। গোলকীপারের পোশাক বহুকাল আগেই ছেড়ে ফেলেছিল সেনগুপ্ত, খুলে রেখেছিল দস্তানা, ক্রমে হয়ে আসছিল অমিয়র বশংবদ। সাপুড়ে কবে আবার তার ঝাঁপির সাপকে ভয় পেয়েছে?

কিন্তু এর জন্য তো সেনগুপ্ত দায়ী নয়।

সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করত অমিয়, আর তার স্কুটার। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনে থেমে ভারী স্কুটারটা অবলীলায় টেনে তুলত সিঁড়ির তলায়, শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙত অমিয়। ভাবত দরজা বন্ধ করেই সে এক সুন্দর জগতে চলে যাবে। কিন্তু প্রায়দিনই সে অর্গলহীন দরজা ঠেলে এক আবছা

অন্ধকার ঘরে ঢুকত। পরিত্যক্ত বাড়ির মত ঘর। দেখত, হাসি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। মুখোমুখি হতে হাসির চোখে সে বিস্ময় দেখতে পেত। কোনদিন বা দেখত, হাসি ঘরে নেই।

পরস্পর আশ্লিষ্ট রতিক্রিয়ার সময়ে সে কি দেহসংলগ্ন হাসির শীৎকার শোনেনি? অনুভব করেনি তার শিহরণ, বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা? লক্ষ্য করেনি মুখমণ্ডলে মুক্তোর মত স্বেদবিন্দু? করেছিল। হাসির শরীরে অর্গলহীন দরজা খুলে ফেলে অমিয় দেখেছে, সেখানেও এক আবছা অন্ধকার ঘর—পরিত্যক্ত ঘরের মত নিরিবিলি—সেখানে হাসি সাজেগোজে, চুল বাঁধে, আয়নায় দেখে মুখ, প্রতীক্ষা করে—অমীয় সেই ঘরে ঢুকলে হাসি যেন অবাক মুখ তুলে নীরব প্রশ্ন করে—তুমি কে?

মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল একদিন। গতবারে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে অনুর বিয়েতে যাবে তারা। সে আর হাসি। ধুতি-পাঞ্জাবিতে কোনদিন অমিয়কে দেখেনি হাসি। বিয়েতে যাওয়ার সময়ে অমিয় সেদিন ওয়ার্ডরোব খুঁজে হাঁটকে বের করেছিল পাঞ্জাবী আর ধুতি। বহু যত্নে পরিশ্রমে ধুতির কোঁচা কুঁচিয়েছিল সে। অন্য ঘরে তখন হাসি সাজগোজ শেষ করে সবশেষে তার বেনারসী পরছে। হাসি বেরিয়ে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অমিয়কে দেখে ভ্রূ ওপরে তুলে হেসে ফেলবে, বলবে—ওমা, তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না। এরকমই হবে বলে ভেবেছিল অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ঘরে, ও ঘরের দরজার দিকে মুখ, মুখে অপ্রতিভ হাসি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটুও অবাক হয়নি। ঘড়ি দেখে কেবল বলেছিল—বড় দেরী হয়ে গেল, বর এসে গেছে বোধহয়—তোমার হল? একসঙ্গে তারা বেরলো, ট্যাক্সিতে উঠল, গেল বিয়ে-বাড়ি। সেখানে অমিয়কে পরিবেশন করতে হয়েছিল, বরযাত্রীদের তদারকও। দৌড়-ঝাঁপে পাঞ্জাবির ভাঁজ গেল নষ্ট হয়ে, ধুতি গেল দুমড়ে-মুচড়ে, ঝোল-তেলের দাগ ধরল তাতে। ফেরার সময়ে আবার ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসছিল তারা। অমিয়র মুখে বিকেলের প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসির সামনে দাঁড়ানোর সেই অপ্রতিভ হাসিটি কখন বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ডুবে গেছে। শরীরের ঘামে, ঝোলে, তেলে ন্যাকড়া হয়ে গেছে তার পোশাক। হাসি তবু লক্ষ্য করেনি। ট্যাক্সিতে হাসির খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ আসছিল, আর প্রসাধনের সুবাস, গয়নার টুং-টাং শব্দ। অভিজাত মহিলাকে ভিখিরি যেমন দেখে, তেমনই হাসির দিকে ভয়ে ভয়ে একবার চেয়েছিল

অমিয়। বলেছিল—হাসি, আমি আজ অন্য পোশাক পরেছিলাম। তুমি দেখনি।

হাসি চমকে বলল—কৈ?

অমিয় হাসল—দেখছ না?

হাসি ভ্রূ কুঁচকে বলল—নতুন পোশাক কোথায়, এ তো ধুতি আর পাঞ্জাবি, তুমি তো প্রায়ই পর।

—পরি! কবে পরেছি?

—পরনি? হাসি একটু ভেবে-টেবে বলে—গতবার মিঠুর কাকার শ্রাদ্ধের সময়ে পরেছিলে না?

—না। অফিস থেকে এসেই তো তোমাকে নিয়ে বেরোলাম, পোশাক পাল্টানোর সময় ছিল না।

—তাহলে বোধহয় জামাইবাবুদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে।

—না।

—তবে নিশ্চয়ই দীপালীর বিয়ের সময়ে—

—তাও নয় হাসি।

—কী জানি! আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পরেছ, আমি দেখেছি।

—না হাসি, তুমি দেখনি।

হাসি একটু হাসল, তারপর বলল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে। বাঃ বেশ তো, একদম নতুন মানুষ! তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না!

শুনে কেমন একটু ভয় এসে ধরেছিল অমিয়কে।

এই সব তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কি মানুষের ভয় জন্ম নেয়! মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়! গুরুত্ব না পাওয়ার ভয়!

গির অরণ্যে একবার সিংহ দেখতে গিয়েছিল অমিয়। বহুকাল আগে। দেখেছিল পিঙ্গল জটার মাঝখানে রাজকীয় গম্ভীর মুখ সিংহ বসে আছে, তার চারদিকে কয়েকটা সিংহী ঘুর-ঘুর করে কাছে আসছে, গা শুঁকছে, গড়-গড় শব্দ করে জানাচ্ছে তাদের প্রেম। পিঙ্গল জটার সিংহ গ্রাহ্যই করছে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ, উদাসী, নির্মম সিংহকে দেখেছিল অমিয়, দেখেছিল তার ভয়ঙ্কর পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, নিষ্ঠুরতা। বারে বারে তার পায়ের কাছে মাথা নত করে দিচ্ছে প্রেমিকারা, সে ফিরেও দেখছে না।

সেই সিংহটির কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতাকে বুঝতে পারে অমিয়, আজ। সে স্কুটারের পিছনে হাসিকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাথিড্রাল

রোড়ে উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করেছিল, মিষ্টি মোলায়েম কয়েকটা কথা মনে মনে তৈরী করেছিল আগে থেকে। বিয়ের পর সে কত খুশী করতে চেয়েছে হাসিকে, নিজেকে বার বার নানা পোশাকে সাজিয়ে ডামির মত দাঁড়িয়েছে হাসির সামনে। হাসি তাকে ভালবাঁসেনি।

গির-এর প্রায়ান্ধকার অরণ্যে একটা সিংহকে প্রায়ই ভাবে অমিয়। সেই সিংহকে কেউ নারীপ্রেম শেখায়নি। প্রকৃতিদত্ত পুরুষকার বলে সে উদাসী, নির্মম! মানুষেরাও কী নয় সেই সিংহের মত! পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, পিঙ্গল কেশর ঘেরা মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার— পুরুষ এরকমই ছিল বহুকাল থেকে। কে তাকে শেখাল নারীপ্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা!

বলতে গেলে তখন থেকেই অমিয়র পতনের শুরু, যখন সে হাসির কাছে ক্যাথিড্রাল রোডে, ময়দানের সুন্দর বাতাসে স্কুটারে ভেসে যেতে যেতে ভিক্ষা চেয়েছিল হাসিকে। তখনই তার পতনের, ক্ষয়ের প্রথম অশ্বত্থচারাটি উঁকি দিয়েছিল অলক্ষ্যে।

সেই পতনের প্রথম চিহ্ন ছিল এই, সে সারাদিন হাসির কথা ভাবত। নির্বিকার হাসির কথা, তার নিষ্ঠুরতা, উপেক্ষা—ভাবতে ভাবতে তার ঘুম হত না। ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর বিলেতফেরৎ এঞ্জিনীয়ারটির কথা বলত হাসি, বলত তার শিলচরের প্রেমিকদের কথা, তার মনিপুরী নাচের কথা। শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে যেত অমিয়। কিনে আনত পোশাক প্রসাধন—হাসি মনের মত সাজত, হাসিকে খুশী করার জন্য সুন্দর কথা ভেবে রাখত সারাদিন, অন্যমনস্ক হাসির কাছে অনর্গল বলত—সে একদিন বড় হবে, খুব বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট্, বিজনেস্ ম্যাগনেট। সে হাসির জন্য শাড়ী কিনেছিল, গয়না, চমৎকার সব আসবাব, একটা ফ্রিজও। হাসি কিছুই তেমন আদর করে নেয়নি। অমিয়কেও না। রাতে শরীরে শরীর মিশিয়ে দিত অমিয়, মিশিয়ে ভাবত— পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে! তারপর মুখের স্বেদবিন্দু মুছে তৃপ্ত হাসি যখন পাশ ফিরে ঘুমোত, তখন উত্তপ্ত মাথায় সারা রাত ছিল অমিয়র জেগে থাকা। নিজের সেই পতন তখনও টের পায়নি অমিয়, তখনো গির অরণ্যে দেখা পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সেই সিংহের ছায়া তার চোখে পড়ত না। সে আধোঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো তখন, খুব জোরে স্কুটার চালাতে ভয় পেত, তখন থেকেই তার নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মক্ষমতার ওপর সন্দেহ জন্মাতে থাকে। আর জন্ম নেয় ভয়।

ব্যবসা হচ্ছে তারের ওপর হাঁটা। সবাই লক্ষ্য রাখে, মানুষ কখন টলছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কখন পা ফেলছে না ঠিক জায়গায়। লক্ষ্য রেখেছিল তার সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর সেনগুপ্ত। সি-এম-ডি-এর একটা বিল পেমেন্ট গোপনে আদায় করেছিল সেনগুপ্ত চেক ক্যাশ করেছিল। অমিয় টের পেয়েছিল দেরীতে। দুর্দান্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল খুব। সেনগুপ্ত তার ক্যাপিট্যাল তুলে নিয়ে গেল। আর অন্যমনস্ক, দুঃখিত অমিয়র চোখের আড়ালে আদায় করে নিয়ে গেল আরো তিনটে বিল-পেমেন্ট। সেগুলো টের পেতে আরো অনেক দেরী হয়েছিল তার। কলকাতার রাস্তার ভীড়ে আজও সেনগুপ্তকে খুঁজে বেড়ায় অমিয়। কিন্তু দেখা হলে কী করবে তা বুঝতে পারে না। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, কালো শর্ট, লাল টুকটুকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা দুটি উদ্যত হাত, টুপির ছায়ায় আলপিনের মত দুটি হিংস্র চোখ—সেনগুপ্ত ফনা তুলে দুলছে। পোস্টে পোস্টে উড়ে যাচ্ছে সেনগুপ্ত, পেনালটি আটকাচ্ছে বেতের মত শরীর বেঁকিয়ে। আশ্চর্য! সেনগুপ্তর খেলা কোনদিনই দেখেনি অমিয়, তবু চোখ বুজলেই ঐ কাল্পনিক ভয়ঙ্কর দৃশ্যটিই সে দেখতে পায়।

বাইরের লড়াইয়ে সে হারতে থাকে, সে তত ভিতরে ঢুকে কল্পনার দৃশ্য দেখে। কল্পনায় প্রতিশোধ নেয়; কল্পনায় ভয় পায়। হাসির জন্যই কী? কে জানে!

অমিয় আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই উঠল। দু-একটা কাগজ গুছিয়ে রাখল, বন্ধ করল ডেস্ক, চাবি কুড়িয়ে নিল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকেই বৃষ্টির গন্ধ পায় অমিয়। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে।

গাড়ি-বারান্দার তলায়, এক ভীড় লোক বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুটারটা ফুটপাথে তুলে রেখেছে আহমদ। স্কুটারটা ছুঁয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি একটুক্ষণ দেখে অমিয়। তারপর স্কুটারটা টেনে বৃষ্টিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে তার প্রিয় স্কুটার চলে লঞ্চের মত জল ভেঙ্গে। অমিয় ভিজতে থাকে। কপালের ঘামের নোনা স্বাদ জলে ভিজে গড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তার জিভ। একটা সুন্দর কাচের বাসন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে যেমন দেখায়, বৃষ্টির ভিতর তেমনি শতধা বিদীর্ণ কলকাতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চারদিকের কাচের টুকরোর মত ধারালো, রঙীন, ভঙ্গুর কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গড়িয়াহাটা পর্যন্ত একটানা চলে এল সে। তারপর খাড়াই ভেঙে

স্কুটার উঠতে থাকে গড়িয়াহাটা ব্রীজের ওপর, ধনুকের পিঠের মত সম্মুখ আড়াল করে উঠে গেছে রাস্তা। স্কুটারের মেশিন গোঙাতে থাকে ভয়ঙ্কর। বরাবর এইটুকু উঠতে ভাল লাগে তার। ঝড় তুলে স্কুটার উঠতে থাকে। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে উঠে এলে হঠাৎ দিগ-দিগন্তের বাতাস ঝাপটা মারে এসে, চারিদিকে বহু দূরের বিস্তার ডানা মেলে দেয়। সামনে স্বচ্ছন্দ উৎরাইয়ের শেষে তার বাসা। বাসায় হাসি।

প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা বর্শাফলকের মত ঝকঝকে হয়ে ছুটে আসে। মুখের চামড়া ফেটে যায়। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটিতে বাতাস লাগল। বৃষ্টির ফোঁটা খরশান। স্কুটার টাল খায় এখানে। ডান দিকে একটা অন্ধকার মাঠে বিস্ফোরকের মত বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। এমন বাদলার দিন—এই দিনে হাসির কাছে ফিরে গিয়ে কী হবে অমিয়র?

অমিয় উৎরাই ভেঙে নেমে আসে। বড় রাস্তার ওপর ঐ দেখা যায় অমিয়র বাসা। দোতলায় আলো জ্বলছে, উড়ছে সবুজ পর্দা। বাইরের দিকে একটা ঝুল-বারান্দা। অমিয় একপলক তাকায়। তারপর অচেনা বাড়ির দিকে চেয়ে যেমন চলে যায় রাস্তার লোক, তেমনিই না থেমে চলতে থাকে অমিয়। স্কুটার ভেসে যায়।

বহুদূর পর্যন্ত সোজা চলে তার স্কুটার। তারপর বাঁক নেয়। রাস্তার আলো এখানে ক্ষীণ, বহু দূরে দূরে। দু-ধারে গাছ-গাছালি, ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, রাস্তায় লোকজন বিরল। এক-আধটা দোকান খদ্দেরহীন, আলো জ্বেলে বসে আছে দোকানী। এই সব রাস্তা পার হয়ে অমিয় স্কুটারের আলো পড়ে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সাদা লোহার গেটে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় লাফায় হাল্কা স্কুটার, ভেঙ্গে পড়তে চায়। অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে হাতল সোজা রাখে। লেভেল ক্রসিংয়ে লাইনের মাঝখানে গভীর খন্দ, তাতে জল জমে আছে। ঝাঁকুনীতে ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়। গর্তে পড়ে জলে ঢেউ তোলে স্কুটার। অমিয়র জুতো-মোজা ভিজে যায়। লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারে ফাঁকা জমিতে দু-একটা ঘুমন্ত বাড়ী চোখে পড়ে। স্কুটার গোঙায়, তবু এগোয় ঠিক। বহুকাল আসা হয় না এদিকে। রাস্তাটা একটু গোলমেলে লাগে, স্কুটার থামিয়ে হেডলাইটটা বার কয়েক চারধারে ফেলে অমিয় স্কুটার ছাড়ে। এগোয়। অনেকটা গিয়ে ডানধারে ইঁটখোলাটা দেখতে পায় অমিয়। নাবাল মাঠে জল জমে গেছে। কী গম্ভীর ব্যাঙের ডাক। মনে হয় রাত নিশুতি হয়ে গেছে। ইঁটখোলার গা বেয়ে একটা শুঁড়ি পথ। দুধারে এই

বর্ষায় আগাছা জন্মেছে খুব। পিছল হয়েছে রাস্তা, ক্ষয়ে গেছে। সেই রাস্তায় স্কুটার এগোয় না। এঁটেল মাটিতে চাকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরতে থাকে। অমিয় টেনে তোলে। আবার এগোয়।

একটা নিমগাছ ছিল এখানে, আর কলার ঝাড়। সামনে উঠোন। মনে করতে চেষ্টা করে অমিয়। স্কুটার অনিচ্ছায় বহন করে তাকে। অনেকটা ভিতরে ঢুকে যায় সে। চারিদিকে বাড়ীঘর নেই। আলো নেই। কোন মানুষ চোখে পড়ে না। অমিয় এগুতে থাকে। আঁকা বাঁকা পথে স্কুটার ঘোরে। কাদা ছিটকে আসে, ব্যাঙ লাফায়, জলের কলা কল শব্দ হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায় জলে-স্থলে। অমিয় প্রাণপণে চেয়ে দেখে, চিনতে চেষ্টা করে জায়গাটা। বহুকাল আশা হয়নি। বহুকাল।

স্কুটার লাফিয়ে উঠে একটা কলার ঝাড়ে আলো ফেলে এক মুহূর্তের জন্য। আভাসে একটা নিমগাছ দেখা যায় অবশেষে। উঠোন জলে ভাসছে। একটা অন্ধকার বেড়ার ঘর, টিনের চালে অবিরল বৃষ্টির শব্দ উঠছে। অমিয় স্কুটার থেকে নেমে উঠোনের আগল ঠেলে গোড়ালি ডুব জলে পা দেয়। ডাক দেয়—খুড়ীমা! ও খুড়ীমা!

দরজা খুলতেই একটা হ্যারিকেনের ম্লান, হলুদ আলো দেখা যায়।

—কে?

অমিয় বারন্দায় উঠে আসে। একটা স্যাণ্ডো গেঞ্জী গায়ে বোকা চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শোভনাদির ছেলে ভাসান। অমিয় চিনতে পারে।

—ভাসান, আমি অমিয় মামা। খুড়ীমা কেমন আছে?

ছেলেটা ঠিক চিনতে পারে না প্রথমে, বিশ্বাস করতে পারে না। বোকা চোখে চেয়ে থেকে একটু সময় নেয় বুঝতে। তারপর বলে—অমিয়মামা? তুমি এই রাতে? কী হয়েছে?

অমিয়র হঠাৎ লজ্জা করতে থাকে। কী বলবে সে! এত রাত্রে মানুষ বড় জোর বাড়ী ফেরে। কোথাও যায় না।

ভিতর থেকে ঘুম-ভাঙা বুড়ি গলায় কে জিজ্ঞেস করে—কে রে? কে এল রে ভাসান?

—অমিয়মামা।

—কে অমিয়?

ভাসান আলোটা সরিয়ে দরজা ছেড়ে বলে—ভিতরে এসো অমিয় মামা। দিদিমা ভাল নেই। হার্ট খুব খারাপ।

অমিয় তার ভেজা জুতো ছাড়ে। জামা-প্যান্ট থেকে যতদূর সম্ভব জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান আলোয় বহুদিন আগেকার সেই ঘরখানা দেখে। হ্যারিকেনের গন্ধে ঘর ভরা, বিছানায় মশারি ফেলা! মশারির ভিতর হাতপাখা নড়ার শব্দ। খুড়িমার কাছে মা মরার পর বহুদিন শুয়েছিল অমিয়। ঘুমের মধ্যেও খুড়িমার পাখা নড়ত নির্ভুল ভাবে।

—কে এলি রে? মশারির ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে।

—আমি খুড়ীমা, আমি অমিয়।

একটা অস্ফুট শব্দ করে খুড়ীমা, গোঁজা মশারির এক দিক তুলে বুড়ো মুখখানা বের করে। চোখে আলো লাগতে মিট মিট করে তাকিয়ে বলে—অমিয় মানে মেজঠাকুরের ছেলে?

ভাসান ধমক দেয়—তো আর কে অমিয় আছে?

—হ্যারিকেনটা তোল তো ভাসান, দেখি। অমিয়, কাছে আয়। দেখি তোর গা। ঠিক তুই তো?

ভাসান বলে—শার্টটা ছেড়ে ফেল অমিয়মামা। ইস্! তুমি খুব ভিজে গেছ।

অমিয় বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—খুড়ীমা, তুমি এত বুড়ো হলে কবে? এত বুড়িয়ে যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার!

—তুই কি এই বৃষ্টিতে এলি? কী হয়েছে তোর? খারাপ খবর আছে কিছু? কাছে আয় না, দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—তুমি কাকার থেকে চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলে, তবে বুড়ো হলে কী করে?

মশারি তুলে খুড়ীমা উঠে বসে। গা উদোম। কাপড় খসে গেছে। কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে বলে—তোর কাকা গেছে বিশ বছর আগে, তখনই আমার পঞ্চাশ পুরে গেছে। বয়সের হিসেব তুই কি জানবি? মেজঠাকুরের বুড়োবয়সের সন্তান তুই! তোর জন্মের সময়ে মেজোঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, তোর মার চল্লিশ। তোর এখন বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

—তবে? বয়সের হিসেব ঠিক রাখতে পারিস না তোরা। কাছে আয় তো দেখি, কী রকম ভিজেছিস!

খুড়ীমা হাত বাড়িয়ে অমিয়কে ধরে কাছে টেনে নেয়। সমস্ত শরীরে মরা হাতখানা দিয়ে সেঁক দেওয়ার মত চেপে চেপে ধরে তার শরীর

দেখে।

—তুই কী পাগল? এমন কাক-ভেজা কেউ ভেজে? ভাসান, জামাকাপড় দে এক্ষুনি, তার আগে গামছা দে। রাখুকে বল এক পাতিল আগুন করতে, সেঁক না দিলে ও মরে যাবে।

—খুড়ীমা, তুমি কেমন আছ?

—কী জানি! ডাক্তার বলেছে, ভাল না। কাপড়ে-চোপড়ে হেগে-মুতে ফেলি, আর বুকে একটা চাপ ব্যথা হয়। কতকাল আসিস না।

—আজ তো এলাম।

—এটা কী রকম আসা। তোর মাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার ভরসায় তোকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যায়। বাইরের নিমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে। বহু কালের পুরনো ঝগড়া শত্রুতা তার সঙ্গে। ক'দিন পর আমিও তো তার কাছে যাব, এখন যদি তোর কিছু হয় তো সে আমাকে আস্ত রাখবে? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলি, তুই কেমন পাগল? ও ভাসান—

—দিই।

—তাড়াতাড়ি দে।

—খুড়ীমা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, চলে যাব। এখন আর জামা-কাপড় ছেড়ে কী হবে?

—তোর বর্ষাতি নেই? ছাতা কিনিসনি? ওরে তোরা ওঠ, ও ভাসান, পাখীকে বল চা করবে, রাখুকে ঠেলে তুলে দে, পাতিলের আগুনটা করে দিক, আমি ওকে সেঁক দেব। অমিয়, কেন এসেছিস? অমিয়র বলতে ইচ্ছা করে, এই জন্যই। কিন্তু তা বলে না অমিয়, বলতে নেই। চুপ করে থেকে তার বুকে পিঠে মাথায় কঙ্কালসার হাতখানা অনুভব করে সে। এইটুকুর জন্য এত রাতে, দীর্ঘ পথ জল কাদা ঝোড়ো বাতাস ভেদ করে এসেছে সে।

—কেন এসেছিস? আমাকে দেখতে? আমি মরে গেলাম কিনা দেখতে এসেছিস? বলতে বলতে খুড়ীমা একটু কাঁদে। বলে—সত্যিই খুড়ীমাকে ভালবাসিস অমিয়? তোর বৌ বাপের বাড়ীতে গেছে নাকি? বাচ্চা-কাচ্চা হবে না তো?

—না।

—তোর বাচ্চা হয় না কেন রে? অ্যাঁ! কী করিস তোরা? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি? বুড়োবয়সে হলে মানুষ করার সময় পাবি না।

এখন হইয়ে ফেল।

—চুপ কর খুড়ীমা।

—আমার তো ছেলে নেই। ভাসানকে বলি তোর খবর আনতে। তা সে তোর দোরগড়ায় গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, ভিতরে ঢোকে না, এসে বলে—মামা বাড়ীতে থাকে না, মামীকে চিনি না, লজ্জা করে। আমি অবাক হই। মামীকে আবার চেনার কী আছে। গিয়ে কোলে বসে পড়বি, আবদার করবি, জ্বালাবি—তাতেই চিনবে।

—চুপ কর, তুমি চুপ কর।

—চুপ করব কেন? অমিয়, কেন এসেছিস?

—তোমাকে দেখতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে রাখী আর পাখী। কেটলীতে জল ফোটে। পাতিলে কাঠকয়লার আগুন জ্বালে রাখী। অমিয় খালি গায়ে, ধুতি পেঁচিয়ে বসে। তাকে ঘিরে হ্যারিকেনের আলোয় একটা ছোট উৎসব শুরু হয়।

—আমার কেউ নেই অমিয়। শোভনা তার তিন ছেলেমেয়ে রেখেছে আমার কাছে, রক্ষা। ভেবেছিলাম, শোভনা আমার মেয়ে আর তুই ছেলে। তুই কেমন ছেলে?

পাতিলের আগুনের ওপর দুই হাত মেলে ধরে খুড়ীমা। গরম হাত দুখানা এনে তার গায়ে চেপে চেপে ধরে। কতকালের পুরনো এক রক্তস্রোত আর এক রক্তস্রোতের খবর নিতে থাকে।

—রাখু, ভাত চড়াসনি?

—না তো! মামা কী খেয়ে যাবে?

—খেয়ে যাবে না তো কী? কোথায় খাবে?

—আমি খাব না খুড়ীমা।

—কেন খাবি না? বৌ রেঁধে রেখেছে বলে? গেরস্তর ঘরে কখনও ভাত নষ্ট হয় না। খেয়ে যা। আপিস থেকে এলি তো?

—হ্যাঁ।

—পাখী, তুই একটু হাত গরম করে সেঁক দে। আমি একটু শুই, বুকটা কেমন করে।

—কথা বোলো না।

—বলব না! কেন? কাছে এসে বোস আরো। তোর বৌকে বিয়েতে আমি গয়না দিইনি, না? কী দিয়েছিলাম যেন?

পাখী মুখ তুলে বলে—দিয়েছিলে। নাকছাবি।

—ওঃ। নাকছাবি আবার গয়না! অমিয়, তোর ছেলেমেয়ে হলে একছড়া গোঠ দেবো। তিন ভরি সোনা। তুই কোথায় থাকিস যেন?

—ঢাকুরিয়া।

—সে কী অনেক দূর? যদি দূর না হয় তো তোর বৌ, কী-নাম যেন, তাকে নিয়ে আসিস। ভাসান, পাখী, তোরা ওর সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

—তুমি অত তাড়া দিলে কথা বলবে কখন? চা করছে, গা সেঁকছে, ভাত রাঁধছে, ওদের তো বসতেই দিচ্ছ না।

—তাড়া কী সাধে দিই! তোর মাকেই আমার ভয়। তার মুখের বড় ধার ছিল। এখনো এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে জিভ শানাচ্ছে, আমি গেলেই ধরবে আমাকে। হ্যাঁ রে, পরের মেয়ে বৌ হয়ে এসে আপনজন হয়ে যায়, আর পরের মা কিছুতেই কী মা হতে পারে না? কেন এসেছিস অমিয়?

—খুড়ীমা, তুমি আমাকে গল্প বল।

—কিসের গল্প শুনবি?

—আমার গল্প বল। আমি কেমন ছিলাম?

—তুই? তুই আবার আলাদা কি ছিলি! আর পাঁচজনের মতই ছিলি তুই। শিশুকালে সবাই এক থাকে, বড় হয়ে আলাদা রকমের হয়।

—তবু বল।

—খুব দুষ্টু ছিলি। ভীষণ। মা ছিল না বলে তোর আদর ছিল সবচেয়ে বেশী। আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছিলি। তোর দিদি নানি সেই তুলনায় ঠাণ্ডা ছিল। পারুলিয়ার বাড়িতে একটা মস্ত দিঘি ছিল—তার এপার ওপার দেখা যায় না, তার কালো জল খুব গভীর, বড় বড় মাছ ছিল। দিঘির পারে একটা ডিঙ্গিনৌকা বাঁধা থাকত—তাতে চড়ে মাঝ-দিঘিতে শ্বশুরমশাই মাছ ধরতে যেতেন। সেই ডিঙ্গিনৌকোয় চড়ে এক দুপুরে তুই আর নানি চুপি চুপি দিঘির মাঝখানে চলে গিয়েছিলি। চীৎকার শুনে আমরা দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখি, নানি উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠা তুলে চেঁচাচ্ছে, তুই নৌকোর এক ধারে ঝুঁকে আছিস। কেৎরে নৌকোটা ভেসে আছে। সে যে কতদূর চলে গিয়েছিলি তোরা—এই টুকু টুকু দেখাচ্ছিল তোদের। চারদিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে কিন্তু তোরা এতদূরে যে পৌঁছতে পারছিল না। নৌকোটা কেবলই কাৎ হচ্ছিল তখন, তুই ঝুলে ছিলি, পড়ে যাচ্ছিলি। কী ভয় আমাদের!

—তুমি কী করেছিলে?

—আমি! আমি কী করব? বোধহয় খুব চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা মা-মরা দুটো ভাইবোন কেন যে ঐ বিদঘুটে খেলা করতে গিয়েছিলি! লোকে বলাবলি করেছিল যে তোদের ভূতে পেয়েছে। কেন গিয়েছিলি অমিয়?

—আমরা কী করে ফিরে এলাম আবার?

—কেউ ধরার আগেই তুই ঝাঁপ দিয়েছিলি জলে। তোকে কেউ ধরতে পারেনি। একা সাঁতরে এলি পাড়ে। খুব রোখ ছিল তোর।

—খুড়ীমা, আমি একটা জলের স্বপ্ন খুব দেখি।

—কী রকম জল?

—অনেক জল, অথৈ জল। একটা খুব বড় নদী, তার ওপার দেখা যায় না। তার একধারে একটা বিরাট বালিয়াড়ি, আর একটা ষ্টীমার বাঁধার জেটি। সেখানে কেউ নেই। বালির ওপর একটা কেবল সাপের খোলস পড়ে আছে।

খুড়ীমা হঠাৎ রোগা, মরা হাত বাড়িয়ে অমিয়র হাত ধরে। বলে—অমিয় কী বলছিস?

—একটা ষ্টীমারঘাটের কথা। একটা বালিয়াড়ির কথা।

খুড়ীমা একটু চুপ করে থাকে।

—খুড়ীমা তুমি এই ষ্টীমারঘাটের কথা কিছু জান?

খুড়ীমা, আস্তে আস্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে—না তো! ষ্টীমারঘাটের কথা কী জানব! তুই কবে থেকে এটা দেখিস?

অমিয় একটু ভাবে। তারপর বলে—অনেকদিন থেকে। এক দিন ঘুমের মধ্যে ঐ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। তারপর আবার ঘুমোই, আবার সেই স্বপ্ন। তিনবার করে স্বপ্নটা দেখে আর ঘুম হল না। একা একা শুয়ে খুব ভয় করতে লাগল। মনে হল, কেউ পাশে থাকলে খুব ভাল হত।

—বৌয়ের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া অমিয়?

—কেন, ওকথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—এই যে বললি—তুই একা শুস। একা শুবি কেন অমিয়? বৌ বিছানায় নেয় না? আলাদা শোয়? তা তার এত গুমোর কিসের? ঐ জন্যই তোদের বাচ্চা হয় না—

—খুড়ীমা ষ্টীমারঘাটের কথাটা আগে শোন।

—কী শুনব! ষ্টীমারঘাটের কথা আমি কিছু জানি না। রাখু ভাতটা

টিপে দ্যাখ, হাঁ করে গল্প শুনছিস, ভাত গলে যাবে। একটু ডাঁটো থাকতে নামাস, অমিয় ঝরঝরে ভাত ভালবাসে। ভাসান, কত রাত হল রে?

—ন'টা।

—অমিয় যাওয়ার সময়ে টর্চ জ্বেলে বড়রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। আমি একটু চোখ বুজে থাকি। আমার মনটা ভাল লাগছে না।

—কেন খুড়ীমা?

—তুই কেন ষ্টীমারঘাটের কথা বললি? ওসব অলক্ষুণে কথা, মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

খুড়ীমা মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, হাতপাখার মৃদু শব্দ হতে থাকে। রাখু এসে বলে—মামা, রান্না হয়ে গেছে। বসবেন না?

অন্যমনস্ক অমিয় ওঠে।

খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অমিয়। খুড়ীমা ঘুমচোখে বলে—ভেজা পোশাক আবার পরছিস অমিয় ঠাণ্ডা লাগবে না? ওগুলো ছেড়ে রেখে যা—

রাখু বলে—উনুনে ধরে শুকিয়ে দিয়েছি দিদিমা।

—ওতে কি শুকোয়? সেলাইয়ে জল থেকে যায়। ষ্টীমারঘাটের কথা যেন কী বলছিলি অমিয়?

—তুমি তো শুনতেই চাইলে না।

খুড়ীমা একটু অস্ফুট শব্দ করে। তারপর বলে—ছেলেবেলা থেকে তুই বড় একা। সেই জন্যে তোর দুঃখ নেই তো অমিয়? তোর মা-বাপ নেই—সে বড় দুঃখ। আমি তোর মা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাইলেই কি হওয়া যায়! নিজের মেয়েটা, এই যে সব নাতি-নাতনী—এ সব থেকেও তো কেমন একা লাগে। রাত-বিরেতে ঘুম ভাঙলে কারো নাম মনে পড়ে না। ডাকতে গিয়ে দেখি, মাথা অন্ধকার লাগে। মনে হয় কেউ নেই আমার। সে বড় কষ্ট। ভাবি, মানুষের আপনজন কে-ই বা আছে! তুই কেন এসেছিলি যেন অমিয়?

—তোমাকে দেখতে।

একটা শ্বাসের শব্দ হল। খুড়ীমা বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। তারপর বলে—ষ্টীমারঘাটের কথা কেন বললি? কী জানি কেন, আমিও ঠিক একটা ধু ধু বালির চর দেখতে পাই এখন, অনেক দূরে একটা ঘাট, তারপর অথৈ জল....সাবধানে যাস অমিয়, উঠোনটা পিছল, রাস্তা ভাল

না, অনেক রাত হয়েছে!

—খুড়ীমা, তুমি ঘুমোও।

—ঘুম কী আসে। ভাসান, টর্চটা ধর। অমিয়, তোর বৌয়ের নাম যেন কী?

—হাসি।

—হাসি! হাসির কেন বাচ্চা হয় না রে? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি?

—অমিয় চুপ করে থাকে।

—বাচ্চা না হলে বৌ আপন হয় না। আঁটকুড়ি নয় তো? ডাক্তার দেখাস। তোর কেউ নেই অমিয়, বাচ্চা-কাচ্চা হলে একটু বাঁধা পড়বি। কিন্তু বয়স হলে আবার সেই—

—কী?

—সেই যে কী যেন বললি! সেই ষ্টীমারঘাট—অথৈ জল..... অমিয় সাবধানে যাস—

মেঘ কেটে ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্না পড়েছে। অমিয় নির্জন রাস্তায় তার স্কুটার চালায়। বাতাস লাগে, জল-মাটির গন্ধ পায় সে। চলতে থাকে। হাসি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিয়র ঘুম হয় না আজকাল।

দূরে সিংহের ডাকের মত মেঘগর্জন শোনা যায়। গির-অরণ্যে দেখা এক সিংহের অবয়বের ছায়া পড়ে অমিয়র চোখে। সে চলতে থাকে!

স্কুটারের শব্দ ঠিকই শুনতে পেল হাসি। আধো ঘুমের মধ্যেও। যেন এতক্ষণ সে এই শব্দের অপেক্ষায় ছিল। উঠে ঘড়ি দেখল সে। রাত এগারোটা বেজে গেছে। অমিয়র জন্য তার কোন কৌতূহল নেই। সে শুধু আধো জেগে ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তায় চলমান স্কুটারগুলির শব্দ শুনে উঠে একবার ঘড়ি দেখেছে। কোন স্কুটারের শব্দই এতক্ষণ থামেনি।

হাসি শুনতে পেল, অমিয় স্কুটার টেনে সিঁড়ির নীচে উঠিয়ে রাখছে। আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকল হাসি। আগে আগে অমিয় এলে অন্ততঃ খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসত সে। মুখোমুখি দু'চারটে কথা হত। খাওয়ার পর ছিল তাদের বাঁধা রতিক্রিয়া। এখন আর হাসি খাওয়ার টেবিলে যায় না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে অমিয়র পায়ের শব্দ, ভেজানো দরজা ঠেলে ও-ঘরে ঢোকে। জামাকাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়।

ও-ঘর থেকে একটা চৌকো আলো এসে এ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। অমিয়র রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—হাসি জানে। অনেক রাত জেগে ও বই পড়ে। সিগারেট ধরানোর শব্দ হয় রাতে, পায়চারীর শব্দ হয়, কাশির।

চৌকো আলোটাতে একটু মানুষের ছায়া পড়ে। বাঁকা ছায়াটা, একটা কাঁধ উঁচু দেখায়, মাথাটা বেঁকে পড়ে আছে।

হাসি চেয়ে থাকে।

দরজার কাছ থেকে অমিয় বলে—কেউ এসেছিল?

হাসি মৃদুগলায় বলে—টেলিফোনের লোক। কাল তোমার টেলিফোন দিয়ে যাবে।

টেলিফোন একটু অবাক হয় অমিয়।

—বলল, তুমি তিনবছর আগে অ্যাপ্লাই করেছিলে, এতদিনে মঞ্জুর হয়েছে।

—টেলিফোন দিয়ে আমি এখন কী করব?

হাসি একটু হাসে। বলে—লোকের সঙ্গে কথা বলবে। কত কথা আছে মানুষের, শোনার লোকেরও অভাব নেই।

—আমার কোন কথা নেই।

—কে বলল নেই! শুনতে পাই, তুমি লোককে একটা ষ্টীমার ঘাটের কথা বল।

—সে কথা থাক হাসি। আর কে এসেছিল?

—এক বুড়োমত ভদ্রলোক; তোমার পিসেমশাই। তাঁর মেয়ের বিয়ের চিঠি রেখে গেছেন।

—চিঠি দেখেছি। তিনি কিছু বলেন নি?

—বলেছেন। পরশু বিয়ে, আমি যেন অবশ্যই তোমাকে নিয়ে বিয়েতে যাই। অনেকবার বললেন। আমি বলেছি—যাব। চা করে খাইয়েছি। অনেকক্ষণ বসেছিলেন তোমার জন্য।

—আর কিছু বলেন নি?

—না। বোধহয় কিছু বলার ছিল, তোমাকে বলতেন। আমাকে কিছু বলেন নি।

—বলেছিলাম, রেখার বিয়েতে এক হাজার টাকা দেব। এত

তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবি নি।

—দেবে যখন বলেছিলে তখন তো দেওয়াই উচিত। তাঁর পোশাক দেখেই মনে হয় অবস্থা ভাল না।

—কোথা থেকে দেব?

—তুমি আমাকে যে সব গয়না দিয়েছিলে সব স্টীলের আলমারীতে আছে। দরকার হলে নিতে পার, আমি তো নিচ্ছি না।

—আমাদের বংশের কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি।

—তা হলে কী করবে?

—বুঝতে পারছি না।

হাসি লক্ষ্য করে একটা ধুতি জড়িয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের ওপর ওর খালি গা। পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথাটা বোধহয় ভেজা, পাটকরা চুল থেকে আলো পিছলে আসছে। লম্বাটে হাড়সার দেহ অমিয়র। অমিয় রোগা হয়ে গেছে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারে না হাসি। এসব বোঝা খুব মুশকিল। ঐ দেহটির স্বাদ সে বহুবার পেয়েছে। তার দুই হাতে, নগ্ন শরীরের আনাচে-কানাচে আজও ছড়িয়ে আছে সেই স্বাদ। কতবার সে বেষ্টন করেছে ঐ শরীর, মথিত হয়েছে। তবু ঐ শরীরের সব খবর তার জানা নেই।

অমিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট একটু জ্বলে উঠল। সেই আগুনটাই বোধহয় একটা আশ্লেষ তৈরী করে হাসির শরীরে। সে শরীরের ভঙ্গী বদলায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে—তোমার ওজন কত?

অমিয় একটু থমকে থাকে। প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—কী বলছ?

—তোমার ওজন কত?

—কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি। জামাইবাবু বলছিল, তুমি নাকি রোগা হয়ে গেছ। তোমার কি ওজন কমে গেছে?

—কী জানি।

—তুমি ওজন নাও না?

—না।

হাসি একটু শ্বাস ফেলে বলে—আমার রিজার্ভেশন পাওয়া যায় নি। কলকাতায় আমাকে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে।

—থাকবে। তাতে কী?

—আমি দিদি-জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে পারতাম এ ক'দিনের জন্য। কিন্তু সেখানে পাশের ফ্ল্যাটে তোমার দিদি-জামাইবাবু থাকেন। গেলে ওঁরা নানারকম সন্দেহ করতে পারেন বলে যাই নি।

—যেমন তোমার ইচ্ছে।

—খুশির বিয়ের তারিখ এসে গেল! রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!

—প্লেনে চলে যাও।

—তুমি ভাড়া দেবে? অনেক ভাড়া কিন্তু।

—দেব।

—তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।

—প্লেনের ভাড়া কত?

—দু-তিনশো হবে বোধহয়। আমি ঠিক জানি না। তোমার ব্যবসার অবস্থা কী?

—ভাল নয়।

খুব খারাপ?

—হুঁ।

—কী রকম খারাপ?

—উঠে যাওয়ার মত।

—কেন?

—হাসি, আমি প্লেনের ভাড়া ঠিক দেব।

হাসির ঘুম পায়। সে হাই তুলে বলে—দরজার পর্দাটা টেনে দেবে? চোখে আলো লাগছে।

পরদিন দুপুরবেলা জামাইবাবুকে ফোন করে হাসি।

—জামাইবাবু, রিজার্ভেশন যদি না পাওয়া যায় তো আমি প্লেনে যাব।

—তার দরকার নেই, তেরো তারিখের একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে? সত্যি?

—সত্যি। সুখের পাখী এবার উড়ে যাও।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ হাসি?

—না।

—কাল ছেড়ে দিয়েছিলে। একটা প্রশ্নের জবাব দাও নি।

—জামাইবাবু, আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় নি। কথাবার্তা বন্ধ হয় নি। কাল রাতেও অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি। আমরা সম্পূর্ণ নরমাল। এমন কি কোর্ট-কাছারির কথাও ভাবছি না।

—তবে কি ফিরে আসার কথাও ভাবছ?

—না।

—তুমি কোথা থেকে ফোন করছ হাসি?

—কেন?

—ফ্রিলী কথা বলতে পারবে?

—আমি বাসা থেকে ফোন করছি।

—বাসা থেকে! বাসায় কবে ফোন এল?

—আজ। বছর তিনেক আগে অ্যাপ্লাই করেছিল, আজ কানেকশান দিয়ে গেছে।

—ফোন কেন নিতে গিয়েছিল অমিয়? দুপুরে অফিস থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য?

—হবে হয়তো।

—ফোন কোম্পানীর মত বেরসিক দেখিনি। যখন পাড়ী উড়ে যাচ্ছে তখনই এল ফোন! এখন দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলবে অমিয়? বেচারা!

—কি বলছিলেন বলুন।

—ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর সেই এঞ্জিনীয়ার, যে এখনো বিয়ে করে নি শুনেছি। সত্যি?

—সত্যি।

—সে কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল হাসি?

হাসি একটু দ্বিধা করে বলে—না না।

—তবে কী করেছিল?

একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল। তাতে বার বার একটা প্রশ্ন করেছিল—আমার কী দোষ? আমাদের অপরাধ কী? আপনি কেন এমন করলেন? আরো লিখেছিল, যদি কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারি তবে যেন তাকে জানাই, সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে, নিঃশর্তে গ্রহণ করবে আমাকে.....জামাইবাবু আপনি কি শুনছেন? আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

—শুনছি। বল।

—সে এই কথা লিখেছিল। আরো লিখেছিল, তাদের কালাশৌচের মধ্যেই যে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে রেখেছিল, সেটাও তারই আগ্রহে। তার ভয় ছিল, আশীর্বাদ করে না রাখলে ঐ সময়ের মধ্যে আর কেউ এসে আমাকে বিয়ে করে ফেলবে। তখন শিলচরে আমার স্যুটার অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি পেতুম....শুনছেন?

—শুনছি।

—কালো হলেও তো আমি সুন্দরী-ই। তার ওপর দারুণ নাচতাম, গাইতাম। আমার পায়ে পুরুষদের মাথা নুপুরের মত বাজত।

ও-পাশে জামাইবাবু বহুক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়ে। হাসি হাসে।

—কিছু বুঝলেন জামাইবাবু?

—বুঝলাম।

—কী?

তুমি আর ফিরবে না হাসি।

ও-পাশে জামাইবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। হাসি অপেক্ষা করে।

—হাসি, ষ্টীমারঘাটটা সাবধানে পার হয়ো। ও জায়গাটা ডেঞ্জারাস।

হাসি চমকে উঠে বলে—ষ্টীমারঘাট! কোন্ ষ্টীমারঘাট?

—বাঃ, ফারাক্কায় তোমাকে ঘাট পেরোতে হবে না?

—ওঃ। বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসি।

—একা যাচ্ছ, আমরা চিন্তায় থাকব। ওপারে বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে তোমার রিজার্ভেশন আছে, ভুল করে দার্জিলিং মেলে উঠো না।

—ভুল ট্রেনে ওঠাই কি আমার স্বভাব জামাইবাবু?

জামাইবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে—ভুল ট্রেনের কথা বলছ হাসি! কিছু ইঙ্গিত করছ কি? তবে বলি, আমাদের আমলে ভুল ট্রেনে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হত। হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে পৌঁছোতাম। কিন্তু তবু যেতে হত। তোমাদের আমল আলাদা। তোমরা ভুল ট্রেন বুঝতে পারলেই চেন টেনে নেমে পড়তে পার।

—আমরা ভাগ্যবান।

—দেখা যাক। আমি আরো কিছুদিন বাঁচব হাসি।

হাসি হাসে।

—এখনো সাত আট দিন সময় আছে, এ ক'দিন কী করবে হাসি?

—কী করব! ঘুরব, ঘুরে বেড়াব।

—কোথায় যাবে?

—কোথাও না। কলকাতা—কেবল কলকাতায় ঘুরব—ইচ্ছেমত।

—কলকাতায় আর কোথায় ঘুরবে, কী আছে কলকাতায়?

—কী আছে? কী জানি! আমি তো বিশেষ কোথাও যাব না। আমি ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়। রঙীন দোকান দেখব, আলো দেখব, পার্কে বসে থাকব, কলকাতা পুরানো হয় না।

—কলকাতায় তুমি কী পেয়েছ হাসি?

কী পেয়েছি! হাসি তা ভেবে পায় না। সে চোখ বুজে থাকে মনে মনে বলে—কলকাতা! কলকাতা আমার প্রেমিক। জ্বলন্ত এক পুরুষ কলকাতা। সে আমাকে সব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে টেনে এনেছিল, সুখী হতে দেয়নি। সে আমাকে নিয়ে আরো কত খেলা খেলবে, তোমরা দেখো।

—হাসি, ফোন কী ছেড়ে দিয়েছ?

—না তো।

—তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

—শুনছি। বলুন।

—এ কয়দিন অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরো।

—ও-মা! ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবো না কেন? এইতো ওর পিসতুতো বোনের বিয়েতে যাচ্ছি একসঙ্গে। ওর স্কুটারে বহুদিন চড়িনি। ভাবছি ওর স্কুটারের পিছনে বসে এ-ক'দিন ঘুরে বেড়াব। অফিসপাড়া, কলেজ স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীটের রেস্টুরেণ্ট দেখে বেড়াব দুজনে। জামাইবাবু আপনি কী ভাবছেন আমার প্রেজুডিস আছে? একদম নেই। আমরা দুজনে কথা বলি, হাসি-ঠাট্টা করি, কখনো ঝগড়া করি না। এমন কী মাঝে মাঝে এক বিছানায়.....জামাইবাবু শুনছেন?

—কী ভয়ঙ্কর!

—কী?

—তোমার নিষ্ঠুরতা।

মাথা আস্তে আস্তে পিছনে হেলিয়ে দিচ্ছিল হাসি। ক্রমে পিঠ বেঁকে গেল পিছনে, মাথা প্রায় স্পর্শ করল পিঠ। কত উঁচু বাড়ি। উঠে গেছে তো উঠেই গেছে। কী বিশাল বাড়িটার বুক, কী পাথুরে গড়ন! দেখতে

দেখতে নেশা ধরে যায়। হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ঠিক পায়ের তলা থেকে চূড়া দেখার চেষ্টা করল হাসি, তার মুখে ঘাম জমে গেল বেদনায়।

—বাব্বাঃ! আপনমনে বলল সে। হেসে আঁচলে একবার মুখ মুছে নিল। কলকাতার প্রোথিত ইমারত চারদিকে, তার মাঝখানে নিজেকে ধূলিকণার মত লাগে তার। কান পাতলে—পাতালের খরস্রোতা নদীর গর্জনের মত উতরোল কলকাতার গম্ভীর শব্দ শোনা যায়। কী রোমাঞ্চ জাগে শরীরে! কলকাতা—তার চারদিকে উষ্ণ কল্লোলিত কলকাতা!

হাসি পায়ে পায়ে পার হয় রাস্তা। ময়দানের দিকে ট্রামলাইন পেরোলে দেখা যায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো পড়ে আছে—যেন বা যে খুশী নিয়ে যেতে পারে। ঘনপত্র গাছের ছায়া। পাতা ঝরে পড়ছে। পাখিরা ফেলে দিচ্ছে কুটোকাটা। নিবিড় ছায়া এখানে। পায়ের নীচে-ঘাস, পাতা। নির্জনতা। হাসি পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে। কিছুই দেখে না, অথচ সবকিছু অনুভব করে তার সর্বগ্রাসী মন।

সামনেই একটা কালো হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চকচকে গাড়ি। গাড়ির বনেটে হাত রেখে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। ফর্সা, মজবুত চেহারা, লম্বা জুল্‌পী, ঘন বড় চুল, চৌকা মুখ। রঙীন চৌখুপওলা শার্ট তার পরনে, আর জলপাই-রঙা সরু চাপা প্যান্ট, পায়ে চোখা জুতো, কোমরের চওড়া বেল্টের বক্‌লশে একটা ইস্পাত রঙের ইংরিজি 'ডি' অক্ষর ঝলসে ওঠে। কবজীর ঘড়িতে মোটা সোনারঙের চেন। মানুষটা হাসিকে দূর থেকেই লক্ষ্য করে। অন্যমনে একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে আলস্যভরে চিবোয়। হাসি এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই হাঁটা দেখে লোকটা। দেখে তার পোশাক, মুখশ্রী, তার বুক, চোখ। চোখই বেশী লক্ষ্য করে। চেয়ে থাকে। একটা লক্ষণ খুঁজে দেখে। বোধহয় লক্ষণটা মিলে যায়। মিলিয়ে লোকটা হাসে। একটু বড় এবং মসৃণ দাঁত তার। ধারালো। হাসির একটুও ভয় করে না। সে এগোতে থাকে। লোকটা হাসে। হাসি এগোয়। হেরাল্ড গাড়িটার গায়ের পালিশে হাসির ছায়া পড়ে। লোকটা বনেট থেকে হাতের ভর তুলে নেয়। ঝুলে পড়া শার্ট, কোমরে গুঁজে এক পা এগিয়ে আসে। আর এক পা। আর এক পা এগুলেই হাসির পথ আটকাতে পারে, ছুঁয়ে ফেলতে পারে হাসিকে। ডাক দেয়—মিস—ও মিস—

হাসি ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। ছেলেটা

লক্ লক্ করে ওঠে লোভে। দাঁতাল হাসি হাসে। বেল্টের 'ডি' অক্ষরটা ঝলসায়। ভাঙা গলায় ডেকে বলে—আই হ্যাভ এ কার মিস—

হাসি বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা টেরও পায় না, ঠিক তার পিছনেই উদ্যত আঠারো তলা উঁচু এক হিংস্র ইমারত। সেই ইমারতের সামনে তাকে কত তুচ্ছ, এইটুকু পতঙ্গের মত দেখায়। হাসি সেই ইমারতের ফ্রেমে ছেলেটার ক্ষুদ্রতা মাত্র একপলক অবাক হয়ে দেখে। ছেলেটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে কী যেন বলে। অমনি ময়দান থেকে মার মার করে ছুটে আসে বাতাস, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যায়। হাসির করুণা হয়। তার প্রেমিক কলকাতা চারদিকে জেগে আছে সহস্র চোখে। উদাসী, নির্মম, আবার ঈর্ষায় কাতর। যদি ইঙ্গিত করে হাসি তবে অমনি তার প্রেমিক কলকাতা পিছনের ঐ আঠারোতলা বাড়িটার চূড়া হয়ে মড় মড় করে ভেঙে পড়বে ছেলেটার মাথায়। গুড়ো করে মিশিয়ে দেবে মাটিতে। কিন্তু ইঙ্গিত করে না হাসি। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নেয় অবহেলায়। একা একা ঘোরে বলে এরকম কত মানুষ কতবার তার পিছু নিয়েছে, ডাকাডাকি করেছে ইঙ্গিতে, কীটপতঙ্গের মত সব ছোট মাপের জীব কলকাতার গায়ে উড়ে এসে বসে, আবার উড়ে যায়।

হাসি হাঁটতে থাকে। কত দূর দূর হেঁটে যায় হাসি। কখনো ট্রামে ওঠে। কিছুদূর যায় আবার নেমে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ একটিমাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখে। দেখে, গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে হাওড়ার পোল। তার চোখের পাশ দিয়ে ভেসে যায় ভাঙা টুকরো সব দৃশ্যাবলী, ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়। চকিতে মানুষের চোখ ঝলসে ওঠে। কানাগলির মুখ সরে যায়। গভীর গভীর অগাধ কলকাতার ভিতর হারিয়ে যায় হাসি। ভোগবতীর গম্ভীর নিনাদের মত কলকাতার কত শব্দ হয়।

জাহাজঘাট! হাসি থমকে দাঁড়ায়। মাস্তুল। জল। না এখানে নয়। এ তো কলকাতা থেকে বিদায়ের বন্দর। এর অর্থ তো ছেড়ে যাওয়া। মাস্তুল অদৃশ্য রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানায়। জাহাজ ভেসে যাবে দূর সমুদ্রে। হাসি ফিরে দাঁড়ায়। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে কলকাতার শেষ। জীবনের শেষ, এখানে অচেনার শুরু। হাসি ফিরে আসে।

সেনগুপ্ত নিয়ে গেছে অনেক। হিসেব করলে কত দাঁড়াবে তা ভেবে

দেখেনি অমিয়। হিসেব করা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপিটাল শেয়ার আর সেই সঙ্গে লভ্যাংশ মিলে একটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা। অমিয় আটকাতে পারেনি। কিন্তু তবু সেটা কিছু নয়। সেনগুপ্ত বা তার টাকা কোনোটার অভাবেই ব্যবসা আটকাত না। যদি অমিয় খাড়া থাকত। তরতরে তাজা জোয়ান বয়সের মানুষের কাছে এ আবার একটা সমস্যা ছিল নাকি। ছিল না—অমিয় তা জানে, কিন্তু সে কেমনধারা মেঘলা মানুষ হয়ে গেল। দিন না ফুরোতেই আলো মরে গিয়ে ঘনিয়ে এল দিনশেষ।

দুপুরে অমিয় আজকাল কিছুই খায় না। লাঞ্চ সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কল্যাণ বা রজত সবাই এ সময়টায় বাইরে থাকে, পাঞ্জাবী হোটেল বা গাঙ্গুরামে টিফিন সারে। ডিউক রেস্টুরেন্টে নতুন একটা আড্ডা হয়েছে কল্যাণের। সেখানে সারাটা দুপুর কাটায় কখনো কখনো। অমিয় একসময়ে যেত। এখন টিফিনের সময়টায় বসে থাকে চুপচাপ। রাজেন এক কাপ চা রেখে যায় না বলতে। আজ চায়ের সঙ্গে একটা শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা দেওঘরের প্যাঁড়া রেখে গেছে। কোন ভাই যেন এনেছে দেশ থেকে।

চা টা খেল অমিয়, প্যাঁড়া ছুঁতে ইচ্ছে করল না। পেটে খিদে মরে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। সবাই তাকে লক্ষ্য করে আজকাল। সে যে খায়নি, সে যে বিপাকে পড়েছে। ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। রাত্তিরে অফিস বাড়িটা ফাঁকা থাকে। তখন রাজ্যের দেশওয়ালী মুটে মজুর রিক্সা বা ঠেলাওয়ালাকে এখানে এনে তোলে রাজেন। এক রাত্রির বসবাসের জন্য মাথাপিছু দুচার আনা করে নেয়। তারা দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খায়। অনেক রাত অবধি বাতি জ্বেলে গল্পসল্প করে। মাসের শেষে মস্ত অঙ্কের ইলেট্রিক বিল আসে। তাই রাজেনকে তার সাইড বিজনেসের জন্য বিস্তর বকাবকি করেছে অমিয়, কল্যাণ আর রজত। সেই খারাপ ব্যবহারটুকুর জন্য এখন প্যাঁড়াগুলির দিকে চেয়ে একটু বুকটা টন্ টন্ করে। রাজেন আজ কাল না বলতেই টিফিনের সময়ে কোন কোনদিন একঠোঙা মুড়ি বাদাম হাতের কাছে রেখে যায় নিঃশব্দে। এ সবই সহৃদয়তার নিদর্শন। কিন্তু অমিয়র ভিতরটা জ্বালা করে।

দুপুরের দিকে পিসেমশাই ফোন করলেন।

—অমিয়, আমি সেদিন তোর বাসায় গিয়েছিলাম। রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে!

—শুনেছি পিসেমশাই, পাত্র কেমন?

—খুব ভাল। টাটার ইঞ্জিনীয়ার, তবে দাবী দাওয়া অনেক।

অমিয় একটা শ্বাস ছাড়ল। পিসেমশাই আবার বললেন—মেয়েটার সুন্দর মুখ দেখে পছন্দ করেছে, নইলে গরীব ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মতো পাত্র তো নয়।

—পিসেমশাই আপনার কত দরকার?

পিসেমশাই লজ্জিত হন বোধহয়। একটু নীরব থাকেন। তারপর আস্তে করে বলেন, দরকারের কি শেষ আছে অমিয়! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা যা অবশিষ্ট ছিল সবই প্রায় তুলেছি। কিছু ধার কর্জ করেছি। এখনো দু-তিন হাজার কম পড়বে। আলমারীটা এখনো কেনা হয় নি, সোনার দোকানেও যা আন্দাজ করেছিলাম তার বেশী পড়ে গেল।

—ঠিক আছে, আমি হাজার খানেক দেবো।

—দিতে তোর কষ্ট হবে না তো?

—কষ্ট কি পিসেমশাই? রেখার বিয়েতে আমার তো দেওয়ার কথাই ছিল।

পিসেমশাই হাসলেন ফোনে। বললেন—কথা দিয়েছিস বলেই আবার কষ্ট করে দিস না।

অমিয় একটু আহত হল। সে দিতে পারবে না—এমন যদি কেউ ধরে নেয় তবে তার আহত হওয়ারই কথা।

সে একটু নীচু স্বরে বলল—পিসিমা বেঁচে থাকতে, সেই কবে ছেলেবেলায় আমি পিসিমাকে প্রায় সময়েই বলতাম, রেখার বিয়ে আমি দেবো, সে কথা তো রাখতে পারলাম না পিসেমশাই।

পিসিমার উল্লেখে পিসেমশাই নীরব হয়ে গেলেন। অনেকটা পরে যখন কথা বললেন তখন টেলিফোনেও বোঝা গেল, গলাটা ধরে গেছে। বললেন—তা হোক, ছেলেবেলায় মানুষ কত কী বলে। যা দিতে পারিস দিস।

—আচ্ছা পিসেমশাই।

—শোন, বৌমাকে বিয়ের দু-একদিন আগে আমাদের এখানে পাঠাতে পারবি না? বিয়ের কাজকর্ম মেয়েছেলে ছাড়া কে বুঝবে!

হাসিকে বললে হাসি রাজি হবে কিনা তা কে জানে। তাই অমিয় উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল—সেদিন যখন গিয়েছিলেন তখন নিজেই তো বৌমাকে বলে আসতে পারতেন।

—লজ্জা করল। বৌমা তো আমাকে খুব ভাল চেনেন না, দু এক

বার মাত্র দেখেছেন, তুইও সাহেবী কায়দায় বিয়ে করলি, সামাজিক অনুষ্ঠান হল না!

অমিয় লজ্জা পায়। বলে—তাতে কী?

—সামাজিক বিয়ে হলে সেই অনুষ্ঠানে সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নতুন বৌয়ের চেনাচিনি হয়ে যায়। তোর বেলায় তো সেরকম হয়নি, তাই একটু দূরের মানুষ হয়ে আছি আমরা। তবে তোকে বলি অমিয়, বৌমা ভারী ভাল হয়েছে। পরিচয় দিতে কত যত্ন আত্তি করল। আজকালকার মেয়েদের মতো নয়।

অমিয় উত্তর দিল না।

—অমিয়।

—বলুন পিসেমশাই।

—পারিস তো বিয়ের আগে হাসিকে পাঠিয়ে দিস।

—দেখি।

—দেখি টেখি নয়, এয়োর কাজ করার লোক নেই।

—আচ্ছা।

—ছাড়ছি, বলে পিসেমশাই ফোন রাখলেন।

ফোনটা রেখে অমিয় তিন বুড়োর দিকে তাকালো, তিনজনই পাথর হয়ে বসে আছে। একেই কি স্থবিরতা বলে! তান্ত্রিক লোকটা একবার চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায়, মাথায় জটা, কপালে মস্ত লাল একটা ফোঁটা, চোখ দুটোয় বেশ তীব্র চাউনী। হেসে এবং তাকিয়ে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল—টাকা!

অমিয় হাসে। উল্টো দিকের দুই বুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে তান্ত্রিকের দিকে ঝুঁকে বসল, বাবা যদি এবার কিছু বাণী দেন।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—টাকা।

তান্ত্রিক তার দুই ভক্তের দিকে চেয়ে আস্তে করে বললে—টাকা।

ভক্ত দুজন কী বুঝল কে জানে। জুল জুল করে চেয়ে থাকে।

অফিসঘরে এসে অমিয় ফাঁকা ঘরটার চারদিকে চাইল। কেউ নেই। কাগজপত্র হাওয়ায় নড়ে শব্দ করছে। পুরোনো ফ্যান থেকে একটা ঘট ঘটাং শব্দ উঠছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অমিয়। রেখার বিয়ে, এক হাজার টাকা দিতে হবে।

অমিয় বেরিয়ে এল।

স্কুটারটা এখনো তার আছে। বেশীদিন থাকবে না। কল্যাণকে সে দিয়ে দিয়েছে, যতদিন ও না নেয় ততদিন তার। আহমদ একটা মফঃস্বলের লোককে জাঙ্গিয়া গছানোর চেষ্টা করছে। অমিয়কে দেখে নিচু গলায় বলল—সাহা ব্রাদার্স থেকে লোক এসেছিল তাগাদায়, হটিয়ে দিয়েছি। আবার তিনটের পর আসবে।

অমিয় উত্তর না দিয়ে গিয়ে স্কুটার চালু করে।

যে ব্যাঙ্কে অমিয়র অ্যাকাউন্ট আছে তা অনেকটা তার ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে, বহুকাল ধরে একই ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখছে, তুলছে, চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ ভাঙাচ্ছে। সবাই মুখ চেনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু বেশী চেনা এবং একজনের সঙ্গে পরিচয় আরো একটু গভীর।

ব্যাঙ্কের বাইরে স্কুটার রেখে অমিয় ভিতরে আসে! সোনাদার ব্যাঙ্ক যেমন বড়, আর হালফ্যাশানের এ ব্যাঙ্কটা তেমন নয়। প্রাইভেট আমল থেকেই এর মলিন দশা, কাউন্টারের পুরোনো কাঠ গাঢ় খয়েরী রং ধরেছে, দেয়ালের রং বিবর্ণ, কাঠের পার্টিশনগুলো নড়বড় করে।

কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা অমিয় বহুদিন হল বন্ধ করে দিয়েছে! সেভিংসে কিছু টাকা থাকা সম্ভব, পাশবইটা বহুকাল এন্টি করানো হয়নি। কত টাকা আছে কে জানে!

টোকেন ইসু করার কাউন্টারে একসময়ে নীপা চক্রবর্তী বসত। ভিতরের দিককার একটা ঘরে বসে আপন মনে কাজ করে। পাবলিকের সামনে আর থাকে না।

কাউণ্টারের মেয়েটি ফোর ওয়ান নাইন নাইন অ্যাকাউন্ট লেজার খুলে দেখে বলল—না, হাজার টাকা তে. নেই। দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে।

অমিয় যন্ত্রের মত শব্দ করে—ও।

আরো দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে অমিয়র। কিন্তু সেখানে আর যাওয়ার আগ্রহ হয় না। খুব বেশী নেই। যা আছে তাতে হাত দেওয়া যায় না। হাসি চলে যাবে। অনেক পেমেন্ট বাকী। একটা হতাশা ভর করে তাকে। মুখটা বিস্বাদ। খালি পেটে সম্ভবতঃ পিত্ত পড়েছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম। চোখের সামনে একটু অন্ধকার, অন্ধকারে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খেলা করে মিলিয়ে গেল। দুর্বলতা থেকে এরকম হয়।

দুটো বাজতে আর খুব বেশী দেরী নেই। বেলা দুটোয় সব জায়গায় টাকা পয়সার ওপর ঝাঁপ পড়ে যায়।

ভিতরের দিকে একটা করিডোর গেছে। ওদিকে একটা বাইরে যাওয়ার দরজা আছে। ব্যাঙ্কের সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে লোক। ব্যাঙ্ক আওয়ারের পরে এসেও বহুদিন ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে অমিয়, চেক ক্যাশ করে নিয়ে গেছে। নীপা চক্রবর্তী ঐটুকু ভালবাসা দেখাত।

দুশো পঁয়ত্রিশ টাকায় হাত দিল না অমিয়। থাকগে। সে করিডোর ধরে ভিতরের পার্টিশানের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঠের পার্টিশনে কাচ লাগিয়ে বাহার করার চেষ্টা হয়েছে! ময়লা ঘোলা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কয়েকজন কাজ করছে। তৃতীয়জন নীপা। শ্যামলা রং রোগা শরীরে ইদানিং একটু মাংস লেগেছে। মুখখানা নোয়ানো বলে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু অমিয় জানে মুখখানা ভালই নীপার। টসটসে মুখ বলতে যা বোঝায় তাই। বড় বড় দুখানা চোখ ভরে একটা নরম সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে। চোখে কাজল দেয় নীপা, কপালে টিপ পরে, সাদা খোলের শাড়ি পরে বেশীর ভাগ সময়ে। রঙীন পরলে হাল্কারঙা। গায়ের রং চাপা বলে চড়া সাজ কখনো করে না। তাতে ও ফুটে ওঠে বেশী।

অমিয়র সঙ্গে নীপার এমনিতে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

চেক জমা দিয়ে টোকেন নেওয়ার সময়ে বা অ্যাকাউণ্টের টাকার অঙ্ক জানতে এসে, মুখোমুখি একটু বেশীক্ষণ কি দাঁড়াত অমিয়?

চোখে চোখ পড়লে সহজে চোখ সরাত না বোধহয়? মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসত কি? সে যাই হোক, তাদের চেনাজানা ছিল খুব সহৃদয়তায় ভরা। অনুভূতিশীল। ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে এসে অমিয় বলত— একটু জ্বালাতে এলাম।

নীপা মৃদু অহংকারী হাসি হেসে বলেছে—কে না জ্বালায়! জ্বলে যাচ্ছি। দিন কি আছে....বলে হাত বাড়িয়ে চেক নিত।

রোগা মেয়ে পছন্দ করত অমিয়। মোটা বা বেশী স্বাস্থ্যবতী তার পছন্দের নয়। নীপা রোগা ছিল, আবার রুগ্নও নয়। বুকের স্নিগ্ধ ফল দুটি মুখ তুলে চেয়ে থেকেছে পুরুষের দিকে। কনুই বা কব্জীর হাড় তেকোণা হয়ে চামড়া ফুঁড়ে উঠে থাকত না। শরীরের চেয়ে অনেক আকর্ষক ছিল, গলার স্বরে নম্রতা। অমিয় ছাড়া আর কাউকে কখনও নীপা ঠাট্টা করে কথার উত্তর দিয়েছে এমনটা অমিয় দেখেনি। খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে বেশীর ভাগই ভাল হয় না।

যেখানে তিন-চারটে মেয়ে জোটে সেখানে কাজ হওয়া আরো মুস্কিল! কিন্তু নীপা ছিল অন্যরকম। শনিবার যখন প্রচণ্ড রাশ হয়, কিংবা কোনো ছুটির আগে যখন টাকা তোলার ধূম পড়ে যায় তখনো নীপাকে বরাবর নীচু গলায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে অমিয়, দেখেছে মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও নানা লোকের অপ্রয়োজনীয় বোকা-প্রশ্নর উত্তর দিতে। একদিন দুজন অল্পবয়সী ছোকরা স্রেফ ইয়র্কী দিতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল। তারা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা লিখে জমা দিয়ে টোকেন নিল। ব্যাপারটা ধরতে দু মিনিটের বেশী লাগেনি নীপার। লেজার বইটা খুলে অ্যাকাউন্ট দেখে যখন তার উচিত ছিল দারোয়ান ডেকে ছোঁড়া দুটোকে বের করে দেওয়া, তখনও সে বিনীত ভাবে তাদের ডেকে বলেছিল—সইয়ে যে নাম লিখেছেন তার সঙ্গে অ্যাকাউন্টের নাম মিলছে না। ছেলে দুটো সাহস পেয়ে আরো কিছু ইয়ার্কী দেয়, একজন বলে—তাহলে অ্যাকাউন্ট খুলব। ফর্ম দিন। নীপা আশ্চর্য, ধৈর্য ধরে রেখে ওদের ফর্মও দিয়েছিল যেটা ওরা কিছুক্ষণ কাটাকাটি করে ছিঁড়ে ফেলে চলে যায়। দৃশ্যটা অমিয়র চোখের সামনে ঘটে। নীপা স্বাভাবিক হাসি হেসে বলেছিল তাকে—এরকম প্রায়ই হয়। আমরা কিছু মনে করি না।

তখনো হাসির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ হচ্ছে প্রাক্-ঐতিহাসিক ঘটনা। তখন অমিয় মাঝে মাঝে নীপার কথা ভাবত বিরলে। মনেপড়া শুরু হয়েছিল, ভাবতে ভাল লাগত। যখন তখন ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার পড়ত তার। রাজেন বা সেনগুপ্তকে পাঠালেও যখন কাজ চলে তখনও সে নিজেই যেত। নীপা যেদিন আসত না সেদিন ক্ষুণ্ণ হত সে। পরদিন এলে অনুযোগ করত—কাল আসেননি কেন? কাল আমার পেমেণ্ট পেতে অনেক দেরী হয়েছে।

নীপা সে অনুযোগের সহৃদয় উত্তর দিত। বলত—রোজ তো আসি। এক আধদিন না এলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র তো নই।

এ ধরনের কথা নীপা একমাত্র তার সঙ্গেই বলত এবং তখন চোখে চোখে মানুষের গভীর হৃদয় গোপন বার্তা পাঠাত না কি।

ব্যাঙ্কের বাইরে দেখা হয়েছিল মোটে একদিন। গ্রাণ্ট-স্ট্রিটের একটা দোকানে নীপা পুজোর জামাকাপড় কিনতে ঢুকেছিল। অফিসের পাড়া। অমিয় ডাব খাচ্ছিল পাশের পানের দোকানটায়। নীপা দেখেনি। অমিয় ভিতরে ঢুকে নীপাকে ধরল—এই যে!

নীপার সঙ্গে অফিসের আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারা একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখল অমিয়কে। নীপারই ভ্রূ সহজ ছিল। মুখে হাসি ফুটল সেই সহৃদয়তার। অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারত। কিন্তু খুব আন্তরিক লাজুক গলায় একটা ঘন নীল পাছা পেড়ে শাড়ি তুলে দেখিয়ে বলল—দেখুন তো, এটা অদিতিকে মানাবে না? অদিতি সঙ্গী মেয়েদের একজন। ফর্সা। অমিয় হেসে বলে—নীল শাড়ি সবাইকে মানায়।

যতক্ষণ শাড়ি কিনেছিল ওরা ততক্ষণ নীপা চোখের শাসনে আটকে রাখল অমিয়কে। অমিয় যতবার বলে—এবার যাই, কাজ আছে। ততবার নীপা বলে—দাঁড়ান। মেয়েরা ঠিক ঠিক শাড়ি পছন্দ করতে পারে না। পুরুষেরা অনেক পারে। আমাদের শাড়ি পছন্দ করা হয়ে গেলে যাবেন।

শাড়ি কেনা হলে সঙ্গিনীরা চলে গেল। বোধহয় একটা ষড়যন্ত্র করেই। নীপা একা হয়ে বলল—এবার আমাকে সাউথের বাসে তুলে দিন তো।

অমিয় তার স্কুটার দেখিয়ে বলে—বাসের দরকার কী! যদি সাহস থাকে তো উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিয়ে আসি!

—ও বাবা! স্কুটার! পড়ে টড়ে যাবো, কখনো চড়িনি।

অবশেষে উঠেছিল নীপা স্কুটারেই। মাঝপথে একটা রেস্টুরেন্টে চা খেয়ে নিয়েছিল তারা। অনেক কথাও হয়েছিল। এলোমেলো কথা। আর কথার মাঝখানে লজ্জার সঙ্কোচের এবং আকর্ষণের ঝাপটা এসে লাগছিল। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নীরবতা নৈকট্যকে অদ্ভুত ভাবে টের পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। টালিগঞ্জের খাল পাড় পর্যন্ত নীপাকে পৌঁছে দিল অমিয়। তারপর সিগারেট জ্বেলে থেমে থাকা স্কুটারে বসে দেখল নীপা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপাড়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে অনেকবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল তাকে। মুখটায় স্মিত গভীর একটা বিশ্বস্ততা।

না, কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়ত হতে পারত। মাঝপথে হাসি এসে সব তছনছ করে দিল। তুলে নিল তাকে। নিল, আবার নিলও না। বড়ঘরের মেয়েরা যেমন নিত্য নূতন জিনিষ কিনে সেসব জিনিসের কথা ভুলে যায় দু'দিন পর। অবহেলায় ফেলে রেখে দেয়। তেমনি অমিয়কে কবে ভুলে গেছে হাসি।

ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে কয়েক পলক চেয়ে থাকে অমিয়। নীপা টের পায়। মুখ তোলে।

অমিয় একটু হাসে। নীপাও একটু হাসে। ওর সিঁথিতে সিদুর। হাসিটা তেমনি সহৃদয়তায় ভরা। দেখে ভিতরে একরকম ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়। ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকার করিডোরে দাঁড়ানো অমিয়কে চিনতে পেরেছে নীপা। চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে এল।

—কী খবর? আবার বুঝি জ্বালাতে এসেছেন? নীপা করিডোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে।

অমিয় মাথা নাড়ল। বলল—না। কোনদিন আপনাকে কাজ ছাড়া দেখি না। আজও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

—কাজের জায়গায় দেখা হলে কাজ-ছাড়া কী করে দেখবেন?

অমিয়র এখন আর সাহসের অভাব হয় না। সে বলে—অকাজের জায়গায় কেমন দেখাবে কে জানে!

আশে পাশে ব্যস্ত সমস্ত লোকেরা যাচ্ছে আসছে। নীপা বলে—বলুন না বাবা কী কাজ আছে। কোনো চেকের ক্লিয়ারেন্স আসেনি না কি!

—ওসব নয়। অ্যাকাউণ্টে টাকাই নেই। চেক জমা দিই না অনেকদিন।

—সে তো জানি।

—কী করে জানলেন?

—আপনার অ্যাকাউণ্টটা দেখি মাঝে মাঝে। আজকাল কেবল উইথড্রয়াল হচ্ছে, জমা পড়ে না। কী ব্যাপার?

অমিয় একটা শ্বাস ফেলে। মাথা নেড়ে বলে—আপনি আমাকে মনে রেখেছেন।

—মনে রাখব না! ব্যাঙ্কের সব ক্লায়েণ্টকে আমার মনে থাকে।

বানানো কথা। মিথ্যে

অমিয় একটা বিষ বোলতার কামড় খায় এই কথায়। বলে—কোন পক্ষপাত নেই, না?

নীপার মুখে একটু দুঃখের ছায়া খোঁজে অমিয়। পায় না। হাসিকে বিয়ে করার পর মাস দুই বাদে নীপার বিয়ে হয়। কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি। জানায়ওনি। কিন্তু জানাবার দরকার হয় না। অমিয় তখন বিয়ের পর দেদার টাকা ওড়াত। হাসিকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। টাকা তুলত আর টোকেন নিয়ে অপেক্ষা করার সময়ে কলকলাত দুজনে। সেসব কি দেখেনি নীপা? তেমনি আবার দু'মাস বাদে নীপার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে অমিয়। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি। জেনে গেছে।

নীপার মুখে তাই কোনো দুঃখের ছায়া নেই। কিন্তু তবু সে কেন

অমিয়র অ্যাকাউন্টের খবর রাখে?

অমিয় বলে—আপনার টিফিনের সময় হয়নি?

—হয়ে গেছে। কেন?

হতাশ অমিয় বলে—হয়ে গেছে! আমি ভাবছিলাম আজ আপনাকে খাওয়াবো।

—তাই বা কেন! কোনো খাওয়া কি পাওনা হয়েছে! নীপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—খাওয়ার জন্য নয়।

—তাহলে?

অমিয় বুঝল, নীপার সঙ্গে আসলে তার কোনো বোঝাবুঝি তৈরী হয়নি। এমন অধিকার তার নেই যে সে ইংগীতে ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিশ্বস্ত নীপাকে। এখন তার উচিত হবে ভদ্রতাসূচক দু একটি কথা বলে চলে যাওয়া।

কিন্তু চলে যেতে পারে না অমিয়। আস্তে করে বলে—আপনি মিস চক্রবর্তী ছিলেন, এখন কী হয়েছেন?

নীপা একটু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধ হয় মনে মনে বলে—আর যাই হই, বাগচী হইনি। তাকিয়ে থেকে নীপা মৃদুস্বরে বলে—আমার বুঝি কাজ নেই! কী দরকার বললেই তো হয়।

—আমার জানা দরকার, আপনি চক্রবর্তী ছেড়ে কী হয়েছেন!

নীপা মৃদু হাসল বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে গেল একটু। বলল—চক্রবর্তীদের অনেক গোত্র হয় জানেন তো! আমি চক্রবর্তী থেকে চক্রবর্তীই হয়েছি। গোত্রটা আলাদা। জেনে হবে কী!

—এমনি, কৌতূহল।

—আপনার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আনঅফিসিয়াল কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় লজ্জা পায় নীপা। মুখ ফিরিয়ে বলে—চলি।

অমিয় মাথা নাড়ল, তারপর করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। দরজাটার কাছ বরাবর এসে ফিরে তাকায়। নীপা দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য মেয়ে হলে এই অবস্থায় চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যেত। নীপা পালাল না হাতটা তুলে তাকে থামতে ইংগীত করল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

অমিয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে, একটু বাদেই নীপা আসে। হাতে ব্যাগ, ছোটো ছাতা, মুখখানায় একটু রক্তাভা। কাছে

এসে বলে—আজ ছুটি নিয়ে এলাম। বাড়ি যাবো।

অমিয় অবাক হয়। বলে—বাড়ি যাবেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে!

নীপা উত্তর দিল না।

রাস্তায় এসে তারা ঝিরঝিরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। অদূরে অমিয়র স্কুটার। অমিয় স্কুটারটা দেখিয়ে বলে—আজ আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

মুখ নীচু করে নীপা মাথা নেড়ে বলে—না। রাধাবাজারে আমার স্বামীর ঘড়ির দোকান আছে। কাছেই। এখন ওখানে যাবো। সেখানে আমাদের গাড়ি আছে। তাতে ফিরব। এখন আমি নর্থ-এ থাকি। পাইকপাড়ায়।

—ও। অমিয় বুঝতে একটু সময় নেয়। নীপাকে ছাড়া নীপার আর কিছুই জানত না অমিয়। এখনো জানে না। শুধু ঘড়ির দোকান, স্বামী, গাড়ি আর পাইকপাড়া শব্দগুলো তার ভিতরে খুচরো পয়সার মতো হাত খসে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে।

আপনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। বললেন না।

অমিয় কষ্টে হাসে। ঘড়ির দোকানে স্বামী। স্বামীর গাড়ি। আর গাড়িতে পাইকপাড়া—এ সবই খুব রহস্যময় লাগে তার কাছে। নীপার কেন স্বামী থাকবে। সে কেন স্বামীর গাড়িতে পাইকপাড়া যাবে। কেন সে আজও অমিয়র নিজস্ব জিনিষ নয়—তা ভেবে এক ধরনের ক্রোধ আর হতাশা মিশে যায় তার ভিতরে।

সে বলল—শুনুন।

—কী?

—আপনার সম্পর্কে কিছুই কোনদিন জেনে নেওয়া হয়নি।

নীপা মৃদু হেসে বলে—জানাটা কি দরকার ছিল?

—আমার সম্পর্কেও আপনি কিছু জানেন না।

—না। তবে আপনার বৌকে দেখেছি। খুব সুন্দর বৌ।

অমিয় স্থির চোখে নীপাকে চেয়ে দেখে। ঠিক। হাসি নীপার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। হাসিও কালো। নীপার মতোই। তবু হাসির মুখ চোখ, শরীরের গঠন অনেক উঁচু জাতের। নীপার হিংসে হতে পারে।

অমিয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আমরা কেউ কারো সম্পর্কে

জানলাম না কেন?

নীপা এ কথার উত্তর দিল না। কারণ, এ বড় বিপজ্জনক কথা। উত্তর হয় না।

অমিয় বলল—স্কুটার থাক, চলুন আপনাকে রাধাবাজারের দিকে একটু এগিয়ে দিই। পথে বরং এক কাপ চা খেয়ে নেবো।

তারা হাঁটতে থাকে। নীপা মাথা নত রাখে। অমিয়কে সে যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন। দূরত্ব বজায় রাখছে। বোধহয় ভয়ও পাচ্ছে মনে মনে। আবার বোধহয় চাইছেও, অমিয় তাকে কিছু বলুক।

—আজ এমন করছেন, কী হয়েছে আপনার? নীপা তার মস্ত চোখ তুলে হঠাৎ বলে।

আশ পাশ দিয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলী মিলিয়ে যাচ্ছে ডাইলিউশনে। রেলগাড়ির মতো দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কলকাতা। সেই গতিশীলতার মধ্যে তার ধীরে হাঁটে। অমিয় বলে—আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কী বলছে।

নীপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—ও!

আবার হাঁটতে থাকে তারা। ওল্ড কোর্টহাউস স্ট্রীট পার হতে হতে অমিয় বলে—আমি ভাল নেই নীপা।

নিজের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে নীপা। চমকটা ঢাকা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—কেন? ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের কথা ভেবে?

না। অমিয় বলে—আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু সে কথা কখনো বলা হয়নি। এই অপরাধে।

নীপা ঠোঁট কামড়ায় মাথা নত করে।

কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে। চারদিকে মানুষ আর মানুষের মধ্যে। প্রবল গাড়ির আওয়াজের মধ্যে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ নেমে আসে।

অমিয় হঠাৎ দাঁড়ায়। ভিতরে বিষবাষ্প জমে উঠেছে আজ।

নীপা তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দুটি চোখ বাঙ্ময়। কিছু বলতে চায়।

অমিয় আস্তে করে বলে—দেখা হবে। আবার।

—কোথায়?

অমিয় তেমনি আস্তে টরে-টক্কার মতো মৃদু লয়ে বলে—একটা ষ্টীমারঘাট আছে। সেইখানে সকলের দেখা হয়।

—কোথায়? নীপার কপালে ভাঁজ পড়ে।

—ধু-ধু গড়ানে বালিয়াড়ি বহুদূর নেমে গেছে। তারপর কালো গভীর

জল। একটা ফাঁকা শূন্য জেটি। অথৈ জল। ওপরে একটা কালো আকাশ ঝুঁকে আছে। বালির ওপরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। হাহাকার করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

অমিয় বলে, দেখা হবে।

তারপর হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অমিয়।

নীপা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে। ভাবে। মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা খেলা করে যায়। তারপর কখন যেন চোখ ভরে জল আসে। জলভরা চোখে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহরটা কেমন ভেঙে চুরে গেছে। আবছা, অস্পষ্ট আর অলীক হয়ে গেল চারধার। অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। বেলুনের মতো ফেটে গেল বাস্তবটা।

চোখের জল মুছে নেয় নীপা। ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছিল। সতর্ক হয়ে ফিরে এল সঠিক রাস্তায়। মানুষটা কেমন! খুব অদ্ভুত, না? ফের জল আসে চোখে। ওর অ্যাকাউন্টে মোটে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে, নীপা জানে।

স্বামীর দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে নীপা। কলকাতা শহর চারদিকে, তবু কেবলই মনে হয়, বালিয়াড়ির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে পা। সামনে জল। জলের শব্দ। কেউ কোথাও নেই, কেবল বাতাস ঝড়ের মতো বয়ে যায়। মাথার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে।

টাপে টোপে প্যাণ্ডেলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয় কুকুরের মুখ। তারা আসছে সতর্ক পায়ে। ক্রমে ক্রমে। বেড়ালেরা আসছে নিঃশব্দে, ভিখিরিরা বাইরের গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে আছে। একটা ভিখিরির ছেলে ঢুকে গেছে প্যাণ্ডেলে। কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পাতার ঠোঙায় কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো-কাঁটা। মাংসের হাড়, লুচির টুকরো, মাছের কাঁটা জড় করছে এক জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে প্যাণ্ডেল। স্টিক লাইট জ্বলছে, ঘুরছে পাখা, এঁটো পাতা উড়ে উড়ে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। উৎসব-শেষের বীভৎসতা চারদিকে।

বর-বৌ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। নিয়ম নয়, কিন্তু আজকাল তো কেউ আর বাসর জাগে না। প্যাণ্ডেলের এক কোণে এখনো যজ্ঞের ছাই

পড়ে আছে, দুটো রঙ করা বিচিত্র পিঁড়ি এখনো তোলা হয়নি, দেবদারু পাতায় সাজানো দরজায় মঙ্গল কলস, রঙীন কাগজের শিকল দুলছে হাওয়ায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিয় দৃশ্যটা দেখে। সে এরকম ভাবে বিয়ে করেনি। কয়েকটা সই করে তারা বিছানায় চলে গিয়েছিল।

পিসেমশাইয়ের হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া গেছে অবশেষে। গতকাল সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে অমিয়। টাকা-টাকা করে। প্যাটারসনের লাহিড়ি শুনে বলল—দূর মশাই, কে-বি ফিট করুন না।

—কে বি কি?

—কাব্‌লে। আপনার যদি জানাশুনো না থাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল্ করবেন। এক হাজার ধার নিলে দু হাজার লিখে দিতে হবে।

—সে কী?

—ভয় নেই। আসলে ওরা লাইসেন্স-ওলা মানি লেণ্ডার, গর্ভনমেণ্টের বেঁধে দেওয়া সুদের বেশী আইনতঃ নিতে পারে না। আপনাকে লেখাবে ছয় পারসেণ্ট সুদ, নেবে তার দ্বিগুণের বেশী। যদি বাইচান্স আপনি সুদ নিয়ে ঝামেলা করেন, তখন মামলা করবে দু হাজার টাকার ওপর। আর যদি সুদ ঠিক মত দিয়ে এক হাজার শোধ দেন তাহলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল্ করবেন।

আজ সকালে টাকা পেয়ে গেছে অমিয়। এক হাজার। পিসেমশাইকে কথামত দেওয়া গেল। রেখার বর ভালই হল। টাটার এঞ্জিনীয়ার। দু হাজার নগদ, গোদরেজের আলমারী, সিঙ্গল খাট দুটো, সোফাসেট, পনেরো ভরি গয়না। পিসেমশাইয়ের বোধহয় আকাশ-বাতাস চাঁদ-সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছু রইল না। অমিয়র জন্য সারাদিন হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন বুড়ো মানুষ। অমিয় এসে টাকাটা হাতে দিতেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখখানা। চোখের কোলে জল। বললেন—ভাবলাম তুই বুঝি আর এলি না! ভয়ে তোর অফিসে ফোন করিনি, যদি খারাপ খবর শুনি!

অমিয় একটু হেসেছিল।

হাসি আজ কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠতে চায়নি। বলেছে—এত সুন্দর রাত আজ। বাতাস দিচ্ছে, চাঁদ উঠেছে, বন্ধ গাড়িতে বসে কেন যাব! আমাকে তোমার স্কুটারে নিয়ে চল।

তাই এনেছে অমিয়। তার কোমর ধরে বসে এল হাসি। মেয়েদের

দঙ্গলে মিশে গেছে এখন। উৎসবে হাসিকে চেনা যায় না।

রাস্তায় পার্ক করা শেষ দুটো মার্ক টু গাড়ির একটা ছেড়ে গেল সোনাদাকে নিয়ে। যাওয়ার সময়ে সোনাদা মুখ বাড়িয়ে বলল—অমিয় তোর সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা?

—সেই যে, মনে নেই কী বলেছিলি?

—কী সোনাদা?

—তুই বড় পাজী অমিয়, চিরকাল পাজী ছিলি।

—কেন?

—আমার বয়স হচ্ছে না রে? এই বয়সে মানুষ একটু গুছিয়ে বসতে চায়, এই বয়সেই তো সংসারের ভোগ সুখ, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে।

অমিয় চেঁচিয়ে হেসে বলেছে—ঠিকই তো!

—তবে তুই কেন আমাকে ষ্টীমারঘাটের কথা বলতে গেলি?

—কেন, কী হয়েছে?

—অমিয়, তুই কী বলিস তুই জানিস না! তুই চিরকালের পাজী। জানিস না, ওটা বলতে নেই! অমিয়, তুই চলে আসার পর থেকেই আমার বড় অস্থির লাগে। রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন যখন-তখন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কেবলই মনে পড়ে—ষ্টীমারঘাট—ষ্টীমারঘাট।

শেষ মার্ক টু-টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কার তা জানে না অমিয়। গাড়িটার আড়ালে তার স্কুটার হিম হয়ে আছে। হ্যাণ্ডেলটা একদিকে বাঁকানো। দেখে মনে হয়, ক্লান্ত মানুষ যেমন বসে বসে ঘুমোয় তেমনি ঘুমোচ্ছে।

পরিবেশনের সময়ে এঁটো-কাঁটার গন্ধে গা গুলিয়েছে বলে কিছু খায়নি অমিয়। হাসি কখন আসবে কে জানে! রাত অনেক হয়েছে। পায়ে পায়ে প্যাণ্ডেল ছেড়ে খোলা মাঠে আসে অমিয়। ঠাণ্ডা দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে ওঠে, বকুলের মত খসে পড়ে একটি তারা।

অন্ধকার বারান্দায় দুই বুড়ো বসে আছেন। বরের মামা, আর পিসেমশাই। বরের মামার দু'গালে পানের ঢিবি। তিনি পিসে মশাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলছেন—পুরুতরা আজকাল বড় শর্টকাট শিখেছে বিয়াই, আধ ঘণ্টায় কুসুমডিঙে সেরে ফেলল! আমার বিয়ের সময়ে চারঘণ্টা লেগেছিল যজ্ঞে। কনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে ঢুলতে দেখে আমি চিমটি

কেটে জাগিয়ে দিই।

পিসেমশাই মুখ তুলে বলে—তুই কিছু খাসনি অমিয়?

—না। বমি-বমি করছে।

—খুব খেটেছিস। সোনাকে বলি তোকে একটু সরবৎ করে দিক।

—না, আমি এবার চলে যাই।

—অমিয়, লোকজন খেয়ে কী বলল? কিছু দোষ ধরেনি তো?

বরের মামা পিচ ফেলে বললেন—আজকালকার বাজারে যা করেছেন যথেষ্ট।

ঘরে মেয়েদের ভীড়। অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। হাসিকে দেখা যায় না।

সেই ভীড় থেকে সোমাদি এগিয়ে আসে—অমিয়, কী খাবি?

—কিছু না।

—আমি তো নেমন্তন্নের রান্না খেতে পারি না, তাই এ ঘরে একটু ঝোল-ভাত রেঁধে রেখেছি। খাবি তো আয় ভাগ করে খাই।

—হাসি কোথায় সোমাদি?

—ওকে তো সব ঘিরে রেখেছে। বলছে, তুমি ফাঁকি দিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছ, আমাদের খাওয়া মার গেছে। এবার খাওয়াও। অমিয়, হাসি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে।

—রাত অনেক হয়ে গেল সোমাদি। হাসিকে ডাকো।

—তোর তো স্কুটার আছে, ভুস করে চলে যাবি। রাত হলে ভয় কী? তোকে একটু দৈ-মিষ্টি এনে দিই?

—সোমাদি, তুমি এত কষ্ট কর কেন?

—কিসের কষ্ট?

—খুব খাটো তুমি, টিফিনের পয়সা বাঁচাও, এত খেটে কী হবে সোমাদি?

—তোকে তো বলেছি, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

—সোমাদি, একটা ষ্টীমারঘাট—

—অমিয়, আমার এখনো অনেক কিছু করা বাকী, টাকা জমাচ্ছি, আমার অনেকদিনের শখ, একটা রেকর্ড-চেঞ্জার কিনব। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানের অনেক রেকর্ড। শোন অমিয়, তুই নাকি রেখার বিয়ের জন্য মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়েছিস। সত্যি?

—সোমাদি, তোমাকে সেদিন বলছিলাম—

—কী বলছিলি?

—একটা ফেরিঘাটের কথা—

—অমিয়, মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে খুব ভাল করেছিস। আমারও দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী করে দেব? জানিস তো, গত চৌদ্দ-পনেরো বছর আমার চাকরির ওপরই সংসার চলছে। রেখাকে একটা আঙটি দিলাম, তাতেই ধার হয়ে গেল। তুই টাকা দিয়ে ভাল করেছিস্। মেসোমশাই সবাইকে ডেকে ডেকে তোর দেওয়া টাকার কথা বলছেন।

—সোমাদি—

—শোন অমিয়, এখন আর আমার চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। তুই যে সেদিন গিয়ে বললি, ভালবাসার লোক না থাকলে রোজগার করে সুখ নেই, সেটা বাজে কথা নয়। এখন আমি বুঝতে পারি সংসারে আমার যেটুকু আদর তা ঐ চাকরিটার জন্য। এ চাকরিটা যদি ছাড়ি তবে দেখব আমি কিছু নই, কেউ নই। আজকাল তাই ভীষণ টায়ার্ড লাগে। বাসায় ফিরে রাত্রে এমন মন খারাপ লাগে! একটা ইজিচেয়ার কিনেছি, সামনের মাসে কিনব একটা রেকর্ড-চেঞ্জার। বুঝলি অমিয়, বারান্দায় অন্ধকারে বসব, উঠোনে থাকবে অন্ধকার, চুপচাপ বসে চেঞ্জার চালিয়ে দেব—গান হবে—দুঃখের গান—বিরহের গান—শুনতে শুনতে কাঁদব হয়তো—আর মনে পড়বে....কী মনে পড়বে রে অমিয়......?

অমিয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তুমি তো জানো সোমাদি....

সোমাদি মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলে—জানিই তো, জানব না কেন? মনে পড়বে....

পিসেমশাই সামনে এসে দাঁড়ান। কুঁজো দেখায় তাঁকে, বুড়ো দেখায়। অমিয়র দিকে অপলক একটু তাকিয়ে থেকে বলেন—আমি ভাবতাম ওর পিসিমা মরে গেছে বলেই বোধহয় অমিয় আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু তা নয়। সোমা, অমিয় আমাকে—

—জানি মেসোমশাই। অমিয় বড় ভাল ছেলে।

পিসেমশাই শ্বাস ছেড়ে বলেন—আমি বড় একা হয়ে গেলাম। শেষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সোমা, মাঝে মাঝে আসবি তো? অমিয় তুই?

—আসব না কেন!

—কী কথা হচ্ছিল তোদের?

সোমাদি মাথা নীচু করে বলে—কিছু না মেসোমশাই, অমিয় মাঝে

মাঝে একটা ফেরিঘাটের কথা বলছে—

—ফেরিঘাট! কিসের ফেরিঘাট? কী রে অমিয়?

—ষ্টীমার বাঁধার জেটি, জল.......

—ওঃ। পিসেমশাই হাসেন—ষ্টীমারঘাট মনে পড়তেই খালাসীদের মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনো। গোয়ালন্দে পারাপারের সময়ে ঐ গন্ধ যে কী ভাল লাগত। বুঝলি, বাহাদুরাবাদে একবার কাজলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম—সর্ষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল—তেমন আর কখনো কি খাওয়া হবে? এক কাঠা চালের ভাত তুলে ফেলেছিলাম। তুই কোন্ ফেরিঘাটের কথা বলছিস অমিয়? গোয়ালন্দ? নাকি.....

—কী জানি! আমি ঠিক জানি না। খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি গড়িয়ে নেমে গেছে বহু দূর পর্যন্ত.....কালো ছোট্ট একটা জেটি.....নির্জন.....বালিতে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে কেবল.....আবছায়ায় জল দেখা যায়.....সেকী জল......অনন্ত, অথৈ এক নদী বয়ে যাচ্ছে....

পিসেমশাই আর একটু কুঁজো হয়ে যান। একটা শ্বাস ফেলে বলেন—এখন এই বাড়িতে আমার একা কাটবে, বাদবাকী যে ক'টা দিন আছি। অমিয় রাত হল রে, বৌমাকে নিয়ে যাবি, অনেকটা রাস্তা, এইবার বেরিয়ে পড়। সোমা, তুই তো আজ যাবি না, না?

—না।

—অমিয় আর দেরি করিস না। সোমা, বৌমাকে ডেকে দে।

—দিই।

—বড় একা লাগবে, বুঝলি অমিয়? মাঝে মাঝে বৌমাকে নিয়ে চলে আসবি। দু-চারদিন করে থেকে যাবি। মনে করিস, আমি তোর এক বুড়ো ছেলে, আমার তো কেউ রইল না.....

অমিয়র স্কুটার ডাকছে। গুড় গুড় গুড় গুড়। পিছনে হাসি। বাতাস সামনে থেকে পিছনে বয়ে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে এক এক ঝলক হাসির গন্ধ এসে নাকে লাগে। হাসির গন্ধ! তা তো নয় হাসির আবার গন্ধ কী? ও তো ওর খোঁপার বেলফুলের গন্ধ, সেণ্ট আর প্রসাধনের গন্ধ।

হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অমিয়। কেবল তার দু-খানা হাত অমিয়র কোমর বেষ্টন করে আছে। একবার ঝুঁকে নিজের পেটের কাছে

হাসির জড়িয়ে থাকা হাতের পাতাদুটি দেখল অমিয়। আঙুলে আংটি ঝলসে ওঠে। মোমে মাজা আঙুলগুলি কী নরম হয়ে লেগে আছে তার পেটে।

হাসি দুরন্ত শ্বাসের সঙ্গে বলে—আরো জোরে চালাও না।

—কেন?

—জোরে না চালালে স্কুটারে ওঠার আনন্দ কী।

—হাসি, আমার স্কুটরটা পুরনো হয়েছে। স্পীড নেয় না।

—পচা, তোমার স্কুটারটা পচা।

অমিয় হাসে। তিন, সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাথিড্রাল রোডে এই স্কুটারে.....

—জ্যোৎস্না ফুটেছে কেমন. দেখছ?

—হুঁ।

—ঠিক দুধ-ভাতের মত জ্যোৎস্না, আমার খেতে ইচ্ছে করে।

—হাসি তুমি কবে যাচ্ছ?

—তেরই।

—তোমার যদি টাকার দরকার থাকে.....

—সামনে ওটা কী, ঐ উঁচু মত?

—গড়িয়াহাটা ব্রীজ।

—ওমা! ওর ওপর দিয়ে তো রোজই যাই আসি, কৈ অত উঁচু বলে তো মনে হয় না, ঠিক টিলার মত দেখাচ্ছে দেখ। চা-বাগানে আমরা ছেলেবেলায় টিলা থেকে ছুটে নামতাম—একবার দৌড় শুরু করলে আর থাকা যায় না, কেবলই গতি বেড়ে যায়।

—হুঁ।

—তোমার স্কুটারটা পচা। আর একটু জোরে চালাও না।

—কেন?

—আমার স্পীড ভাল লাগে।

গুড় গুড় করে স্কুটার ডাকে। গড়িয়াহাটা ব্রীজের গোড়া থেকে চড়াই ভাঙে। অমিয় স্পষ্টই টের পায় তার বয়স্ক স্কুটারটার এই চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। 'খুব বেশীদূর নয় আর' সে মনে মনে তার স্কুটারকে বলে, 'আর একটু কষ্ট করো স্কুটার। তারপর অন্ধকার সিঁড়ির নীচে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'

—ব্রীজের ওপর ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াবে?

—হাসি, অনেক রাত হয়েছে।

—ক'টা বাজে?

—বারোটা চল্লিশ।

—হোকগে। তুমি দাঁড়াও।

ব্রীজের ঠিক ওপরটায় বাতাসের জোর বেশী। আকাশের কাছাকাছি উঠে তারা দাঁড়ায়। হাসি রেলিংয়ের কাছে চলে যায়। ডেকে বলে—দেখ, কত দূর পর্যন্ত কী ভীষণ জ্যোৎস্না। সব দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কলকাতা কখনো দেখি নি।

অমিয় বাতাসে সিগারেট ধরাতে পারছিল না। বার বার দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে। সে স্কুটারের ওপর না-ধরানো সিগারেট মুখে নিয়ে বসে রইল। হাসি তাকে ডাকে না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসি একা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অনন্ত শহরটি দেখে মুগ্ধ চোখে। এখন যদি নিঃশব্দে অমিয় তার স্কুটারকে ব্রীজের ঢালুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়, যদি চলে যায়, তাহলে হাসি অনেকক্ষণ টেরই পাবে না যে অমিয় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে স্কুটার এবং অমিয়কে না দেখে একটুও অবাক হবে না হাসি। তার মনেও পড়বে না যে, এই ব্রীজের ওপর সে অমিয়র সঙ্গে এসেছিল, তার স্কুটারে। হাসির মনেই পড়বে না।

না-ধরানো সিগারেট মুখে অমিয় অপেক্ষা করে। বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে। বকুলের মত খসে পড়ে তারা। অমিয় অপেক্ষা করে।

একদিন যায়। দুদিন যায়।

দীর্ঘ টেণ্ডার টাইপ করতে করতে অমিয়র কাঁধ ব্যাথা করে। চোখে ঝাপসা দেখে। সিগারেটে সিগারেটে জিভ বিস্বাদ। রাজেন চা এনে রেখে গেছে। খাওয়া হয় নি।

—বাগচী। কল্যাণ ডাকে।

—উঁ?

—আপনার কি কিছু টাকার দরকার?

অমিয় হাসে।

—রাজেনের কাছে আমি আরো ছ'শো টাকা রেখে দিয়েছি। আমি থাকি বা না থাকি, যখন দরকার হয় নেবেন।

—অনেক ধার হয়ে গেল মুখার্জী।

—আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। সেনগুপ্তের কোন পাত্তা

পেলেন?

—না।

—কত টাকার বিল পেমেন্ট নিয়ে গেছে?

—প্রায় সাত হাজার।

—ওকে খুঁজে পেলে কী করবেন?

—কিছুই না। কেবল একটা কথা বলব—

—কী কথা?

—বলব......

অমিয় আর বলে না। বলতে পারে না। টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ। চোখে মেঘ। বাষ্পরাশি জমে ওঠে। সে দেখে, টাইপ করা লাইনের অক্ষরগুলো কে যেন আঙুলের টানে লেপে দিয়ে গেছে। কালো রেখার মত দেখায়। লাইনগুলো ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে থাকে। দুলতে থাকে। অমিয় দেখতে পায়, লাইনগুলো দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে যাচ্ছে।....ঢেউ আর ঢেউ। ফুলে উঠছে জল—অনন্ত অথৈ মহাসমুদ্রের মত জল। কালো মহা আকাশ ঝুঁকে আছে তার ওপর। বালিয়াড়ি ধু ধু করে সাদা হাড়ের মত। গড়ানে বালি, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগ। সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে।

—মুখার্জী, আমি আপনাকে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করব।

—কী?

—আমার স্কুটারটা।

—তা কেন বাগচী! এখন আপনার সময় ভাল যাচ্ছে না। প্রেজেন্ট সুসময়ে করবেন।

—এই ঠিক সময় মুখার্জী। স্কুটারটার আর আমার দরকার নেই।

কল্যাণ একটু চুপ করে থাকে—যদি দরকার না থাকে তো ওটা আমি কিনে নিতে পারি।

—না মুখার্জী, আমাদের বংশে কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি। আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দেব। অভাবের সময়েই দেওয়া ভাল, সুসময়ে দেওয়া হয় না।

কল্যাণ চুপ করে থাকে।

—রাজেনের কাছে টাকাটা আছে বাগচী, দরকার হলে নেবেন।

—আচ্ছা।

টেণ্ডার সীল করে অমিয় বেরোয়। মেঘ কেটে রোদ উঠছে চারদিকে

পাথুরে শহর। প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা। নীচে স্কুটারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় চেয়ে থাকে। তারপর স্কুটার ছাড়ে।

—লাহিড়ী।

—উঁ।

—টেণ্ডার দিয়ে গেলাম।

—আচ্ছা। দেখব।

—লাহিড়ী, প্যাটরসন কি এখনো আমাকে বিশ্বাস করে?

লাহিড়ী হাসে। বলে—ওসব রোমাণ্টিক কথা ছাড়ুন। কে কাকে বিশ্বাস করে! অর্ডার আপনি পাবেন। ঠিকমত রেট দিয়েছেন তো, যেমন বলেছিলাম?

—দিয়েছি।

—ঠিক আছে।

অমিয় বেরোয়। ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের অফিস ছুঁয়ে যায়।

—বাগচী।

—উঁ?

—ল্যাংগুয়েজ নিয়েই সবচেয়ে মুশকিল।

অমিয় হাসে। বলে—কেন?

রজত হাই তুলে বলে—কিছুতেই ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটা রোজই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারী অস্বস্তি।

—চেয়ে থাকে কেন?

—বোধহয় এক্সপেক্ট করে, জার্মানী যাওয়ার আগে আমি তাকে ফাইনাল কিছু বলে যাব। বাঙালী মেয়েদের জীবন খুব অনিশ্চিত তো। অথচ আমি কিছু বলতে পারছি না। ল্যাংগুয়েজ নিয়েই মুশকিল।

—কবে যাচ্ছেন?

—হরি সিং-এর সঙ্গে কণ্ট্যাক্ট করেছি। দিন কুড়ির মধ্যেই চলে যাব।

—আমাদের একা লাগবে।

—জানি। আফটার অল উই ওয়্যার কমরেডস্। বাগচী, আপনার জন্য কী পাঠাব বললেন না?

—ভেবে দেখি।

—সেনগুপ্তকে যদি কখনো খুঁজে পান বাগচী, গিভ হিম অ্যান এক্সট্রা কিক্‌ ফর মি। মনে রাখবেন।

অমিয় হাসে।

মিশ্রিলাল এসে চুপ করে বসে থাকে, ধৈর্য ধরে।

—বাগচীবাবু।

—জানি মিশ্রিলাল।

—আপনি তো আর কোন অর্ডার পেলেন না! বিজনেসের কী হবে? আমি ডুবে যাবো না?

বোধ হয় দূরে কোথাও মেঘ-গর্জনের মত একটা শব্দ হয়। অমিয় কান পেতে শোনে। শার্শির বাইরে আজ প্রবল রোদ। কোথাও মেঘ নেই, তবুও শব্দটা কোথা থেকে শোনে অমিয়? একবার চোখ বোজে সে। অমনি এক পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সিংহ তার চোখে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়। গভীর অরণ্যের ছায়ায় বহু দূরের সিংহ ডাকে—মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে।

সে বলে—ডুববে না মিশ্রিলাল। আমি আছি। থাকব।

হাসির সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না আজকাল। রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে। ফিরে এসে দেখে, হাসির ঘর ফাঁকা। বোধহয় হাসি কলকাতায় তার চেনাশোনা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখে সিনেমা-থিয়েটার, বোধহয় তার নেমন্তন্ন থাকে খাওয়ার। কে জানে। মধু তাকে চা করে দেয়। জিজ্ঞেস করে—বাবু, আপনার গাড়ি!

—দিয়ে দিয়েছি একজনকে।

বুড়ো মধু বিড় বিড় করে কী যেন বলে। বোধহয় জীবনের অনিত্যতার কথা নিজেকে শোনায়।

রাত বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। ঘুম হয় না। উঠে বসে অমিয় আলো জ্বালে। অফিসের কাগজপত্র দেখে। টেণ্ডারের খসড়া তৈরী করে। সে সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসি আসে। নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়। কাপড় ছেড়ে কলঘরে ঢোকে। বেরিয়ে আসে, জল খায়। শুয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কোন কথা হয় না। হাসির যাওয়ার দিন এসে গেল।

রোদের তাপ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। অমিয়র তাই কষ্ট হয় খুব। অনেকটা হাঁটতে হয়। কল্যাণ প্রায়ই বলে—বাগচী, স্কুটারটা নিয়ে

বেরোবেন।

অমিয় হাসে। নেয় না। কল্যাণ কয়েকদিনে ভালই শিখে গেছে চালাতে। ও যখন স্কুটার চালায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখে অমিয়। ভাল লাগে। হিংসে হয় না।

রজতের কোন কাজ নেই আজকাল। ব্যবসা সীল করে দিয়েছে। তবু রোজ এসে দেখা করে যায়।

—কবে ফ্লাই করছেন সেন?

—বলিনি আপনাকে? বিশ তারিখ, টিকিট পেয়ে গেছি।

—বাঃ! ভাল খবর।

—বাগচী, ইউ আর সাফারিং টু মাচ্।

—ধারগুলো শোধ করতে হবে সেন।

—পালিয়ে যান না। সেনগুপ্তকে কে আর ধরতে পেরেছে।

—ঠিক দেখা হবে একদিন......তখন? অমিয় হাসে।

—বাগচী যদি সত্যিই কেটে পড়তে চান তো ব্যবস্থা করতে পারি।

—কী রকম ব্যবস্থা?

—জব্ ভাউচার। তিনি মাসের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাব।

অমিয় হাসে।

কখনো কখনো শূন্য ঘরে, তার টেবিলের ওপর বিশাল সিংহ এক লাফ দিয়ে উঠে আসে। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে তার শরীর, পঞ্জরসার দেহ, —পিঙ্গল কেশর। মুখে বৈরাগ্য; চোখে দূরের প্রসার। পুরুষের এরকমই হওয়ার কথা ছিল। কে তাকে শেখাল নারী-প্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রণয়ভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা! অপরূপ মগ্ন হয়ে দেখে অমিয়।

তারপর টাইপরাইটার টেনে নিয়ে বসে।

—আপনি বার বার কেন একটা স্টীমারঘাটের কথা বলেন জামাইবাবু?

—আমি বলি না। অমিয় বলে। তুমি ওর কাছ থেকে কখনো শুনে নিও।

—কী করে শুনব! আমি কাল চলে যাচ্ছি।

—*শুনলে ভাল করতে।*

—কেন?

জামাইবাবু টেলিফোনের অন্য প্রান্তে শ্বাস ফেলে।

—হাসি, আমাদের বয়স হয়ে গেল।

—হঠাৎ একথা কেন?

—কী জানি! আজকাল হঠাৎ কাজকর্মের মাঝখানে বয়সের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে......

—কী?

—ষ্টীমারঘাট.....তুমি সাবধানে যেও হাসি। গঙ্গার ওপর ব্রীজটা যে কবে ওরা শেষ করবে!

—আমি পাগল হয়ে যাব জামাইবাবু, ষ্টীমারঘাটের কথাটা আগে বলুন। কোন্ ষ্টীমারঘাট?

—ফারাক্কা।

—না, ফারাক্কার কথা আপনি বলছেন না।

জামাইবাবু চুপ করে থাকে।

—বলবেন না?

—তুমি অমিয়র কাছে শুনো।

—ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন? ও অনেক রাতে ফেরে, খুব সকালে বেরিয়ে যায়।

—কাল স্টেশনে অমিয় যাবে না?

—বলেছিল তো যাবে। অফিসে কাজ আছে, সেখান থেকেই সম্ভব হলে স্টেশনে যাবে।

—তবে আর সময় হবে না।

—কীসের?

—ষ্টীমারঘাটের কথা শোনার। ফোন রেখে দিচ্ছি হাসি....

হাসি রিসিভার রেখে দেয়।

পরমুহূর্তেই আবার তুলে দ্রুত ডায়াল করে।

—হ্যালো আমি অমিয় বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুণি, জরুরী দরকার।

একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অমিয়র গলা ভেসে আসে—বাগচী বলছি।

—শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

—কী কথা?

—তুমি আমাকে একটা কথা কোনদিন বল নি।

—কী?

—ষ্টীমারঘাটের কথা। সবাইকে বলেছ, আমায় ছাড়া। একবার আমাকে বলবে?

—আমার সময় নেই হাসি।

—কেন?

—আমি খুব ব্যস্ত।

—কেন ব্যস্ত?

—অনেক কাজ হাসি। আমাদের সময় তো বেশী নয়।

—বলবে না?

—সময় বড় কম হাসি।

—ষ্টীমারঘাটের অর্থ কী?

—কী করে বলব। আমিই কি জানি?

—কী আছে সেখানে?

—কিছু নেই। শুধু একটা উঁচু বালিয়াড়ি, ধু ধু বালি গড়িয়ে নেমে গেছে, একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালির শেষে দূর থেঁকে একটা কালো জেটি দেখা যায়। তারপর জল। সে খুব অথৈ জল, অনন্ত জল, প্রকাণ্ড এক নদী, তার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে....

হাসি স্তব্ধ হয়ে থাকে।

—এর মানে কী?

—আমি জানি না। তবে মনে হয়, ওখানে একদিন সকলের দেখা হবে।

—কেন

—....

—কেন?

—....

—কেন?

—....

—কেন

প্যাটারসনের অর্ডারটা আজ বেরিয়েছে।

সকাল থেকেই অমিয় ঘুরছে বাজারে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল প্রায়। রোদের তাপ অসম্ভব। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। ঘূর্ণ হাওয়ার মত হাওয়া দেয়। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় অমিয়র। তবু সে হাঁটে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে, ভীড় ভেদ করে চলেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ে বৈরাগ্যের ধূসর রঙ, চোখে দূরের প্রসার। সিংহ মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নেয়। দেখে নেয়, অমিয় ঠিকঠাক চলছে কিনা।

অমিয় চলে। সাপ্লায়ারদের কাছে ঘোরে। দোকান যাচাই করে। সে আছে। থাকবে।

ষ্টীমারঘাটের ছায়াটা চকিতে ভেসে ওঠে চোখে। মিলিয়ে যায়। দেখা হবে, একদিন সকলের সাথে দেখা হবে।

দুপুরের দিকে অফিসে ফিরে একটা সিগারেট মুখে টাইপরাইটারের সামনে বসে অমিয়। টাইপ করতে থাকে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই বলে, এ কী বাগচী?

—কী।

—আপনি এখনো যাননি?

—কোথায়।

—কাল যে বলছিলেন আজ দার্জিলিং মেলে আপনার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন!

—ওঃ।

—ভুলে গিয়েছিলেন?

অমিয় লজ্জিত হয়ে হাসে। সে ভুলে গিয়েছিল। হাসির কথা তার মনেই ছিল না।

—ক'টা বাজে মুখার্জী?

—বারোটা চল্লিশ। পঞ্চাশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

—তাহলে আর গিয়ে কী হবে!

—উঠুন তো। নীচে স্কুটার রয়েছে....তাড়াতাড়ি করুন, হার্ড লাক— পেতে পারেন। উঠুন, উঠুন...

দেরিই হয়ে গেল অমিয়র।

স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত পায়ে উঠে এল স্টেশনের হলঘরে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ—যারা প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছিল। কোলাপ্সিব্ল গেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয় শূন্য

লাইনটা দেখে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, লাইনটা চকচক করছে। কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছিল। তারা সরে যেতেই অমিয় দেখতে পেল হাসি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে সুটকেস। সে একা।

—কী হল?

হাসির মুখ চিন্তান্বিত। কপালে ভ্রূকুটি। কেমন যেন আস্তে, আস্তে, চিন্তা করে করে বলল, আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি।

—কেন?

—পারলাম না।

—কেন?

হাসি খুব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে—কী জানি! আমাকে কখনো জিজ্ঞেস কোর না।

অমিয় একটু হাসে।

আজকাল অমিয় যখন সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমোয় তখন তার স্বপ্নের মধ্যে উপর্যুপরি সিংহের ডাক শোনা যায়।

মেঘ-গর্জনের মত সেই ডাক। মাটিতে লেজ আছড়ানোর শব্দ হয়। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ের ধূসর রঙের বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—সিংহেরা তার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। উপর্যুপরি ডাক দেয়, মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে। ঘুমের মধ্যে অমিয় হাসে।

অন্য ঘরে হাসির তেমন ঘুম হয় না। বহুদূর থেকে এক অচেনা রহস্যময় ষ্টীমারঘাটে এগিয়ে আসে। সে দেখে ধু ধু বালিয়াড়িতে চাঁদের আলো পড়েছে। পড়ে আছে সাপের খোলস। উঁচু থেকে দেখা যায়—গড়ানো বালিয়াড়ির শেষে জেটি, তারপর অনন্ত নিঃশব্দ জলরাশি—অথৈ। সেই স্রোতের ওপর আবহমান কাল ধরে ঝুঁকে আছে এক কালো আকাশ। ঐখানে সকলের দেখা হবে। কেন না, তারা বিশ্বস্ত থাকে নি নিজের প্রতি, এই দুর্লভ পার্থিব জীবন নিয়ে তারা হেলাফেলা করেছিল।

এসব সে নিজেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবনা পাল্টে ফেলে। বারংবার সে ঐ ষ্টীমারঘাটের অর্থ খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায় না। কিন্তু না বুঝেও সে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে অপলক চেয়ে থাকে। জলে চোখ আপনি ভেসে যায়।

।। **শেষ** ।।

ভুলসত্য



দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উঁচু টুলের ওপর পা দু'খানা তোলা। দু'পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাঁ হাতের কাছে ছোট্ট টেবিলের ওপর একটা দামী ট্রানজিস্টার রেডিও। রেডিওর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজী চুরুটের বাক্স, দেশলাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে রোদের ঠিক্‌রে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড়ো করে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিওতে। তিনি খবরটায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয়পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্জনজঙ্ঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নিচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে— এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে, যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা...........সরোজিনী, দিগিনের বোন। এ সব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুর দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ। মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দু'দিন পর। সরোজিনী একটু পাগলী আছে। রামপ্রসাদী সুরে সারাদিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়ও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু

পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছে তাঁর। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল। উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগী ঘর। বারান্দা থেকে অনেক দূর দেখা যায়। খুব বেশী গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাঁদ-ফাঁদ দেখলে কুকুর-বেড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ওদের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে তেমন ভাল ঘুম হবে না মনে করে দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা বীয়ার দিয়ে গিলে ফেলেন। বীয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন—তাই কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন আবার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বীয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝে মধ্যে সেই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, 'কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয় নি যে গোল হবে।

কাঠের সিঁড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারো এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্তি বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে— ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শানু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে—ও কাকা।

ছাড়বে না। দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বলেন—হুঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—শরীরটা ভাল নেই, কেন?

—সোপস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেন্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজী হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

—কত?

—পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা

বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন—খামোখা।

—এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাবো?

—গেলেই ভাল। নইলে আরো টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে?

—হিসেব তো এখনো শেষ করি নি। খরচ তো এখনো হচ্ছে। তবে হাজার ত্রিশেক বেরিয়ে গেছে।

—আরো যাবে।

—লস্ হবে বলছ?

—হবে।

—কেন?

—ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ?

—করিয়েছি।

—কী বলে সার্ভেয়াররা?

—কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভাল নয়। নিচের দিকে ভাল জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

—হুঁ। দিগিন বলেন।

—কী করব?

—যা বলবার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনো অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কলকাতায় যে নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভাল খদ্দের ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালই পাবো।

দিগিন চোখটা খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন—যা ভাল বোঝ করো।

শানু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে—তুমি একদম অ্যাডভাইস দিচ্ছ না। গত দু'বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী হয় একবার ভেবে দেখেছ? কত টাকা জলে যাবে!

—সোপস্টোন তো আর হীরে-জহরৎ নয়। ওর পিছনে দু'বছর অত টাকা ঢালা বোকামী হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শানু রেগে গিয়ে বলে—কিন্তু ভুটান গভর্নমেণ্ট অত টাকা চাইবে কেন? ডিপোজিটটার খোঁজও তো ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন—তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যবসা করবে।

—কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে? ওরা দেবে?

—খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাও নি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন?

—কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

—ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি লাভ চাইছি না। খরচটা যদি উঠে আসত।

—উঠবে না। বরং আরো টাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। দুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত।

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ দুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ার নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল—কাছে-পিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনো খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়। লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরো তিনজন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, ত্রিশ হাজারের বেশীই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

—ছোটকাকা।

—হুঁ।

—অনেক লস হয়ে গেল।

—বুঝতে তো পারছি।

—বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে।

—কী করব?

—কিছু একটা করা তো দরকার।

—দু'বছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ—এ তো ভালই। তোমার লাভ যদি লবডংকাও হয়, তবু ঐ চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শানু কোমরে হাত দিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে—তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

—যাচ্ছি না। গেছি। বলে আর একটা সরু মাদ্রাজী চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুণি তাঁর তৃতীয় কাপ চা আসবে। ত্রিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাৎ হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্ফুর্তিযুক্ত হয়ে বলেন—যা গেছে গেছে। ছেড়ে দাও। ঠিকাদারীটা ধরে রাখো। ঐটাই শেষ পর্যন্ত টিকবে।

—যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেও না।

—ভুলি নি বলেই তো বলছি। আরো যা লস্ হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শানু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়!

সে যেতে না যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—চা।

—হুঁ।

ঠক্ করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে—কারা যেন আসছে আজকে আবার।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—কারা?

—কী জানি! পুন্নি ঠোঁট উল্টে বলে—শুনছি কারা যেন আসবে!

—কত কে আসে! দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন—কার কথা বলছিস?

—তুমি বুঝি জানো না? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।

—ও। বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ে চুমুক দেন। আগুন গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন! দোতলায় উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন! পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনো শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

—তা কী করবে? পুন্নি জিজ্ঞেস করে।

—কী করব? এলে আসবে।

—আমি সামনে যাবো না।

—সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন। চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।

—আমি সামনেই যাবো না।

—কেন?

—আমার ভাল লাগে না।

—ও। বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিওটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিও বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতায় ওপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—আমি যা বলেছি শুনেছ তো।

—শুনলাম।

—আমি সামনে যাবো না।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।

দিগিন 'হুঁ' দেন।

—ঠিক তো? পুন্নি সন্দেহে জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

—কী করবে?

—তোর বদলে দক্‌লীকে দেখিয়ে দেবো।

—টের পাবে না?

—টের পাবে কেন? এতো বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দক্‌লীও তো আমাদের ভাগনীই! তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে—আহা।

দিগিন বলেন—কী হল?

পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে—দক্‌লী ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

—ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি? তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন একবার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সেবার। তার আগের দিন একটা প্রকাণ্ড তরমুজ কিনে এনে তার একদিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেনো, হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের একধারে তাকে বসিয়ে অন্য ধারে নিজে বসেন। তরমুজটাকে একবার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন, ভাইপো আবার তাঁর দিকে গড়িয়ে দেয়। এই ভাবে ঘণ্টাকয়েক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম্ তৈরী করে রেখেছিল পেটের মধ্যে, তাঁর কোনো ধারণা ছিল না দিগিনের। পরদিন বন্ধুদের এসে পৌঁছুনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে আসতে পরদিন সকাল। বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ঐ তরমুজের ধারে কাছেও তারা ঘেঁষে নি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বীয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আদতে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো

বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। একমাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিংয়ের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমন্ত, জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারীর কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগী ঘর সমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তাঁর হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তাঁর অভ্যাস। আর একা বোকা থেকে থেকেই তাঁর নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোদক কিছুই বাদ রাখেন নি। এখনো তাঁর নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধা-ধরা জীবন ভাল লাগে না।

দেশ-ভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বৌ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্ছা-কাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকীত্বটা সেই চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগী ঘরটার আশেপাশে আরো দু'খানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাঁদের ভাঙে নি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজ জনের ওষুধের স্টেশনারী, বড় ভগ্নীপতি কয়লার ব্যবসা করে, ছোট ভগ্নীপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটরসাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন—কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগন থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামী একটা বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ছাঁটের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা। জুলপী চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দু'খিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

—আরে দিগিনদাদা!

—যাচ্ছিস কোথায়?

—*কাল রাতে জোর ধস্' নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজী তো* খার্শাংয়ে আট্‌কা পড়ে আছেন। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এপারে আসতে পারে তো নিয়ে আসবো।

দিগিন বলল—ধস্? কৈ আমি তো শুনি নি।

—শুনবেন কী করে? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্জনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকাট্ রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি। আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। একসময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নী করেছিলেন দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভাল আয় হত।

দিগিন বলেন—বের হয়ে হবে কী? কাজ-কারবার কিছু নেই।

—কাজ নেই কে বলে? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরীবের বাড়িতে। ডিস্‌কাস্ করা যাবে।

দিগিন লক্ষ্য করেন, কাঞ্চনের জুল্‌পীর চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখ'ন নেই। দিগিন বলেন—আসব'খন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে—শানুর মাথায় পোকা। শোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেণ্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে, শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোকসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন—বেশ আছিস কাঞ্চন।

—হ্যাঁ দাদা, ভাল আছি। তবে ভাল আর থাকা যাবে না।

—ও কথা সবাই বলে।

—জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা, বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়ে নি। তাঁর চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তর বাংলার সবচেয়ে

বড় ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরনো ঠিকাদারীর ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যবসাতে নেই, ওকালতী করে তার একরকম চলে যায়। মেজ জন পুরনো বাজারে একটা স্টেশনারী দোকান দিয়ে বসে আছে। বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না! শানু আর দু'জন ভাইপোকে নিজের ঠিকাদারীতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চলাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে অবশ্য ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায়-আসে না! আটান্ন বছর বয়স, কিছু থোক টাকা আছে—চলে যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভাল করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন—শানুটাকে ব্যবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে—শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটরসাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন—তোর সঙ্গে একদিন বসব।

—আচ্ছা।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগনে উঠল। সিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেণ্টের ঘরে ঢুকে গেলেন! এজেণ্ট ভটচার্য্য বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচার্য্যের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ঐরকমই বয়স। ভটচার্য বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানীতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষন্ন গলায় বলেন—এই তো।

ভটচার্য দিগিনের অন্যমস্কতা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু বেশী কথার মধ্যে গেলেন না। তিনজন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচার্য শুধু বললেন—এবার পুজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

—হুঁ।

—আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষপর্যন্ত।

বলে ভটচার্য ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—একটা খান। চুরুট খেয়ে খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন। নিজের সরু মাদ্রাজী চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাল লাগে না। ফস্‌ফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে।

ভটচার্য বলেন—নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনো কিন্তু ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট্ থাকেন মশাই।

—ফিট্ থাকি নেশা করি বলেই।

—সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

—মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

—কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

—হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনো রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচার্য একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন—সত্যি?

দিগিন চুরুটটা আরামে টেনে হেসে বলেন—কোনো মাতালের ছোটখাটো অসুখ দেখেছেন কখনো? জেনুইন মাতালের ওসব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

—দূর!

—মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচার্য চিন্তিত মুখে বলেন—তা বটে।

—তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজারভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কিনা।

—আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

—তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনী নেশা।

—না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে—অ্যালকোহল আরো ভাল। আজ রাতে আসুন আমার ওখানে, একটা মজার জিনিস খাওয়াবো। দেশী জিনিস সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেবো। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচার্য। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন—আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করবেন না তো?

—গিনিপিগ! বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন—আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচার্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপন মনে হাত দু'খানা টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তার মাংসপেশী বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায় নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টান-টান, হাঁটা-চলা-পরিশ্রম কোনো যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচার্য আবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন—শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাঙ্ ধরাবেন না তো মশাই?

দিগিন ভট্চার্যের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন—জীবনের একটা দিক একেবারে না জানা থাকা কি ভাল? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভাল। নইলে যখন ওপারে যাবেন, যখন যম জিজ্ঞেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কি কি রকম সব অভিজ্ঞতা হল—তখন তো ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচার্য মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন, বয়সকালে রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভাঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেন্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা যোগাবে কে?

—ভূতে, নেশারু লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

—না মশাই, আমার ওসব দরকার নেই।

—আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, একদিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায়? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত একদিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেবো। ঐ সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

বলে দিগিন ওঠেন।

—আচ্ছা যাবো, ভটচার্য হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটরসাইকেলে ওঠেন।

আজকাল আর তাঁর একাউন্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতিমাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে, তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কি কারণে যেন সংসারের খরচের সিংহ ভাগ তাঁকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটরসাইকেলটা নিয়ে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন সাইটটা একটু দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রীজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাকগে, ঠিকাদারীটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তাঁর মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন!

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলো বাইকটা চালান দিগিন. শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তাঁর চেনা। বাইক থামিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলেন. কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোলো না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায় উপত্যকার মতো বিশাল নীচু মাঠ আর বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিও স্টেশন পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বাঁ ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক আধটা মিলিটারী জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারীর লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারাদিনই থাকে।

আটমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পৌঁছে যান তিনি! অনেককাল আসা হয় নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়ি-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্ত্রীর তৈরি দু'চারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারী, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা মিলিয়ে জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্প বয়সী বাকসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এরকম একটু সংলাপ আসে—

মহিলাকণ্ঠ—সে কেমন দেখতে?

বাকসিদ্ধাই—রোগা, ফর্সা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ—আমার ছেলের সঙ্গে মানায়?

বাকসিদ্ধাই—মানায়।

—জাত

—স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ স্বনিশ্বাসে বলে, বিয়েটা হবে?

—হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতগুলো বাচ্চা খেলছে। উত্তরপ্রান্তে ক্ষেত। উদাস মাঠ, তার ওপাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজী চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উঁকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালী কাটখোট্টা এক মিলিটারী সওয়াল জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায়, সেরে যাবে। চিনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন। সিদ্ধাই তাঁকে চেনে। একবার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে—ভাল তো?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন—না।

—কী হয়েছে?

—আমার ভাইপো—বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এসব প্রশ্নের কোনো মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় থাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন—মা, আমার

মরণ কবে?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে—সে দেরি আছে।

—কত দেরি?

—অনেক দেরি, তবে একটা ডাগুর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

—ডাগুর মেয়েছেলে? সে কে?

—ফর্সা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ী মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন—কীরকম ক্ষতি?

—পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

—বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলেন—সাবধানে থাকবেন; তবে আপনার এখনো অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচটাকার নোট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে—আর কিছু জানবেন না?

—না আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই!

বুড়ো মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে—শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেবো, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কি? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুন্নি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন—কী রে?

—ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

—চা, তার এত তাড়া কী?

—বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে

কী করে।

দিগিন হাসলেন। ত্রিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম ম করে। বলেন—যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যাথার কী? আমি তো দক্‌লীকে বলে রেখেছি, সে রাজীও হয়েছে।

পুন্নি বলে—ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে—রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভাল লাগে।

—তোকে বসতে কেউ বলেছে?

—না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

—ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?

—হুড়োহুড়ি আবার কী! পুন্নি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে—চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারাদিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনো ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তাঁর নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত; তবু মনে মনে একরকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল গঞ্জ মতো জায়গা। বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যবসা, চা-বাগানের মালিকানা—কোনো চেষ্টাই তাঁর কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামীর খেয়ালবশে একবার মধ্যপ্রদেশও চলে যান হীরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে! তাঁবুকে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হীরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হীরে পান নি তা নয়। ছোট ছোট কম দামী কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনোক্রমে উঠেছিল হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জণ্ডিস ধরল, মাস ছয়েক সেই

রোগে শয্যশায়ী রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর নেশাভাঙ একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়েছুড়ে দিয়েও ছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন মনে হল—একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকীত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও—তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন হরেন বোস। সে লোকটা বড় ভালবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন—বিয়ে না করে একরকম ভালই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি লোটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই, কিন্তু চল্লিশের পর ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ঐ বয়স থেকেই লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর বা নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্য-উপলক্ষে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা দুটো দিন কাটতেন। চারধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনো কোনো বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জ্বেলে বোতল নিয়ে বসতেন দুজনে। কথা হত।

হরেন বোস একদিন তাঁর শালীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বৌ ছিল নেপালী। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালী ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকীত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজী ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে। করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বৌয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারীতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরীতে পারিবারিক সব্জীর দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশী বয়স নয়—দীনদরিদ্র পোশাক পরে দু'গালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াস, বাঁধাকপি, বীন, শুঁটি, ফুলকপি সাজানো। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালী কয়েকজন গ্যাঁদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব।

মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন—আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তো রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নীচু নজরে দেখে, কুপ্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কচি আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজী হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সূর্যোদয় দেখতে। বহুবার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না, ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁফ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালী ভাষা বলতে পারেন দিগিন, ময়না জানে ভাল বাংলা কথা। কথাবার্তার কোন অসুবিধে হয় নি। আকাশে তখন ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পাল্টে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ঐ বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন—থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেরে-কেটে ষোলো, রাজী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল—যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলো, তাহলে থাকব।

—থাকা মানে কী, জানো তো?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোন পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনো রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে এবং সেটাই নিরাপদ। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাঁদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেন নি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়ে

ছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবনযাপন থেকেই তিনি তার স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশী কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন—তোমাকে কলকাতা দেখাবো।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জীপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জীপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায় যেতে তাঁর ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়ে ছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করে নি।

ঠংগী ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন বোস বা মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোনো সময়ে হাজির হতে পারে। পুলিস লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিনদিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

—কী খবর ভায়া?

—ভালই।

—ময়না?

—আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—জানতাম। বলে একটু শ্বাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার উপায় নেই। নেপালী পোশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁথেয় সিঁদুর, একবেণীতে বাঁধা চুল, খুশীতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশী হলেন। বললেন—ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকান নি। বলেন—তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজী নই।

—কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

—ওসব ছাড়ুন। ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপক্ষ হিসেবে।

—ময়না এরকম সম্পর্ক মানবে?

—মানবে আবার কী। মেনে তো নিয়েছে।

—না, মানে নি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করো নি। বয়স হলে বুঝবে।

—ও একরকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি!

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীর ভাবে বললেন—ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

—দিয়ে দিচ্ছি।

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমী 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। বললেন—তাহলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন—হঠাৎ এরকম ধারা করতে গেলে কেন?

দিগিন একটু ভেবে বলেন—আসলে কী জানেন দাদা যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনো ঠিক করি নি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাবো। ভেবেছিলাম আমার বাউণ্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নিচে গভীর উপত্যকায় যেন কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁদিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে আরো সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কতবার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশেপাশে আবছায়ায় বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে দেখছে এসব। ঐ রকম খোলা জায়গায় ঐ অন্ধকারের গভীর

বিশাল অন্ধকারের সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামী আর নেই। যার একটা জায়গায় শেকড় গজায় সে বাকী দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভাল।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—বুঝেছি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন—আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরীতে কামড় বসিয়ে বললেন—তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে রে? রামরও?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন—মেয়েটা ভাল, দেখো দিগিন।

—চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকে নি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দু'চারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনো দেন নি। তখন প্রাচীনপন্থী মা-বাপ বেঁচে, পুরনো প্রথাও মরে যায় নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশ-ভাগের পর পরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে। তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দু'বছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে করা বৌ বলে কখনো মনে করেন নি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশী নিজস্ব জীবন যাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে—সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশী কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাঁটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে, বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা-বাপ তখনো বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভাল ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশী বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু'এক কথাতে সে রাজী হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘরদোর সাফ করলেন দিগিন। তাঁর কিছু মনে হল না, কোনো অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিঁড়েও ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশী ছিল না। বাড়ির লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে নি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভাল হয় তো তার দু একটা স্বভাবদোষ মানতে কারো আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ছোট্ট একটু বাড়িতে উঠে গেছে ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন দিগিন নিজেই। ময়না যৌবনকালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়েও গেছে একটা অপদার্থ জাতভাইয়ের সঙ্গে। পোষায় নি বলে ফিরে এসেছে। লটঘট করেছিল নির্মল সিংয়ের ছোটছেলে অবতার সিংয়ের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে করা বৌ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয় নি, বাঁজা ময়না এখনো নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ছোট্ট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছুদিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে। কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার বৌ বা ছেলেপুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু তবু ময়না একা। বড় একা।

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিক্শা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তাঁর ফর্সা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভাল লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন—দেখেন, যেন ঠিক পাক্না শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন—সেই লৌকিকতা।

—না না, কিছু নয়। বলে পুন্নির বাপ—একটু মিষ্টিমুখ আর কি।

—রক্তে চিনি একশ কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তাহলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেল পুন্নির বাপ। পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি নয়, সবাই জানে। তবু পুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে একপলকের বেশী চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরী করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে দিতে বললেন—যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিজ্ঞেস করেন—কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—রং তো কালই, মুখশ্রী ঐ চলনসৈ।

পুন্নির বাবা বলতে গেল—কিন্তু কাজকর্ম—

ভদ্রলোক হাত তুলে বলেন—ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজকর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারী নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন—কী দেবেন আপনারা?

—যা চান। দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন।

—চাওয়ার কী। আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

—যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

—হুঁ। বলে গম্ভীর ভাবে আবার চা খেলেন, বললেন—আলমারি তো গোদরেজের?

—তাই হবে।

—গয়না?

—চৌদ্দ-পনেরো ভরি।

—ঘড়িটা?

—রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন—আমি কি পাবো?

—মানে?

—ছেলে আর ছেলের বৌ তো এসব পাবে। আমার পাওনা কী?

—কী চান?

—নগদ।

—বলুন কত?

—আমি বলব না। শুনব!

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাত জোড় করে বলেন—আমি কিছু বলব না, আরো চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অঙ্ক পেয়েছি। সব লিখে জামসেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপারটা পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিক ভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নীপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন—দিগিন।

গেলেন না। মাদ্রাজী চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন—আমরা দুই হাজার নগদ দেবো।

—দুই? ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

তারপর হঠাৎ বললেন—দশ।

—অ্যাঁ! ভদ্রলোক তাকালেন।

—দশহাজার দেবো। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নীপতি সন্দেহের চোখে দিগিনকে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন, আচ্ছা।

—আচ্ছা নয়, দশহাজার নগদ দেবো বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখার মতো

করে কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ গিনিপিগের মধ্যে কোন্ কথায় বা কোন্ অবস্থায় কীরকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ্য করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফর্সা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলেন—আমার বড় আদরের ভাগ্নী। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভাল বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

—কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ—কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন—সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ নইলে একটি ব্রিলিয়াণ্ট এঞ্জিনীয়র ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তাহলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে। লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর একটু লাল করে তুললেন। আধখাওয়া জলের গ্লাসটায় একবার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন—আলমারিটা গোদরেজের তো?

—নিশ্চয়ই।

—সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন—পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেবো। আর প্রত্যেকটা এক ভরি ওজনের ছ গাছা চুড়ি।

—আমার ছেলে কী পাবে? এ তো মেয়ের কথা হল, ভালই—

—একটা স্কুটার দেবো, একটা ফ্রিজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান। আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুড়ির নামজাদা লোকদের একজন। তার প্রভাবপ্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানী কেন, মেয়ের কোনো গুপ্ত খুঁত আছে কিনা এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন—আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন

তেমন স্বভাবের মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

—না, না, তার কী দরকার?

—খোঁজ নেওয়া ভাল, সন্দেহের দরকার কী?

বড়দা ভ্রূ কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁর বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেন নি। মেজদাও খুশী নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলে—তাহলে পাকা কথা আজই হয়ে যাক! বলে সমর্থনের জন্য চারদিকে তাকাল। তাঁর দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন—সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন—মন্দ কী?

—তাহলে? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন—ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন—না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই ঘরে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিত ভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন—মেয়েটিকে আর একবার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিনেছে, এ কথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করে নি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন—মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড়বৌমা হবে তুমি। তা রান্না-টান্না, কি বুড়োবুড়ির একটু সেবা-টেবা—এসব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথা নত করে নিয়ম মাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিনবার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে তিনটে ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে

দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন—মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

—কথা দিচ্ছেন তাহলে?

ভদ্রলোক একরকমের হাঁফধরা হাসি হেসে বললেন—ঐ দেওয়াই হল।

—আমরা খুব বেশী দেরি করতে পারব না।

—দেরি করে আমাদেরই লাভ কী?

—তাহলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

—করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

—স্ত্রীকে সব টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত নিন। কিন্তু সেগুলো সেকেণ্ডারী ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানি-সেন্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন—তাহলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই এঞ্জিনীয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁফ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁফ ছাড়লেন দিগিনও। পুন্নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেইজন্যই তার ভাল বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবে না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার। সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভাল মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের একজন। লেখাপড়া করে নি, জাতে নিচু, গুণের মধ্যে ভাল গোলকীপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সারারাত্রি ধরে একটা ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে একবার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি

ফাংশনে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা-বাবা মেয়েকে শাসন করেন নি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন—ওসব জাতফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে! বিয়ে দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল। ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশীদূর নয়। বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোক বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তারপর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায় এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা কিছু চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ওসব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না। ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টুবুদ্ধি তাঁর ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন অমলকে ডেকে গোপনে বললেন—আমার ভাগ্নীর সঙ্গে তোমার ভাব শুনছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজ-টাজ কিছু করছ?

—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টায় কী হবে? ধরা-করার কেউ আছে?

—না।

—ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি

পাকা হওয়ার আগে বিয়ে-টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি। বলল—আজ্ঞে না।

এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তা-কর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয় এবং চাকরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আসামের নেফায় তাকে বদলী করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণ ভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায় নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশী হয়েছিল। অমল নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে ডেকে দিগিন বললেন—ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

—কেন ছোটমামা?

—মিলিটারীর সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায় কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারো হাতে যদি পড়ে তো লজ্জার ব্যাপার।

পুন্নি লজ্জা পেয়ে বলে—আচ্ছা।

—সব ক'টা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

—যদি দিতে না চায়?

—দেবে, বলিস না দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছোটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল অমল। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পুন্নির সঙ্গে। কিন্তু পুন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে, এ সত্য পুন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফল্স প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

অমল ক'দিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শীগগীর আর আসবে না। এই ফাঁকে পুন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরী হয়ে এসেছে। বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলেন নি। দুটো গিনিপিগের ওপর তার প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেন নি।

কয়েকদিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পুন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়ো চিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ো চিঠি দিয়েছিল কে জানে।

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক। এবার নিশ্চিত ভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধহয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগী ঘরখানায় এসে বসেন। মনটা ভাল নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের ওপর পা তুলে দেন। পুন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর একটু একা লাগবে। পুন্নিটা খুব সেবা করত!

পুন্নির কথা ভাবতেই পুন্নি উঠে এল নিচে থেকে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

—কী?

—অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে?

—না হয় দিলাম।

—ছি ছি, লোকে কী বলবে?

—কী বলবে?

—ভাল বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগবে। বড়মামা, মেজমামা মেসোমশাই কেউ খুশী হয় নি।

—কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?

—বলেছে।

—কী?

—কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

—সে আমি বুঝব। তোর পাকামীর দরকার কী? যা, চা করে আন।

পুন্নি রাগ করে বলে—আমি এ বিয়ে করব না।

—না করিস না করবি। আমি ঠিক দকলীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেবো।

—তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

—সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পুন্নি চা করতে যায়।

বড়বৌদি এসে ডাকেন। দিগিন ভাই।

—হুঁ।

—তাজ্জব! পুন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে?

—করলাম।

—এত কিছুতে রাজী হলে কেন? কী এমন পাত্র?

—পাত্র খারাপ না।

—তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা—তুমি কী ভেবেছ বল দেখি। ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। তুমি আগ বাড়িয়ে বললে কেন?

—মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টুঁ শব্দও করতে পারবে না।

—কেন? আরো অনেক কমেই তো হত। দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাৎ হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির গিনিপিগকেই লক্ষ্য করছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখনই তিনি তাকে লোভানীর পর লোভানীতে উস্কে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠাণ্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষ গিনিপিগের বেশী কিছু নয়।

বৌদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ঠাকরোন, আজ রাতে ভাল করে শুঁটকী মাছ রাঁধো তো।

—কেন কেউ খাবে নাকি?

—হুঁ।

—কে?

—ভটচার্য, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্ট।

—মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন—ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

—বয়স হল, এখন ওসব ছাড়ো না।

—ছেড়ে ধরবটা কী।

—সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুঁটকী হলেই হবে নাকি?

—না। ঐ সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস, মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটেচচ্চড়ি তো আছেই। ভটচার্য মদ-টদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বৌদি চলে যাওয়ার আগে বলেন—টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘী ঢালা হল। পারলে পাটিপত্রের দিন একটু কাটছাঁট কোরো।

—তাই কখনো হয়! কথা হচ্ছে কথা। কিছু কাটছাঁট হবে না।

—তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস্ দিচ্ছে, ব্যবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন—ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকাদারী তো আছেই। চিন্তা কী?

বৌদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন—পুন্নির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরিব হয়ে যাবো না। ঠাকরোন, ভয় নেই।

বৌদি শ্বাস ফেলে বলেন—তোমরাই বোঝো। আমি মেয়েমানুষ আমার এসব কথায় থাকার কী?

—মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা বাক্যহারা হয়ে যেত।

বৌদি বলেন—তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বৌদি চলে যান। পুন্নি চা নিয়ে আসে। সন্ধে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোর মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যে সব গাড়ি উঠেছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

সন্ধ্যের মুখে দিগিন পোশাক করে মোটরসাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচার্য এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাস গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধারে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউমার্কেটে আলো ঝলসাচ্ছে দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধারে আলোয় আলোময়।

দিগি বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার

পুলের কাছে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাঁকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা গুঁড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায় বাইকটা দাঁড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর কংক্রীটের স্ল্যাব পাতা, তারপরে ঝুমকো লতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করেছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেই সঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দুখানা ঘর, বাগান, কুয়ো সবই আছে। বাছাই ভাল কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রীল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার৭ আর অছে একজন নেপালী ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আহ্লাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পর্দা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে—কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝে মধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকী আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকীতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল, পরনে আলখাল্লা, চোখে সুর্মা মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামানো। চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধহয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশী মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন—আও বেটা।

—কখন এসেছেন?

—বিকালে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

—আমাদের ওখানে গেলেন না তো?

—যাবো। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে।

পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীর আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনো দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোটো হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড় বড় দুটি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিছু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালী ভাষায় কখনো কথা বলে না। এমন কি সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল—ফকির সাহেবের জন্য রান্না করেছি, তুমিও খেয়ে যেও।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

—ও। ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোন মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তাঁর পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিকটিক ফেলেন না। বার দুই তিন হেঁচকী তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন—কি খবর-টবর?

—ভালই।

—বন্নোরহো।

—আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব?

—দিনের বেলা।

—আগেও তো দেখেছেন।

—জরুর।

—আমার মরণ কবে?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই সব জেনে কী হয় রে বেটা?

ময়না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের

দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

—খোদায় মালুম। ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন—কৌন জানে! পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কথাবার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোল বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চলল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এসব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরী বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন—রাখ্। এক মাহিনা আরও খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্ছা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে একবার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শূন্য ভাব। বহুবছর ধরেই কি ময়না তার শূন্যচোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করে নি। কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করে নি কখনো। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন। ময়না আজকাল কেবল একরকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখেছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যতদূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনো বিশ্বাসের ভঙ্গ হয় নি। বৌয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশী সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই। কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারীর দোকানের সেই অশিক্ষিত মেয়েটির কী যায়-আসে! বরং উল্টোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌনকাতরতার জন্যও নয়। সে বোধহয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারে নি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফল্গুধারাকে খুঁজেছে। পায় নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও

যেতে পারে নি ময়না। দাঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনিপিগকেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনো করেন নি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো *সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারো বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে* ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পান নি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতর-বাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইশল্ বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাচ-বসানো আলমারি আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখোমুখি বসে।

—ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ময়না বলে।

—কত?

—বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্চি আজ।

—আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব'খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে—মরার কথা জিজ্ঞেস করেছিলে কেন?

—এমনিই।

—আমিও জিজ্ঞেস করেছি।

—কী?

—বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

—ও।

—ফকির সাহেব বললেন যে বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছে করবে।

—তাই নাকি!

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

—কষ্ট কী? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এসব কথা ভাল বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনো এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল—আমি কোথাও ঠিক চলে যাবো।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে—শুনছ?

—শুনেছি।

—আমি কোথাও চলে যাবো।

—যেও, আমি তো কখনো বারণ করি নি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে—কেন বারণ করো নি?

—কেন করব?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালী মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানারকম পাপ বোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় নি।

প্রেশার কুকারের আর একটা হুইশল্ বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধ প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নিচে বসা ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন—আজ সকালে শালুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন—সিদ্ধাই বলল, একজন ফর্সা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

—মেয়েছেলেটা কে?

—তা বলে নি।

—ফর্সা আর লম্বা?

—হ্যাঁ।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সে কি আমি?

—কী করে বলি?

—কীরকম ক্ষতি?

—তাও স্পষ্ট করে বলে নি।

ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।

দিগিন হেসে বলেন—বোগাস। আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ওসব বলে।

—তুমি তো বিশ্বাস করো!

—না, করি না।

—তবে গিয়েছিলে কেন?

—গিনিপিগ দেখতে।

গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।

—আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি? যদি ক্ষতি করি—তো আমারই ক্ষতি। তুমি ভাল না থাকলে আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে?

—সেইজন্যই তো বলছি, সব বোগাস।

ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল—ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।

—শানু? চমকে ওঠেন দিগিন—কেন?

—তেমন কোনো কারণ তো বলে নি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।

—কী বলল?

—বলল, কাকীমা কিছু টাকা দাও, খুব লস্ যাচ্ছে।

দিগিন অবাক হন, বলেন—কাকীমা বলে ডাকল?

ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।

—টাকা দিলে?

—দিই নি। বললাম, দেবো।

—কত?

—খুব বেশী নয়। দু'হাজার, তোমাকে বলতে বারণ করেছিল।

—কেন?

—ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।

দিগিন আগুন গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে নাড়তে বলেন—ডোবাবে।

—কী?

—ঐ ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।

—এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ওরকম করে ডাকে নি কখনো। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ! কখনো আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন—টাকাটা ওকে দিও না।

—কথা দিলাম যে!

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে ওর ক্ষতি হবে। যতদূর জানি

ও জুয়া-টুয়া খেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

—চা'ক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না পারা ময়না ভিখারিনীর মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন—ইচ্ছে হলে দিও। কিন্তু এ টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করেছে। তাছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দুখানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে—আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তাহলে কী করতে?

—শাসন করতাম।

—বেশী জোর করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবার চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেবো। তুমি কিছু বোলো না।

দিগিন অন্যমনস্ক ভাবে বলেন—সোপস্টোনের পিছনে বহু টাকা নষ্ট করেছে। কিন্তু বলি নি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

—তুমিওতো টাকা কম নষ্ট করো না।

—সে করি রোজগার করে। ওর তো এসব রোজগারের টাকা নয়। ব্যবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, ভালবেসে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেবো।

—সবাইকেই তো ছাড়িয়ে দিয়েছো, কাকে নিয়ে থাকবে?

—আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে! তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে—শানু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন—কী বললে?

—শানু বিয়ে করবে।

—কাকে?

—পছন্দ করা মেয়েকে।

—তোমাকে কে বলল?

—শানু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারেন না!

ময়না নিজেই বলে—মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন! বললেন—ও।

—আমি কী করব?

—শানুকে বলে দিও যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারী ব্যবসার জেরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাজেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশী করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে—আমি কি তোমার বৌ?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলেন—এসব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন?

—ধরো যদি শানুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী! আমার মতো কাউকে বৌ করে এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো?

—পারি। দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

—কেন পারো?

—কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শানুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

ভটচার্য আয়োজন দেখে খুব খুশী। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা-করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলীর চাটটা টেনে নিয়ে বললেন—বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোটো খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই?

দিগিন হেসে বললেন—এ ছোটো খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচার্য মদের স্বাদ পান না। দু-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন—এ মশাই চলবে না। বড্ড লাউড জিনিস।

—তাহলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা ক্ষিদে নষ্ট হবে। বলে দিগিন

জলপান করার মতো দিশী মদ গলায় ঢালেন।

—শুঁটকী মাছ বড় ভালবাসি।

—একটু মাল টেনে নিন, আরো ভাল লাগবে।

ভটচার্য কষ্টেসৃষ্টে আরো দু-এক চুমুক খান। বলেন—মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

—তাহলে আর একটু চালান। ঝিমুনীটা কেটে ফুর্তি লাগবে।

ভটচার্য খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন—এটা খান। এটার স্বাদ ভাল।

পোর্ট ভটচার্যের ভালই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন এক বারে। বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

—আর একটু দিই?

—দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন—খুব দামী জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

—বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

—খান না মশাই, দামকে ভয় কী?

—দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচার্যের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন 'দামী জিনিস' কথাটাই ভটচার্যকে কাত করবে।

করলও। ভটচার্য গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনো ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে?

—একজ্যাক্টলি।

ভটচার্য কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটু দুঃখের কথা বলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোটো করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি!

ভটচার্য হেঁচকি তুলে বলেন—শুঁটকী মাছ!

—আসছে।

—খুব ভাল জিনিস।

—খুব।

—বহুকাল খাইনি, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয়?

—হয়।

—সবাই খায়?

—না। আমি খাই, আর বড়বৌদি। আর কেউ না।

—বৌদি থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।

দিগিন হাসেন।

ভটচার্য হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলেন—কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে!

দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন—কে থাকবে?

—একজন মেয়েছেলে!

দিগিন হেসে বলেন—সে তো সবার থাকে।

—সবার থাকে? ভটচার্য হেঁচকী তোলেন।

—বিয়ে করলেই থাকে।

—না না, বিয়ে করা বৌয়ের কথা নয়।

—তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা।

ভটচার্য অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন—তা বটে। তাহলে আপনার একজন আছে?

—একজন না, কয়েকজন।

—কয়েকজন? ভটচার্য চোখ বড় করে তাকাল।

—লোকে বলে না সে কথা?

—না তো! একজনের কথাই শুনেছি।

—লোকে কমিয়ে বলেছে!

—রাখেন কী করে? একজনেরই যা খরচ!

—রোজগার করি। রাখি!

—বেশ খরচা পড়ে, না?

—তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বৌ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি।

ভটচার্য মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলে—বাড়িতে বসে এসব

খান, কেউ কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—আপত্তি করে না?

—বাড়িটা তো আমার।

—তবু ফ্যামিলিতে কি এসব চলে?

দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে—অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।

—তা বটে।

—ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।

—কী করব?

—ফুর্তি।

—এই বুড়ো বয়েসে?

—ফুর্তির আবার বয়স কী? তাছাড়া সারাজীবন যদি ফুর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশী সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশী খাচ্ছেন।

—না, আর খাবো না।

—খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশী টানলে খাবার খেতে পারবেন না।

—দাঁড়ান। আর দুই চুমুক। আবার অনেকটা খেয়ে ভটচার্য একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বলেন—ঐ! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল! পেটটা হাল্কা লাগছে।

—লাগবেই তো। দেশীটা খেলে আরো বেরিয়ে যেত।

—হ্যাঁ, ফুর্তির কথা কী যেন বলছিলেন?

—এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে—বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে—তখন কী বলবেন? বলার কিছু আছে? ঘ্যান্-ঘ্যান প্যান্প্যান্ করে নাকি সুরে তখন পেটের রোগ, বৌয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট, ক্রেডিট—এইসব বলতে হবে। যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে—যাও, দুনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখ নি।

ভটচার্যের চোখ দু'খানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন—শুঁটকী মাছ?

—হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।

ভটচার্য মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে আবেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলেন—বাড়িতে বড় ধরাকাট! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেসনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।

খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচার্য দু'চামচ ফ্রাইড রাইস খেলেন, এক টুকরো মাংস, শুঁটকী মাছের চচ্চড়িটা মুখে তুললেন মাত্র, খেতে পারলেন না। পোর্টের গেলাস মুখে তুলে চকচকে চোখে চেয়ে দেখলেন দিগিনের দিকে। তারপরেই গেলাস রেখে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন—বৌ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে কদিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন?

—নিশ্চয়ই। দিগিন বলেন।

একটা রিক্শা ডেকে ভটচার্যকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর-বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শানুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

—কে?

—আমি।

—ছোটকাকা।

—হ্যাঁ।

শানু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টায় দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রায়দিনই সন্ধ্যের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তাঁর নেশা হয় নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শানু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে—কিছু বলবে?

—হুঁ, বলে দিগিন শানুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভাল। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদি পাতা খাটে, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শানু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র‍্যাকে সাজানো।

ওয়ার্ডরোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশী জামাকাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শানু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

—শানু।

—বলো।

—ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শানু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল—তুমি চিরটা কাল কাকীমাকে বড় হেলাফেলা করেছ।

—কাকীমা!

—নয়?

দিগিন শ্বাস ফেললেন।

শানু বলে—মানুষ যাই বলে বলুক, আমি জানি কাকীমা বলেই।

একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন—বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন?

—সম্পর্কটা সহজ করতে!

—সেটা নিয়ে তোমার মাথাব্যাথা কেন?

শানু গম্ভীর হয়ে বলে—ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ?

—অন্যায়?

—অন্যায় ছাড়া কী? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে মর্যাদা—

—থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন?

—চেয়েছিলাম ধার হিসেবে।

—কেন?

—সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।

—সেটা আমাকে বলিস নি কেন?

—বললে তো বকতে।

—এখন কি বকব না?

শানু শ্বাস ফেলে বলল—সোপস্টোনের লস্‌টা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলেছি তার চেয়ে বেশী লস্ হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশী হয়ে গেছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবাররা ক্ষেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে

না।

নিজের দু'খানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন, শানুর কোনো কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না। জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল এসব কথা একটা জীবনে তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তাঁর কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।

দিগিন তাঁর চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন—আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনো আছে। লোকে বলে, আমার হৃদয় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদ্‌গুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দু'হাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনো শর্টকাট রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতি স্বীকার করেছি, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমরা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

শানু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।

—কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে?

—একটা ব্রীজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।

—জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাবো। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে রেখো।

—লেবাররা ছেড়ে দেবে না! ওদের অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে।

—সেজন্য কে দায়ী?

—আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। তখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।

—খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কালই তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল।

—কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।

শানু মাথা তুলে বলে—জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো।

—হলে হবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ছোটকাকা।

—বলো।

—আর একটু ভেবে দেখো।

—ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।

—একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।

—জানি। আমি বো··। নই।

—তবু যেতে বলছ?

দিগিন রাগের গলায় বলেন—শুনতেই তো পাচ্ছ।

—ঠিক আছে।

—যদি লেবাররা গোলমাল করতে চায় তাহলে কী করবে?

—কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেণ্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনো ক্যানসেল করে নি, সুতরাং বাকীটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।

শানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—মনে রেখো লেবার পেমেণ্ট সবার আগে।

—আচ্ছা।

—আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ?

—অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।

—তবু ছেড়ে দাও।

—এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে?

—কী বলবে? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনার ইনিশিয়েটিভ নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেণ্ট দর কমাবে না।

—ভেবে দেখি।

—দেখ! আর শোনো, যদি ময়নাকে তোমার কাকীমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িও না।

শানু মুখটা তুলেই নামিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

—ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করে নি।

দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বলার আছে?

শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। কখনো ঈশ্বর, কখনো শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভাল করে চেনে, আবার আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে—তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

—তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে—আমি প্রতিবাদ করছি না।

—আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

—কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন—বুঝে দেখ।

—আমি খারাপ কিছু করছি না।

—তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কী করে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায় বলেন—তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতাবশতঃ তোমার যে কোনো ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

—বলো, তাই ভেবেছিলে?

—না।

—তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন্ সাহসে?

—আমি তোমাকে যথা সময়ে বলতাম।

—না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

—ঠিক আছে। বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলো।

—আমি কাকীমার কাছে ওকে রাখবো না।

—তাহলে কোথায় রাখবে?

—অন্য কোথাও।

—রাখবেই?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন—না।

শানু তাকায়, বলে—উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন—তুমি কাল যাচ্ছ কিনা?

—যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—কালিম্পঙ আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে?

শানু মৃদুস্বরে বলে—কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্যে যাচ্ছ তা হবে না।

—কী জন্য যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে?

—বুঝেছি। তুমি গোলমাল কোরো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন—শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনো বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর ঘরে চলে আসেন। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে বীয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শার্শি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তর দিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তাঁর নয়। তবু সবই তাঁকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুম চোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কন্‌স্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে।

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন

ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নিচে, বহু নিচে তিস্তা। তিস্তার দু'ধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রীজ। হঠাৎ দেখেন একটু দূরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা দুলিয়েছে। সেই দোলনায় ঝুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চীৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন......পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চীৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দক্‌লীর মা চেঁচিয়ে সুর করে গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধহয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারাদিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দক্‌লীর বাপ চীৎকার করে ধমকাল। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনো বোঝেন নি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণ কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন।

সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন—আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

—কেন?

—লিকার খাবো।

পুন্নি তাই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকারে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভাল নেই। কালিম্পঙ যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে

না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

—ছোটকাকা।

—উঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—না।

—আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

—কেন?

—তুমি বললে যে।

—ও।

—যাচ্ছি।

—যাবে? যাও।

—চেকটা লিখে রেখেছ?

—হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে নাও।

শানু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্ত ভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশী কিছু নয়।

—সেভিংস অ্যাকাউণ্টের চেক! এত টাকার চেক কি বিনা নোটিসে ক্যাশ করবে? শানু জিজ্ঞেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে বললেন—করবে। ভটচার্যকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শানু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খস্‌খস্‌ করে দু'লাইন লিখে দেন। শানু চলে যেতেই আবার ক্লান্ত ভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল, ভয়ঙ্কর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর দেখেছেন। ঐ নিস্তব্ধতা কতবার তাঁকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তাঁর কাছেই চলে আসছে তুষারশুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন

পাহাড়ের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তাঁর জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনো যোগাযোগই নেই।

পুন্নির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচার্যকে দু'লাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন—এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন—এখনই কেন?

—আমি কালিম্পঙ যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে কোনো অজুহাতে শো করবেন।

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন। অনিচ্ছুক ভাবে বলেন—আচ্ছা।

দিগিন আর কোনো দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না—এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তাঁর তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুণি তোড়জোড় করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জীপটা রেডি রাখতে হবে, দু'চার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সেসব জরুরী কাজ পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ। ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে! সরু মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালী-সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর নীল আকাশ।

টাকা—এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ঐ শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।।

মোটরসাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ দশ টকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রীটা উঠে এসে বলল—একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন! চোখের আড়াল হলেই ওদের জো। তখন পিন-এর সঙ্গে এটা ভেঙেছে, ওটা পুরনো হয়েছে, সেটা পাল্টানো দরকার বলে নানারকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। আজও শেষ হয় নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তি ভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোটো মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও! মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে—তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়াল না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরোনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্টক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাবজীর জলঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোটো গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড় হারামজাদা। সরাব্জী থেকে সাহেবের নাম করে দু-বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বৌ মরল। মল্লিকা তখন দু-আড়াই বছরের, মা মরা, একলা। কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করতে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে। কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ঐ মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ

চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে। কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেন নি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে। সেই শিশুটির ধারে কাছে কেউ ছিল না। একা খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা, মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখছে। দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইশল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেন নি, আদর করেন নি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কতো বড় হয়েছে এখন, সংসারীও হয় নি কি! কিন্তু সেসব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ঐ কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, দু'হাতে দু'মুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখে লেপটানো কাজল, আর তার চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়! তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ওরকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে! নাকি, শিশুটি নাড়া দেয় এক অক্ষম পিতৃত্বকে? কী হয়, কে জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি ব্রীজ! কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেন নি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জীপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তাঁরই জীপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জীপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে ধূর্তামী, মুখে একটু নির্বিকার শয়তানীর ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির

ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। আজও শেষ হয় নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তি ভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোটো মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও! মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে—তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়াল না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরোনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্টক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাবজীর জলঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোটো গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না. কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড় হারামজাদা। সরাব্‌জী থেকে সাহেবের নাম করে দু বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বৌ মরল। মল্লিকা তখন দু-আড়াই বছরের, মা মরা, একলা। কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করতে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে। কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ঐ মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ

চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে। কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেন নি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে। সেই শিশুটির ধারে কাছে কেউ ছিল না। একা খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা, মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখছে। দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইশল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেন নি, আদর করেন নি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কতো বড় হয়েছে এখন, সংসারীও হয় নি কি! কিন্তু সেসব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ঐ কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, দু'হাতে দু'মুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখে লেপটানো কাজল, আর তার চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়! তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ওরকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে! নাকি, শিশুটি নাড়া দেয় এক অক্ষম পিতৃত্বকে? কী হয়, কে জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি ব্রীজ! কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেন নি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জীপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তাঁরই জীপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জীপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে ধূর্তামী, মুখে একটু নির্বিকার শয়তানীর ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জীপ্‌টা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে—ওসব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন—দর কত?

ছিপ্‌কি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনো পায় নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালীতে বলল—লোকটা কী বলছে শুনছো?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন—কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপ্‌কিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন—পঞ্চাশ টাকা।

বলেই কোটের ভিতর পকেট থেকে অন্তত সাত আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশটাকার নোট গুণে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল. ছিপ্‌কি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পর্দাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পর্দা ধরা. অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসে ছিলেন, গা ঘেঁসে ছিপ্‌কি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি। সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করে নি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল—এসব কিন্তু গরমী নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর

চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হন নি। মহানন্দা পুলের কাছে ঐ দোকানটা যেতে আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপ্‌কিকেও দু'চারবার লক্ষ্য করেছেন, কপিলকে সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জীপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুর বাতাসে। অন্তত চার পাঁচ পেগ নীট হুইস্কি ছিল পেটে! মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন—কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপ্‌কির বোধহয় খদ্দের জোটে নি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলী সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখছে। দু'চার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপ্‌কিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধহয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপ্‌কি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পাল্টে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক আধজন যারা বসেছিল তারাও গরম গরম চা হুস্‌ হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপ্‌কির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জীপ্‌ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপ্‌কির স্বামীর সেসব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার—কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে—চা, রুটি, ডিম।

—আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগিনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন—মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জীপ্‌টা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে—ওসব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন—দর কত?

ছিপ্‌কি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনো পায় নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালীতে বলল—লোকটা কী বলছে শুনছো?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন—কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপ্‌কিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন—পঞ্চাশ টাকা।

বলেই কোটের ভিতর পকেট থেকে অন্তত সাত আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশটাকার নোট গুণে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপ্‌কি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পর্দাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পর্দা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসে ছিলেন, গা ঘেঁসে ছিপ্‌কি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি। সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করে নি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল—এসব কিন্তু গরমী নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর

চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হন নি। মহানন্দা পুলের কাছে ঐ দোকানটা যেতে আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপ্‌কিকেও দু'চারবার লক্ষ্য করেছেন, কপিলকে সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জীপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুর বাতাসে। অন্তত চার পাঁচ পেগ নীট হুইস্কি ছিল পেটে! মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন—কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপ্‌কির বোধহয় খদ্দের জোটে নি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলী সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখছে। দু'চার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপ্‌কিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধহয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপ্‌কি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পাল্টে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক আধজন যারা বসেছিল তারাও গরম গরম চা হুস্ হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপ্‌কির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জীপ্ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপ্‌কির স্বামীর সেসব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার—কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে—চা, রুটি, ডিম।

—আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগিনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন—মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন—রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন—হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশী নয়। সবাই যেন পাকে—প্রকারে, নানা আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে। গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশী স্ট্রেচ প্যাণ্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জী। নীল প্যাণ্ট, আর হাল্কা হলুদ গেঞ্জীতে খুবই ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবী ধরনের চেহারা। কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন একবার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জীপ থামতেই শানু দৌড়ে এল।

—কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয় নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন—কত টাকার মাল গেছে?

—তিন-চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোটো কাজ ছিল বেশী মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—শাটারিংয়ের কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছো?

শানু একটু যেন অবাক হয়ে বলে—না, এখনি আবার শাটারিংয়ের কাঠ কিনব কেন? যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর-পি আছে, বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন—সে তুমি দেখগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাতদিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তা ছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন—পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো।

দিগিন অবাক হন। বলেন—জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল—কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তির শব্দ করে বললেন—চৌকিদার কে ছিল?

—কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাজে পাঠিয়ে দেন। বলছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কন্তু কপিল কখনো কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনোকালে সন্ধ্যের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন—চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

—কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরীটা পাস করতেই। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে খুব গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেণ্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেণ্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যান দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারীও যাবে চ্যাটার্জী কন্‌স্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশী লাভ খাবে, প্রথম লরীটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না! আবার তৈরী করতে ডবল গচ্ছা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুরে করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগাবি?

—আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেবোখ'ন।

দিগিন চিন্তিত ভাবে জীপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সীটে বসা কপিল একটু কেশে বলল—ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা

সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন—রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন—হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশী নয়। সবাই যেন পাকে—প্রকারে, নানা আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে! গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশী স্ট্রেচ প্যাণ্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জী। নীল প্যাণ্ট, আর হাল্কা হলুদ গেঞ্জীতে খুবই ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবী ধরনের চেহারা। কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন একবার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জীপ থামতেই শানু দৌড়ে এল।

—কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয় নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন—কত টাকার মাল গেছে?

—তিন-চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোটো কাজ ছিল বেশী মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—শাটারিংয়ের কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছো?

শানু একটু যেন অবাক হয়ে বলে—না, এখনি আবার শাটারিংয়ের কাঠ কিনব কেন? যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর-পি আছে, বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন—সে তুমি দেখগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাতদিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তা ছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন—পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো।

দিগিন অবাক হন। বলেন—জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল—কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তির শব্দ করে বললেন—চৌকিদার কে ছিল?

—কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাজে পাঠিয়ে দেন। বলছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কন্তু কপিল কখনো কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনোকালে সন্ধ্যের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন—চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

—কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরীটা পাস করতেই। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে খুব গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেণ্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেণ্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যান দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারীও যাবে চ্যাটার্জী কনস্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশী লাভ খাবে, প্রথম লরীটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না! আবার তৈরী করতে ডবল গচ্ছা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুরে করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগাবি?

—আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেবোখ'ন।

দিগিন চিন্তিত ভাবে জীপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সীটে বসা কপিল একটু কেশে বলল—ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা

দেমাক কিসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানে না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোন পরিবর্তন নাই। শুধুমাত্র শরতের ঠাণ্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধহয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনদিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধু ধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন—আলোগুলো কি নিভিয়ে দেবো? সবাই ঘুমোচ্ছে তো আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

—শুনছেন! দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল—দিন।

—আপনার অসুবিধে হবে না তো?

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন। সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা। আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরীর মতো, রূপসী জীনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের। কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়, সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ঐ মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না। আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি।

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারে না। পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে। চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর ঘুমের ভান করলেন।

গিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দু'চারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলুনী পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসী প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নী আর ছেলে একটা সীটে দুধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে—ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

—কেন?

—ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানী শাড়িপরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনো ঐ ভাবে ছিল। খায় নি। তার নাকি খিদে নেই। মেয়েটা অদ্ভুত। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ঐ কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? নাকি, দিগিনের গুলচালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরী প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হাল্কা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরী গিন্নী ঘুমগলায় একবার বললেন—জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠাণ্ডা লাগবে।

—না। আমার মাথা ধরেছে।

—গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়! দেখিস।

—উঃ, তুমি ঘুমোও না!

—কিছু তো খেলি না। বলে চৌধুরীগিন্নী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। দিগিনের মাথা তখন আগুন। ঐ রোগা একরত্তি মেয়েটার অত

দেমাক কিসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানে না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোন পরিবর্তন নাই। শুধুমাত্র শরতের ঠাণ্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িছে নিয়েছে গলায়। আর, বোধহয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনদিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধু ধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন—আলোগুলো কি নিভিয়ে দেবো? সবাই ঘুমোচ্ছে তো আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

—শুনছেন! দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল—দিন।

—আপনার অসুবিধে হবে না তো?

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন। সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা। আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরীর মতো, রূপসী জীনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের। কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়, সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ঐ মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না! আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি।

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারে না। পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে। চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর ঘুমের ভান করলেন।

গিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দু'চারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলুনী পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসী প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নী আর ছেলে একটা সীটে দুধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে—ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

—কেন?

—ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানী শাড়িপরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনো ঐ ভাবে ছিল। খায় নি। তার নাকি খিদে নেই। মেয়েটা অদ্ভুত। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ঐ কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? নাকি, দিগিনের গুলচালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরী প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হাল্কা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরী গিন্নী ঘুমগলায় একবার বললেন—জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠাণ্ডা লাগবে।

—না। আমার মাথা ধরেছে।

—গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়! দেখিস।

—উঃ, তুমি ঘুমোও না!

—কিছু তো খেলি না। বলে চৌধুরীগিন্নী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। দিগিনের মাথা তখন আগুন। ঐ রোগা একরত্তি মেয়েটার অত

আর নরম গলা।

—আমিও না। দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাঁপুনীটা সামলালেন। বললেন—তুমি কিছু খেলে না।

—আমার খিদে পায় না।

—কেন?

—এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দূর থেকে কানে-কানে বলা। তবু কি আশ্চর্য তাঁরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

—কলকাতায় ক'দিন থাকবে?

—বেশীদিন না।

—বেড়াতে যাচ্ছো?

—হুঁ। মামার বাড়ি।

—আমি সাতদিন পরে ফিরব। তোমরা?

—একমাস।

আর কি তেমন কোনো কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল। দিগিনকে প্রায় গহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনো প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবুও এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে একমাসের নাম করে বহুকাল থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভাল ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনো হয় নি। মামারা বড়লোক। তারা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল আর ওরা আসে নি। চৌধুরীগিন্নি অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কেন জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপ্পান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের

মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব কমবে, সময়ও বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটার গেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্র্যানশিপমেন্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্রানশিপমেণ্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ গাড়ি থেকে ও গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশনমাস্টাররা ট্রানশিপমেণ্টের জন্য রেলওয়ের কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে তারা আর একরকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভাল স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশনমাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলায় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালি, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরী তাঁর মাকে মা ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরীকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরীর চেহারা এবং স্বভাব পাল্টে গেল, একটা ওপেন ডেলিভারী নিতে হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরীর মুখে চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখদুটো চকচকে, সবসময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন—চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানা-শুনো, জলপাইগুড়ির কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—রিভলভার দিয়ে কী হবে?

চৌধুরী তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন—এত টাকা? কখন কি হয়!

চৌধুরীর বাড়ির চেহারাও পাল্টেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়ী ভাবে কলকাতায় থাকে। বেশীর ভাগ জিনিসপত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরীর

বাড়ি হচ্ছে, দুটো বাড়ি, একটা বৌয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে দুটো ঘর। ভিতরের ঘরটায় সব সময়ে তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় দুটো ক্যাম্প খাটে বাপ ব্যাটা শোয়। ঝি চাকর কাউকে রাখেন নি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরী ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরীকে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর দুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরী। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরীরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরী সিক-লীভ নেবেন না, ঐ অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে কয়ে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরী। রাশি রাশি টাকা কলকাতায় পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরী এখন টাকা চিনেছেন, টাকা ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা রুগ্ন খড়ি ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে—আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরী ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগ্নেদের হাতে পায়ে ধরলেন। বোন বললেন—দাদা, আমি কী করব! ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরী ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, কদিনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেই সময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলে মেয়ে বৌ, সুখের সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত। কিন্তু ঐ বাড়ির শোকটাই সামলাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরী বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে। কিছু অভাব ছিল না, তারপর হলদিবাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালই, কিন্তু সেই বড়লোকীর একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে। তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরীব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরীব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিনতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেন্ট কথা ছিল—এমনি লস্ সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস্ সহ্য হয় না। গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন স্পোর্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে হারত সেদিন বড় মনমরা থাকত। বলত—ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই ক্ষেপাতাম। সে বড় পয়সা ভালবাসত। সবাই তাকে বলত পয়সা নিবি? অমনি সে হাত পাতে। আমিও বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম, দিতাম না। সে ক্ষেপে গিয়ে লোককে বলে বেড়াত—নেম্মলটা উচ্চড়। দে'লে, নে'লে, দে'লে, নে'লে, ফের দে'লে ফের নে'লে। নেলে তো নে'লে, আর দে'লে না।

জীবনটা ঐরকম। মাঝে মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জীপে উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ী রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রীজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নিচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনো বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দু'ধারে বালির বিছানা। বাঁ পাশের তীর ধরে ছিল রেললাইন। ছোট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঃঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

বে-খেয়ালে গরমজামা আনেন নি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়াল খুশীমতো। রমণীমোহন আর কপিলেরও গরমজামা নেই। শরৎকাল।

পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনো তাঁর কোনো কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায় নি।

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন—কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয় নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থির চোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—কালিম্পঙ যাবেন তো?

—তাই তো যাচ্ছি।

—দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।

কাজ! কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চারধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরোনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরোনো রেললাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরোনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দুমুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

ডাকলেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—ঠিকাদারের চৌকিদারী তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কি কপিল?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন—তোকে একটা বাগান বানাতে দেবো। শালবাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো!

কপিল হুঁ দিল।

—ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল.......

—মল্লিকা। কপিল বাধা দিয়ে বলল। দিগিন ভুলে গিয়েছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো ভীষণ চকচক করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমনে একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কি আছে? সে আর কিছু চায়

না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পাল্টে যাচ্ছে। চতুর, ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন—পারবি না?

—খুব।

—কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা। জীপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি লাগাবে, আর সেই সঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা, ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ী গরুর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয় গভীর উদ্ভিদজগতের নেশারু গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশে আর তিস্তার ওপারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুঁইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট জীপটা গুমগুম শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের গলার বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশী দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন। বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তাই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ঐ দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানক্ষেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ী জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পঙ ব্যতিক্রম। এইজন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রাভানুর সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পঙ নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাঁকে এইখানে দেখে গেছেন

দিগিন। ঐ শ্বেতপাথরের কেদারায় গদী পেতে বসতেন। আদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমা দেবীকে দেখেছেন। ঐ কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনো। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী!

সেই রবীন্দ্রনাথের সেন্টেনারী হয়ে গেল। সময় কত তাড়াতাড়ি যায়। বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুণি লম্বা দাড়িওলা জোববা পরা মূর্তি ধীর গম্ভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জীপে উঠলেন এসে। ডাকলেন—রমণী!

—আজ্ঞে।

—শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

—সেখানে চল। বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন—তোরা কিছু খাস নি?

রমণী মাথা চুলকে বলে—আপনারও হয় নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভাল হোটেলে তিনজন বয়স্যের মতো সমান সমানে বসে খেলেন। দিগিন সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ঐরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে। কর্মচারী, তবু কিছু বেশী। চাকর, তবু যেন অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তলিয়ে দেখেন নি দিগিন। গোলমেলে। একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জীপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে—সেই—খানে তো?

কোথায় যাওয়ার কথা তো খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারী। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসী বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা। বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে।

সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশী বলে, আর নান বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই ফরাসী সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে লেগে আছে, ত্রিশ পছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আর্শীবাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন—কোথায়?

—সেই মিসট্রেসের বাড়ি! রমণী বলে।

—কোন্ মিসট্রেস?

—যেখানে শানুবাবু আসেন!

—ওঃ। দিগিন বুঝতে পেরে বলেন—মেয়েটা মিস্ট্রেস্ বুঝি?

—না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।

দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন—শানু প্রায়ই আসে।

—সপ্তাহে দু তিনবার।

—বিধবা। তাহলে বয়স কত? বেশী?

—না। কম।

—বাচ্চা-কাচ্চা নেই?

—না। বালবিধবা।

—এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি?

—এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।

—নিখিল ব্যানার্জি! সে কে?

আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তর বাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটে নি, নয় তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দুজন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে দুজন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, দায়দায়িত্বের চাপে চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে

থাকতে থাকতেই দুজনের রোজ খিটিমিটি বাধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত—মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সে-সময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট দম্পতি। দিব্যি কথাটথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইস্‌লামিক হিস্ট্রির এম-এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুব কম। বসে খেত। বৌ চাকরি করত। বছর সাতেক ধরে ওদের দু'জনের ঝগড়া হল। প্রেম কতদূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পঙ থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামী মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

—শানু এখানে জুটল কি করে?

রমণীমোহন একটা ঢেঁকুর তুলে বলল—সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তার পরই চেনা জানা।

—কে কাকে ভজাল জানিস?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে—শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভাল। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটা একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝ বরাবর তুলে দাঁড় করাল রমণী। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

জীপ-এর শব্দ শুনে কেউ উঁকি দিয়েছিল বোধহয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নীচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনো লম্বাটে, টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে না যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উঁকি দিল। মুখে একটু হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাঁপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ্ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন—মনীষা আছে?

মেয়েটা মাথা নাড়ল—নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

—আমি শান্তি চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমন ভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহু দিনকার পুরোনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র‍্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা! ফুলদানীতে ফুল। কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনো ভাল করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাংদুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে, দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন—এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পর্দার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে আস্তে একখানা সুন্দর ফর্সা হাত পর্দাটা সরাল। রঙীন ছাপা শাড়ি পরা, ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামাল নিয়ে বললেন—নামটি কি?

—অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রূ কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি

স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দু'ধারে দু'বার ফেরাল। অর্থাৎ না।

—তোমার স্বামীর পদবী কী ছিল? দিগিন জিজ্ঞেস করলেন।

—ভট্টচার্য। ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

—তাহলে ব্যানার্জি বললে কেন? ইচ্ছে করলেই কি পদবী বদলানো যায়?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধহয় বাইশের বেশী কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো।

—কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

—ষোলো। তেমনি ক্ষীণ উত্তর।

—এখন কত বয়স?

—একুশ।

—বিয়ের কদিন পর স্বামী মারা যায়?

কাঠ-কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা একবারে করুণাভিক্ষু চোখ দুটো তুলে তাকায়। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে বলল—ছ মাস?

—কী হয়েছিল?

মেয়েটি বাঁ হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।

—ও। বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—তার কথা তোমার মনে পড়ে?

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।

—মনে পড়ে না? দিগিন প্রায় ধমকালেন।

মেয়েটি তার সজল চোখ দু'খানা তুলে তাকাল। কী মায়া থাকে চোখে! কী বিপুল ফাঁদ। দিগিনের বরফ গলতে শুরু করে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—না।

—এত অল্পবয়সে তোমার বিয়ে দিল কে? কেনই বা।

—আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর....বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না বোধহয়।

দিগিন বললেন—আমি তোমার মা বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।

—বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাই নি। কিন্তু তাঁর কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেন নি। তবু অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন—যাও, কফি করে আনো।

মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা বাড়ছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এসব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না ফুটছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেন নি।

মেয়টি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশী হলেন।

নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যে ভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন—কোথাও পালিয়ে টালিয়ে যেও না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বোলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশী মিশো না, বুঝলে?

মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুত রাতে।

বাইরে অবশ্য এখনো শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।

জীপে উঠে দিগিন আর একটা চুরুট ধরালেন। বললেন—চালা। মেহের সিংয়ের দোকানে একটু থামাস।

কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিংয়ের দোকান থেকে একটা বড় পাঁইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোটো। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জীপ দাঁড় করিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু কপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে? ছোটো পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দুজনে জীপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

কয়েকদিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটের সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামালেন দিগিন। পিছনের সীট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরানো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারের জমি সদ্য কোপানো। কয়েকদিনে দু বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কপিল। আরো দু'বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়ে ছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কপিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে.......' গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল—এখানে আনলে যে।

দিগিন ভ্রূকুটি করলেন, বললে—কেন, খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল, বলল—ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন—যাবে ওখানে?

ময়না বলল—তুমি গেলে যাবো না কেন?

—এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গম্ভীর। জ্যোৎস্না পৌঁছোয় নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল—আর যেও না।

—কেন?

—সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে দিলেন। বললেন—তুমি কপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল—যদি না আসো?

দিগিন ভ্রূ তুলে বললেন—আসব না কেন?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলে—তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনো কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—ও। বলে দিগিন ভাবলেন, বললেন—যদি না আসি তবে কপিল তোমাকে পৌঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ঐরকম। অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে। কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে। কুয়াশামাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারিদিকে ভুতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তার মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেকদিন ঘুমোন নি, বিশ্রাম নেন নি। অনেকদিন যেন আবার কোনো শক্ত কাজও করেন নি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে। প্রথমটায় ভয় হল, সাপ? ভূত? শত্রু?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

—তোমার পায়ের শব্দ পাই নি তো! বললেন দিগিন।

—তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গীতে সাকীর একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী একটি চুম্বন করলেন। কোনো কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধহয় তা বুঝল। বলল—এমন সুন্দর আদর আর হয় না। এসো,

আমিও তোমাকে একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারিদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না।

কয়েকদিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দু'খানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরা-উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা একাকীত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। ওরই পায়ের কাছে কোন দুর্জ্ঞেয় দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে অঙ্কুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ—নদীর উৎস। ওকে ঘিরে আছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকে নি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেল করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরির কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘণ্টি বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘণ্টি বাজবার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট।

—আসছি। বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন—টানতে পারবে তো লাহিড়ি?

—পারবো।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চারধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

—পারবে তো লাহিড়ি? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

লাহিড়ি হাঁফ-ধরা গলায় বলে—পারবো, পারতেই হবে।

—বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসো, আমি চালাই।

—না হে, তোমাকেও তো এরকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন—লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এরকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন—সাদা অন্ধকার! অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার।

পুন্নি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনোদিনই আর নিলেন না।

।। শেষ ।।

নয়নশ্যামা



বাস থেকে নেমেই শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল।

বাস যেখানে থেমেছে, সেখানে জাতীয় সড়কের ধারেই হাট বসেছে। ছোট হাট, তবু সেখানে ব্যাপারীর ভীড়, ক্রেতাদের আনাগোনা। মুর্গীর ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানী বসে আছে। তার পাশেই একজন বুড়ো চাষী একটা হাড়-বেড়-করা গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এটা গো-হাটা নয়। তবু বুড়ো কি ভেবে তার গরু নিয়ে এসেছে কে জানে! সেই মুর্গীর ব্যাপারী আর গরু-অলা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামী প্যাণ্ট আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে উগ্র জ্বালা, ঠোঁটে সিগারেট।

বাস থেকে প্রথমেই শ্যামা নামল, তারপর বাবা আর মা। শ্যামা নামতে নামতেই নয়নকে দেখতে পেল, ভীড়ের মধ্যেও। একপলক দেখা। বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার। পরমুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা-ঢাকা দিল ভীড়ের মধ্যে। শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা মার মুখ দেখে নিল। বাবা মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখে নি।

অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে। সব জায়গাতেই পিছু নেয়। কিন্তু এতটা আসবে, আগে ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করে নি। তার ভিতরটায় এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দটা ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভিতরটা হঠাৎ পোড়ো বাড়ির মতো ভয় ভয় ভাবে ছেয়ে গেল। ভয়টা নয়নের জন্যে। যদি বাবা মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কী যে হবে!

হেমন্তকাল। কলকাতায় এসময়ে শীত নেই। দুপুরে এখন পাখা চলে। তাই শ্যামা গরম জামা কিছু আনে নি। কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল। উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে। ভিতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার। ভয়ে, শীতে।

কাঁধের শালটা বাবা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে বলল—বলি নি তোমাকে মফঃস্বলে এসময়েই শীত পড়ে যায়।

—তাই তো দেখছি। ভর দুপুরেও বেশ বাতাস! এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয়।

বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে—তুই তো কিছু আনলি না। ফেরার সময়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবি। একেই পাকা টনসিল তোর, আমার শালটা নে বরং।

—আমার তো গরম লাগছে।

বাবা একটু হাসে—ওসব কম বয়সের কথা। গরম নেই।

মা বলল—আঁচলটা জড়িয়ে নে গলায়।

শ্যামা তাই নেয়। তার শীত করছে ঠিকই। একটু আগে বাসে গাদাই ভীড়ে বসে সে ঘামছিল। মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো। এখন খোলা বাতাস বলে, নাকি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে, কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

—এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি।

বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে। ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা। বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে—ফ্রেশ ডিম-টিম, মুর্গী, শাকপাতা পাওয়া যায়, ফুলকপি-টপিও উঠেছে বোধ হয়। ফেরার সময়ে যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে।

—থলে টলে তো আন নি। মা বলে।

—রুমাল আছে, শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড় সড়—

শ্যামা এতক্ষণে একটু হাসে,—আমার ব্যাগে শাকপাতা ঢোকাবে নাকি?

—শাকপাতা না হোক, ডজনখানেক ডিম এঁটে যাবে। আঁটবে না?

—যদি ডিম ভাঙে তো ব্যাগের দফা শেষ। তখন আর একটা কিনে দেবে তো?

অফিস থেকে রিটায়ারমেন্টের সময়ে ফেয়ারওয়েলে পাওয়া চমৎকার বেনারসী লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে—ওরে ভাবিস না, হাট যখন একটা থলেও ওখানে কিনতে পাওয়া যাবে।

—বাবা, সব জায়গায় তোমার কেবল খাই-খাই।

বাবা একটু হাসে, বলে—খেতে আর তোরা দিস্ কোথায়! নুন

বারণ, ঝাল বারণ, ফ্যাট বারণ, এত সব বারণে আর খাওয়ার থাকে কি?

—ব্লাডপ্রেসার দুশোর কাছাকাছি ওঠে কেন? তুমি প্রেসার ঠিক রাখ আমরা সব বারণ তুলে নেব।

—আর কমেছে। এটাই শেষ রোগ। একটা তো হয়ে গেছে, আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাওনা।

শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে। চোখ ছল্ ছল্ করে। মা ধমক দিয়ে বলে—সবসময়ে তোমার আকথা কুকথা। যে কোন ভাল কথার মাঝখানেও তুমি কেবল তোমার রোগ-ভোগের কথা তুলে ফেল। ওটা ভাল নয়।

জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই ঝক্‌ঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল। নিচে ছোট্ট একটা নদী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। পোল পেরোলেই বাঁ ধারে একটা বিরাট আমবাগান। জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তা নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশা কাটা সুন্দর লাঠিগাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে রাস্তা। এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে।

শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে। জল বড় পরিষ্কার। সেই জলে তার ছায়া পড়ে। চারটে নৌকা পাড়ে বাঁধা। জলের নিচে মাছের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা যায় না। কয়েকটা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চালাঘরের নিচে দোকানে দোকানে মানুষ। রঙচঙে জামাকাপড় ঝুলছে এধার ওধার। হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যান্ট পরা নয়ন কোথাও নেই। শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে শুনতে পায় মা বলছে—রাস্তা তুমি ভারী চেন কি না।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে—চেনার কি? এসব গাঁ-গঞ্জ জায়গা, কলকাতার গোলকধাঁধা তো নয়! বাসে তিনজনকে জিজ্ঞেস করে সিওর হয়ে নিয়েছি।

—তা হোক। তবু এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও। সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে, মনে নেই! বুড়ো বয়সে কী কাণ্ড।

—আরে, সে তো কানাওলায় ধরেছিল বলে। নিজের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না। কানাওলা হচ্ছে একরকমের

স্পিরিট।

—তা হোক, তবু জেনেশুনে রাস্তায় নামা ভাল।

হাতে একটা ছোট্ট শোলমাছ নিয়ে এক গেঁয়ো হাটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে—মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির রাস্তা তো ঐটে, না?

—ঐটেই। আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যান। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো! এখান থেকে মাইলখানেক।

—আপনিও ওদিকে যাবেন নাকি?

—না। আমি যাব বামুনগাছি। সোজা কোশখানেক গিয়ে ডানহাতি?

—ঐ দিকটায় লোক চলাচল নেই?

—আছে, তবে কম। মোনা ঠাকুরের জন্যেই আজকাল লোকজন যায়। হাট ফুরোলে কিছু লোক ফিরবে। কিন্তু একা হলেও ভয় নেই। রাস্তা নিরাপদ।

—সাপখোপ?

লোকটা একটু হাসে—দিনের আলো রয়েছে, ভয় কি। লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন। সাড়া পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মানুষকে সবাই ডরায়। চলে যান, ভয় নেই।

শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা খিঁচ ধরে রইল। নয়ন খামোকা এতদূর আসে নি। এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে। ও এখন মরীয়া। ওর প্রাণের ভয় নেই।

বাবা একবার গলা খাঁকারি দিয়ে লাঠিটা বারকয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল। বলল—চল।

রড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল। তারপরই আমবাগানে ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক, ওপারের হাট, নয়ন। গো-গাড়ির চাকায় রাস্তা এমন ভাবে ভেঙে দু'ধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আপনা থেকেই তারা আগুপিছু হয়ে গেল। সামনে বাবা, তারপর মা, সবশেষে শ্যামা।

বাবা হাতঘড়ি দেখে বলল—মোটে পৌনে দুটো। আমরা আস্তে হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা তিনেকের বেশী লাগবে না। সন্ধ্যের আগেই বাস ধরতে হবে।

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে—মঠে মন্দিরে যাওয়ার সময়ে অত ফেরার

তাড়া থাকলে হয় না। তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছ আজকাল।

বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল—তা নয়। আসলে দিনকাল তো ভাল না, তোমাদের গায়ে সোনার গয়না-টয়না রয়েছে।

—লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই।

—ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয়? বলে দিল ভয় নেই, তা বলেই কি ভয় নেই? দেশে আনএমপ্লয়মেন্ট, খরা, বন্যা চারদিকে উপোসী অভাবী লোক। এ সময়ে চোর, গুণ্ডা, বদমাশ দেশে বাড়েই।

তারের যন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেজে যাচ্ছে। শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। শ্যামার বুক কাঁপছে। একটা পাখির শিস্ কানে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা। নয়ন নানারকমের শিস্ দিতে পারে।

বাবা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে— কি ঠাণ্ডা সুন্দর নির্জন জায়গা এসব। কলকাতায় আমরা যে কি নরকে থাকি। শব্দ আর শব্দ।

মা বলে—গাঁ-গঞ্জ তো ঠাণ্ডা হবেই।

বাবা আবার হাঁটতে হাঁটতে উদাস গলায় বলে—কলকাতার জমিটা বেচে দিয়ে এসব দিকে চলে এলে কেমন হয়। ফ্রেশ বাতাস, ভাল তরিতরকারী, ডিম-দুধ-মাছ—

মা বলে—ও তোমাদের মুখের কথা। কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে। সেবার দেওঘরে গিয়ে একমাসও থাকি নি, তুমি কি হুড়োহুড়ি শুরু করলে—এখানে সিগারেটের টোবাকো পাওয়া যায় না, এ নেই, সে নেই—কুড়ি দিনের মাথায় ফিরে আসতে হল তোমার জন্যেই তো! তুমি আবার থাকবে গাঁয়ে।

বাবা হাসে, বলে—সে অবশ্য ঠিক। এক সময়ে যখন মফঃস্বলে চাকরী করতাম তখন কলকাতার নামে ভয় ভয় করত। তারপর কলকাতায় একটা বড় সময়ে থেকে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলোয় এমন অভ্যাস হয়ে গেল, আর কোথাও সেই আরামটা পাই না। ধর গ্রীষ্মকালে যদি কখনও ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে, কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি—সে কেবল ওখানেই পাবে। অন্য কোথাও—

শ্যামা হাসে—বাবা, আবার?

চারদিকে গভীর অরণ্য-ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিস্টা

শোনা যায়। পাখির ডাকের মত, কিন্তু পাখির ডাক কিনা, তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

রাস্তার ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে রোদ এসে পড়েছে। দুলছে আলো-ছায়া, দোলে রহস্য। বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে। কে জানে সেইসব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কিনা। পিছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামা। সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খায়।

—সাবধানে আয়। মা হাত বাড়িয়ে বলে।

—ঠিক আছে মা।

—কদ্‌বেলের গন্ধ পাচ্ছ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

মা বাতাস শুঁকে বলে—কি একটা গন্ধ যেন চাম্‌সে মতন।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে—বাঁদরলাঠি, সেই যে লম্বা লম্বা, সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

বুনো কুলের ঝোপ পেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায় —এই কুল দেখ, বড় পুঁতির মত হয়, পাকলে ভারী মিষ্টি, মাণিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি।

বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার, সতেজ, বাতাসে বন্য গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা মিষ্টি গন্ধটি। ছায়ায় কেমন শীত শীত করে। শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায়! ভীতু খরগোশের মত চারদিকে চায়। টুপ টুপ পাতা এসে পড়েছে গাছ থেকে। জলের ফোঁটার মত টুক্ করে একটু শব্দ হয় কি হয় না। এই ছায়াটি, এই নির্জনতা, এই অচেনা জায়গার সৌন্দর্য কী নিবিড় সুন্দর বলে মনে হত হেমন্তের এই গড়ানে দুপুরে। শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যান্টটা না ছায়া ফেলত।

আগাছা রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে, তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায়। জোরে হাঁটা বাবার বহুকালের অভ্যাস। স্বভাবতই বাবা এগিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মার জন্য। আগু-পিছু তারা চলে।

—তোমার ইচ্ছের জন্যই আসা। কিন্তু আমার মন বলে, তন্ত্রে মন্ত্রে কিছু হবে না। বাবা উদাস গলায় বলে।

মা চুপ করে থাকে। তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

শ্যামা স্তিমিত, নরম গলায় বলে—মোনা ঠাকুরের খুব নাম-ডাক।

—শুনেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গরু। বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময়ে থম্ ধরে থাকে। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে কত কী হয়ে যায় মানুষের, তার ওপর পাগল মানুষ। বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

মার পা ধীর হয়ে আসে। তারপর একটু ধরা গলায় বলে—যা হবার তা হয়েছে তুমিও তো আর জ্যোতিষ নও।

—সন্ন্যাসী-ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হল না।

—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব। আমরা চোখ বুজলে তখন তার যা হওয়ার হোক।

বাবা মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে।

বে-ফাঁস কথা। এ কথাটা মা কোনদিন সহ্য করতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁফাতে থাকে। তীব্র স্বরে বলে—তোমার কেবল ঐ কথা। কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন তোমাকেও ঘুরতে হবে। আমাকেও। মার কাছে ছেলে যে কী তা কোনদিন বাবা বুঝতে পারে না।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে—আমি তো ঘুরিই। ঘুরি না? বল!

আবার তারা হাঁটতে থাকে। আগু-পিছু হয়ে। অচেনা পাখিরা ডাকে। গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে। ঠাণ্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে। চারদিকে রহস্যময় আলো-আঁধারি। এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষ্যে নয়নও চলেছে সঙ্গ দিয়ে। হয়তো পাখি হয়ে। হয়তো গাছের ছায়া হয়ে। শ্যামার বড় ভয় করে।

এখানকার তাড়িটা ভালই। নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয়। এখন ঠিক এই সময়ে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। অনেক কাল নেশা-ভাঙ করে নি সে। ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে, ভর দুপুরে এমন শীত করবে! নেশাটা সেই জন্যই করা। তবু, যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয় নি।

তাড়িটা কিন্তু ভালই। খারাপ কিছু মেশায় নি। পরিষ্কার গন্ধ, চন্‌চনে

স্বাদ। শীত ভাবটা কেটে গেল। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল—তোমাদের এখানে এত শীত কেন হে?

—শীত হয় না এ সময়ে। ক'দিন বৃষ্টি গেল পরের পর। আজ দু'দিন টেনে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি। তাড়িওয়ালা যুবকটি বলল।

একটু আগে শ্যামা তার মা বাবার সঙ্গে নেমেছে। কোথায় যাবে তা নয়ন জানে। তাই পিছু নেয় নি, হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে। সেইটে দিয়ে পেরিয়ে নয়ন সর্টকাট্-এ আমবাগানের গহীন জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। তাড়া নেই। ওরা যে জোরে হাঁটবে না—এ তো জানা কথা।

নয়ন হাই তুলে জিজ্ঞেস করে—চাষবাস কর?

—আজ্ঞে না। বাবা করে একটু আধটু, বছরের চালটা উঠে আসে। আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে।

—তালগাছ কটা?

—অনেক। ঐটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে হাসে তাড়িওয়ালা।

—ঝাণ্ডাওলারা গাঁয়ে আসে না?

—আসে।

—কোন্ ঝাণ্ডা বেশী আসে?

—সব রকমই। সব্বাই ভাল ভাল কথা বলে।

—তোমরা কোন্ ঝাণ্ডার দলের?

—সে কি বলা যায়? আমরা এখন চালাক হয়ে গেছি!

—ভোট টোট দাও?

—দিই মাঝে মাঝে।

নয়ন হাসে। বলে—খুব চালাক হয়ে গেছ তোমরা। ফসল টসল কেমন হয়?

—হয়। এদিকটায় বৃষ্টি বেশ। আমনের ফসল ভাল এবার।

—ফসল রাখতে পার? কেটে নিয়ে যায় না?

—নেয়, আবার রাখিও। যে যেমন পারে।

নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়। নয়ন হেসে বলে—তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ।

চন্‌চনে খিদে পেয়েছে। নয়ন মাটিতে বসে ছিল, এবার উঠল। উঠতেই টের পেল প্যাণ্টের পিছন দিকটা ভেজা-ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব।

মাটির ভিতরে চোরা জল। রসস্থ মাটি। নয়ন কয়েক পা জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে।

পাশেই তেলেভাজার দোকান। সেখানে বেশ ভীড়। গন্ধটাও ছেড়েছে ভাল। কিন্তু যে লোকটা ভাজছে তার কব্জির কাছে একটা শ্বেতীর মত দাগ দেখে নয়ন আর তেলেভাজা কিনল না। তিনটে কাঁচা মুরগীর ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু কাপ চা খেল পর পর। তারপর বাচ্চা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল—সেদ্ধ করে দে।

ছেলেটা একপলক নয়নের চোখে চোখ রাখল। তারপর চায়ের কেটলির পাশেই উনুনের উপর একটা মগে সেদ্ধ চাপিয়ে দিল।

তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিস্বাদে ভরে গেল নয়নের মুখ। নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পানসে। কোনক্রমে আঁশটে গন্ধের দলাটা গিলে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল তাড়িওলার কাছে।

—আর এক ভাঁড়।

তাড়িওলা ভাঁড় হাতে দিয়ে বলে—নির্ভয়ে খান। এর নেশা খুব পাতলা। বাবু, আপনার কোন্ ঝাণ্ডা?

নয়ন ভাঁড় মুখে দিয়ে কুলকুচো করে মুখের বিস্বাদ তাড়িয়ে বলে—জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু!

লোকটা হেসে বলে—ওরে ব্বাস্ রে। কলকাতার বাবু আপনারা, ধমক দিলে হেগে মুতে ফেলি।

—খুব চালাক, না? আমার ঝাণ্ডা লাল, বুঝলে? তবে লালটা অনেকটা রক্তের মত, অন্য সব ঝাণ্ডার সঙ্গে মেলে না। আমার নিজের ঝাণ্ডার রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই।

লোকটা হেঁয়ালি শুনে চেয়ে থাকে।

নয়ন দাঁড়ায় না। এবার রওনা হওয়া উচিত। শ্যামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নয়ন হাঁটতে থাকে। দু পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে। নয়ন গ্রাহ্য করে না। লম্বা পায়ে হাটটা পেরিয়ে সে একটা টিবির ওপর উঠে আসে। দক্ষিণে সাঁকো, সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন। এগিয়ে বাঁশঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে। নয়ন হাঁটতে থাকে। হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু-হু করে একটা কোকিল ক্ষণেক ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। নয়ন টিবির উৎরাইটা দৌড়ে নামতে নামতে অবিকল কোকিলের ডাকটা ডাকতে

থাকে। কুহু-কুহু-কুহু-কুহু.....

শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ ক্লান্তি নেই। সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন চার ঘণ্টা আগে। নয়নের হাতে ঘড়ি নেই। থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত। ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পরে নি নয়ন। যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না। তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড, অনন্ত সময়। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কতদূর যেতে হবে তার কোন ঠিক থাকে না। তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। যখন নয়ন এখানে এসেছে তখন হাটটা ভাল করে জমে নি। ব্যাপারীরা আসছে সবে, চত্বরটায় তখনও বিশৃঙ্খলা। জিনিসপত্রের টাল জমছে, চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আঁচ পড়ে নি। গত তিন-চার ঘণ্টা ধরে নয়ন হাটটাকে জমে উঠতে দেখেছে।

কিংবা বলা যায় নয়ন কিছুই দেখে নি। তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভীড় জমিয়েছে—এটুকুই মাত্র সে টের পেয়েছে। শ্যামা যতক্ষণ আসে নি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোন সৌন্দর্য ছিল না, তাৎপর্য নয়। ততক্ষণ সে অদূরে তাড়ির কলসীটাও লক্ষ্য করে নি। শ্যামাকে বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময়ে সে গিয়ে প্রায় তাড়িওয়ালার গায়ে হোঁচট খেল। তখনই টের পেল। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, এ জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ।

বাঁশ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ের রাস্তাটা ঘুরে গেছে। ঝরা বাঁশপাতায় পুরু গালচের মত হয়ে গেছে রাস্তা, পা রাখলে নরম লাগে। আরও দু'বার কোকিলের ডাক ডাকল নয়ন।

বাঁশ-ঝাড়টা পেরলেই দেখা যায় শ্মশান। চাতালটা খাঁ খাঁ করছে। গত রাতে কারা মড়া পুড়িয়ে গেছে, কালো আংরার দাগ ছড়িয়ে আছে, ইতস্তত কাঠকয়লা। ওদের ঘর অনতিদূরে। খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সী মেয়েছেলে নিজের রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে।

—এ ধারে নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে না? নয়ন তাকে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে একপলক দেখে নিয়ে বলে—সে তো ভেঙে গেছে প্রায়। আরো দক্ষিণে।

—পেরোন যাবে না?

মেয়েছেলেটা উদাস গলায় বলে—কে জানে! লোকে তো এখনও পার হয়।

গত তিন চার ঘণ্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করছে নয়ন। কিছু খায় নি। চন্‌চনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ধরেছে ভাল। গা জ্বালা করছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভিতরের গেঞ্জি। গলা বুক শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মত ব্যাপার নয়। খিদে-তেষ্টা, শীত-গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে! চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন। কেবল নয়ন থাকে, থাকে শ্যামা।

নয়ন জানে, শ্যামা তাকে দেখেছে। দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে সে। ঐ আমবাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কি করবে? সেবার পিকনিক গার্ডেনসে তার কলেজের বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখনও এইরকম ভাবে দেখা হয়েছিল। শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করে নি। যদি ইচ্ছে করত শ্যামা, যদি নয়নের সেই পিছু-নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেইসব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে। কিন্তু শ্যামা অতটা করে নি। শ্যামা সে রকম মেয়ে নয়। নিষ্ঠুরতা তার স্বভাবে নেই। আবার শ্যামার মত নিষ্ঠুরও হয় না।

বাঁশঝাড়, কাঁটাঝোপ, বন-করমচার ভিতর দিয়ে উঁচু নিচু পায়ের রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গুলে জায়গা, ঘরবাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে আবাদ দেখা যায় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। সিকি মাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল। চারদিকে হেমন্তের পাতা ঝরা গাছ। নির্জন শীতলতা। সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে। জলে ছায়া দেখছে নিজের। কাছে গিয়ে নয়ন দেখে, পা রাখার জন্য একটি মাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে, আর দু ধারে ধরার বাঁশ নেই। পার হওয়া বেশ শক্ত। কিন্তু ওপাড়ে শ্যামা আছে, নয়নের কিছুই তেমন শক্ত মনে হয় না।

বার বার পা পিছলে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল, তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিকই পার হয়ে গেল নয়ন। তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তারপর কেবল পাখির ডাক, আর ঝিঁঝির শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ। আগাছা, ঝোপ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়।

পায়ে-হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে।

পাখির ডাক নকল করতে করতে নয়ন হাঁটে। যত বিচিত্র ডাক শোনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে। ভর-দুপুরে খিদে পেটে তাড়িটা গেঁজে উঠছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী ভারী, শরীরের ভিতরটা ঘুম-ঘুম। হাই উঠছে। কোন গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসাড়ে কেটে যাবে! কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না। সে এগোচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পূবে। শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে। রাস্তায় তাদের দেখা হবে। এখন এই আমবাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে। নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিছুদূর গিয়েই নয়ন ভগ্নস্তূপটা দেখতে পায়। বিশাল বাড়ি ছিল কোনকালে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বাড়িটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইঁটের ভিতর থেকে, মেঝে থেকে বড় বড় গাছ উঠেছে। চারদিকেই ছড়ান ইঁট—পুরোনো শ্যাওলায় কালো। পায়ে-হাঁটা পথটা ভগ্নস্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন। গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংসস্তূপটার ভিতরে উঠে যেতে থাকে।

যেখানে ইঁট সেখানেই সাপ। পুরোনো বাড়ি, ইটের খাঁজ, এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা। নয়ন তা জানে, তবু সাপের কথা তার মনেই আসে না। আকীর্ণ শ্যাওলায় পিছল ইঁটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায়। ঐ বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখা যাবে শ্যামাকেও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবে নয়ন। বিপদ-আপদের কথা তার মনেও থাকে না।

ওরা আসছে ঘুর রাস্তায়, আস্তে হেঁটে। নয়ন এসেছে চোরা পথে, অনেক তাড়াতাড়ি। তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় শ্যামা জায়গাটা পেরিয়ে যায় নি তো! তাড়ির ঘোরে তার হয়তো সময় জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। সে হয়তো খুব আস্তে হেঁটেছে।

মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পুরু দেয়াল। এখন কোথাও কোথাও দেয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায়। থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ। একটা লোহার বরগা আড়াআড়ি মাথার ওপর রয়ে

গেছে আজও। আগাছা ভেদ করে নয়ন ক্রমে বাড়ির ভিতের ওপর উঠে আসে। চারিদিকে রহস্যময় ফাটল, ভিতের ভিতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার। চারদিকেই কাঁকড়া বিছেদের আস্তানা। একটা পিপাসা, একটা শিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান। বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করে, চোখ জ্বলে, ঠোঁট শুকিয়ে আসে, জ্বর জ্বর লাগে শরীর। তাড়িটা না খেলেই পারত সে। শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে। খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা। ঘুম পায়।

নয়ন জানলা দরজাহীন দেয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে এদিকে ওদিকে একটু ঘুরে দেখে। চারদিকে স্তূপ হয়ে ইঁট, বালি আর রাবিশ পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায়। একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়। একটু বসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বসে না। হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে। তার মনে হয়, ভর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থামটা একটু দুলে উঠল। সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায়। তারপর হাসে। ভয়টা কেটে যায়। হয়তো তাড়ির নেশায় ভুল বুঝেছে ভেবে আবার থামটার গায়ে ভর রাখে, আবার মনে হয়—থামটা দুলে উঠল। কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন। ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। ভাঙা চোরা রাস্তার দু ধারে গরুর গাড়ির চাকার গভীর খাদ, সেই খাদে কাদা জমে আছে। সারা বছর ওই কাদা কমই শুকোয়। চারদিকে পাখি ডাকে। কেবল পাখি ডাকে। অন্যমনে বে খেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে। প্রথমে দোয়েলের মত, তারপর কুবো পাখির শব্দ করে, তারপর কোকিলের মত ডাকে।

তারপর ক্লান্তি লাগে। হরবোলা হয়ে থেকে কোন লাভ নেই। চাই নিজস্ব একটি শব্দ, নিজস্ব ডাক। নিজের শব্দটা কোনদিনই খুঁজে পায় না নয়ন। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। ক্লান্তি লাগে, তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে। প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে। পাখ পাখালীর বিচিত্র ডাক, চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না, বেড়ালের বিবাদ, ইঞ্জিনের হুইশ্‌ল, কিংবা এরকম অনেক কিছু। কিন্তু হরবোলা হয়ে থাকার ক্লান্তি বড় ভীষণ। সে তো ওইসব শব্দের কোনটারই মূল উৎস নয়! সে পাখি নয়, শেয়াল কুকুর বা রেল ইঞ্জিনও নয়। সে নয়ন রায়। তার নিজস্ব শব্দ কোন্‌টা? কোথায় তার নিজের ডাক? যে ডাক শুনলে শ্যামা

সাড়া দেবে?

দূর থেকে একটা মেয়েলী গলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল নয়ন। উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার গায়ে দিল কাঁটা। একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয়। বোধহয় একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে ডেকে কিছু বলল, একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল। ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে। গাঁ-গঞ্জের লোকেরাই হবে। নয়ন গা করল না। হাত বাড়িয়ে বুক-সমান আগাছার জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবোতে লাগল। তিতকুটে স্বাদ, গন্ধও বিচ্ছিরি। কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে। অন্যমনে ডালটা চিবোতে থাকে।

—কোন সুখই কখনও পরিপূর্ণ নয়, বুঝলে! আমাকেই দেখ, চিরকাল ভাল চাকরি করেছি, পয়সা যথেষ্ট পেয়েছি। ছেলেমেয়ের দিক থেকেও সুখীই ছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়ে—সুস্থ সবল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল—

—তুমি রাস্তা দেখে চল। হোঁচট খাচ্ছ।

বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বারকয়েক ঠোকে। তারপর একটা হু-উম' শব্দ করে আপনমনেই বলে—কোন সুখই চিরস্থায়ী নয়।

অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায়। পরমুহূর্তেই একটা কোকিল হু হু করে ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে—শেয়াল ডাকছে।

মা বলে—তাতে কি। এইসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই।

বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে—সে কথা বলছি না। দিনের বেলা শেয়াল বড় একটা ডাকে না।

—তোমার বাপু বড় ভয়।

বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলে—কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন?

—তাতেই বা কি?

—কিছু না।

শ্যামার বুকটা খামচে ধরে এক ভয়। শেয়ালের ডাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে, তা শুনলে কারও অন্যরকম সন্দেহই হবে না। কিন্তু এ

ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে দেওয়া। নয়ন কি তাই করছে? কোকিলের ডাক ডেকেই সে চুপ করে গেল কেন? সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে এখানে আছে, অদূরে?

হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে। যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমত না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে। বুঝলে কী হবে তা শ্যামা ভেবে পায় না।

একটা বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারী লাঠিগাছ তুলে হেঁকে বলল—ঐ দেখ, কোন রাজারাজড়ার বাড়ির ধ্বংশাবশেষ। কি বিরাট বাড়ি ছিল, অ্যাঁ!

—দেখছি।

শ্যামাও দেখল। বাঁ ধারে, রাস্তা থেকে খুব দূরে নয়, কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি। তাতে অশ্বত্থ, বট, আগাছার জঙ্গল। কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে—বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল। পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার। সে কোথাও কাউকে দেখে নি, কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিত ভাবে তার মনে হল, নয়ন ঐখানে আছে। ওই থামটার আড়ালে। ওইখান থেকেই সে শ্যামাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ মেশান শেয়ালের ডাক ডেকেছিল, কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল। থামটা কি নড়ল সত্যিই? যা পুরোনো বাড়ি নড়তেও পারে। যদি থামটা ভেঙে পড়ে এখন, যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন, তবে কি শ্যামা দুঃখ পাবে! ঠিক বুঝতে পারে না শ্যামা।

অনেক নীল আর বেগ্নে বুনো ফুল ফুটে আছে।

—মা, আমি কয়েকটা ফুল তুলি। কি সুন্দর ফুল! শ্যামা বলে।

—এসব জঙ্গলে সাপখোপ আছে।

—কিছু হবে না। কয়েকটা তুলব।

মা বাবা দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দাদার কথা উঠলেই তাদের এরকম হয়।

—আমরা দাঁড়াই, তুই তোল। মা বলে।

শ্যামা মাথা নাড়ে—দাঁড়াবে কেন? তোমরা এগোও না। যা আস্তে হাঁট তোমরা, আমি ঠিক পা চালিয়ে ধরে ফেলব।

—দেরি করিস্ না কিন্তু! এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে

বাবা আর মা হাঁটতে থাকে। দুজনে এখন দাদার কথা বলবে, শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর।

শ্যামা তাই চায়। তার ধারণা, ওই পুরোনো ভেঙে পড়া বাড়ির কোন ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে। কোন যাদুবলে নয়ন ঠিক তাদের আগে আগে এসেছে, অপেক্ষা করছে। এটা ভাল নয়। শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায়। এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনক ভাবে পিছু নিয়েছে নয়ন? ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে। গত মাসেও একবার বাবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে—ফিরে যাও। শ্যামা তাই বাবা মাকে এগিয়ে দিতে চায়। এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক নয়ন। শ্যামা মুখোমুখি হবে।

বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দূর থেকে। শ্যামা একটু অপেক্ষা করে রাস্তা ছেড়ে বুনো ঝোপগুলোর কাছে এসে দু একটা ফুল তুলল অন্যমনস্ক ভাবে। ফুলের প্রতি তার তেমন কোন মোহ নেই। গন্ধহীন এইসব বুনো ফুল দিয়ে কী করবে শ্যামা।

শ্যামা কেবল বার বার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকায় আর অপেক্ষা করে। নয়ন সমস্ত ব্যাপারটাই দেখেছে। দেখেছে শ্যামার মা বাবা এগিয়ে গেল শ্যামাকে একা রেখে। দেখেছে, শ্যামা এখন একা। এরকম সুযোগ নয়ন ছাড়বে না নিশ্চয়ই?

কিন্তু অপেক্ষা করে লাভ হল না—সমস্ত বনভূমি নির্জন। কোথাও নয়নের সাড়াশব্দ নেই। তবে কি সত্যিকারের শেয়ালই ওরকম ডেকেছিল। নয়ন নয়? শ্যামা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। বনভূমির কোন গভীর থেকে দুটো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় শ্যামা। কে যেন কাকে ডাকছে। চারদিকে নির্জন, গভীর ছায়া, শ্যামার গা ছম ছম করে। বাতাস দেয়, শীত করে শ্যামার। একটু পিপাসা, জ্বরভাব, একটু ভয়—এইসব মিলে এমন সুন্দর ছায়ায় ঢাকা দুপুরটা অস্বস্তিকর লাগে শ্যামার কাছে।

অনেকটা জমি ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকটা বুনো ফুল আর কাঁটাঝোপ ছাড়া বাড়িটার সামনের জমিতে কিছু নেই। চারদিকে একসময়ে উঁচু-ঘেরপাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিল ভেঙে পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুধু কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ইঁটের গাঁথনি দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখার

জন্য শ্যামা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ডাকল নয়ন! নয়ন......

কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু একটু দূর থেকে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শোনা গেল। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই। নয়ন সব ডাকই হুবহু ডাকতে পারে। যখন ডাকে তখন নয়ন সত্যি সত্যিই পাখি হয়ে যায়, কিংবা জীবজন্তু। মানুষ থাকে না। নয়নের ওই রহস্যময়তা মাঝে মাঝে শ্যামার বুকে ভয় হয়ে থাবা গেড়ে বসে।

চারদিক আকীর্ণ পুরোনো বাড়িটার ভেঙে-পড়া ইঁট, কাঠ আর আবর্জনার ভিতরে শ্যামা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। ছায়া দোলে, একটা পাথরের ফোয়ারার চারধারে গোল জলাধার দেখা যায়। জল নেই, গাছ গজিয়েছে। ফোয়ারার মুখ কাৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার পাশেই একটা গোলাপ গাছ। একটা লাল গোলাপ ফুটে আছে একা। শ্যামা একটু এগিয়ে গোলাপটা তুলে নিল। তারপর ফিরে এল রাস্তায়। আপাদ-মস্তক শিউরে উঠে দেখল, নয়ন তার মুখোমুখি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসি। কোমরে হাত।

ধক্ ধক্ করে শ্যামার বুকের ভিতরটা নড়ে গেল। সে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। হলুদ জামা আর পাকা জলপাই-রঙের প্যাণ্ট পরা নয়নকে তেমন কিছু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। নয়নের উচ্চতা স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখখানা একটু ভাঙাচোরা হলেও কমবয়সের লাবণ্য আছে! গালের দাড়ি এখনও নরম। গোঁফ জোড়া ছাঁটে নি বলে অনেক বড় হয়ে গাল পর্যন্ত পৌঁছেছে। গায়ের রঙ না-ফর্সা, না-কালো। একনজরে দেখলে নয়নের ভিতরে দেখবার কিছু নেই। ঘেন্না বা উপেক্ষারও কিছু নেই। বড় বড় চুলে ঘেরা মুখখানায় কেবল চোখজোড়াই যা একটু অন্যরকম। শ্যামার দাদার অনেকটা এরকম চোখ ছিল। নয়নের চোখজোড়া খুব নিষ্ঠুর। তাতে সহজে পলক পড়ে না। চোখের তারায় একটু কটা ভাব। মণির মাঝখানে দুটো ছ্যাদা দূর থেকেও দেখা যায়। শ্যামার দাদা বিবেকানন্দর ভক্ত ছিল। খুব ধর্মের বই পড়ত। একা একা ধ্যান করত অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে। সাদা দেয়ালে একটা ছোট্ট ফোঁটা বা চিহ্ন দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কলিযুগেও মানুষ ইচ্ছে করলে তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারে। দাদা একবার চেষ্টা করেছিল তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার। একদিন সেই চেষ্টায় সকাল থেকে ঘরে খিল দিয়ে বসল, বহু ডাকাডাকিতেও সাড়া দিল না, দরজা খুলল না। দ্বিতীয়

দিনও না। সেদিন পাড়ার লোক জড় হয়ে গেল বাড়িতে, মা কাঁদতে শুরু করে, বাবা অফিসের কাজে বাইরে মফঃস্বলে গিয়েছিল, ফিরে এসে ভয়ঙ্কর রাগারাগি শুরু করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দরজা ভেঙে যখন দাদাকে বের করা হয় তখন তার চোখ ঘোলাটে লাল, মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে, ভুল বকছে। সেই ভুল বকা চলতেই থাকল। বড় ডাক্তার দেখে বলল—পাগলামী শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, আপনারা টের পান নি। অনেক পাগল এরকম থাকে, বোঝা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। যখন বাড়িতে একমাত্র ছেলের জন্য উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সকলের খাওয়া ঘুম ছুটে যাচ্ছে, তখন অনাধারে পাড়ার ছেলেরা দাদাকে দেখতে পেলেই 'ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চীৎকার করে ক্ষ্যাপাত। ব্রহ্মজ্ঞানী শব্দটা শুনলেই চনমন্ করত দাদা, বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাতো। অবিরল কথা বলতে থাকত। অর্থহীন কথা। বোঝা যেত, সে যা বলতে চায় তা বাক্য হয়ে বেরোচ্ছে না। কিন্তু সে একটা বিশেষ কথা বলতে চায়। তার কিছু বলার আছে। সেই সময়ে দাদার চোখ ছিল অনেকটা নয়নেরই মত। শ্যামার মাঝে মাঝে নয়নকে ডাক্তারের সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে করে— তোমার পাগলামীর শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, তা বুঝতে পারছ না নয়ন। কিন্তু তা বলে না শ্যামা। বললে নয়ন বুঝি সত্যিকারের পাগলই হয়ে যাবে।

নয়ন দু পা এগিয়ে এসে বলে—কার জন্য গোলাপ?

শ্যামা কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলে—তুমি কেন এসেছ নয়ন?

—আগে বল গোলাপ কার জন্য?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে—নয়ন, তোমাকে দেখলে বাবা কি রকম ক্ষেপে যায় জান তো! গত মাসেও একবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনা বাবার পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে কতবার বলেছি!

নয়ন তার অকপট মুখে হেসে বলে—যখন গোলাপটা তুলছিলে তখন কার কথা তোমার মনে পড়েছিল শ্যামা?

—আমার বাবার জন্য তোমার কোন সিমপ্যাথি নেই। শ্যামা রেগে গিয়ে বলে—কোনদিন তুমি অন্যের কথা ভাব না। তুমি খুব বাজে হয়ে গেছ, দিন দিন আরো বাজে হয়ে যাচ্ছ।

কপালের ওপর এসে-পড়া ঝুরো চুলের একটা গুচ্ছি টেনে নিয়ে

আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে গম্ভীর হয়ে নয়ন বলে—আমি কেবল গোলাপটার কথা জানতে চাইছি শ্যামা। কার জন্য ওটা তুলেছ?

—তুমি ফিরে যাও।

—শ্যামা, তোমার বাবা আমাকে দেখতে পাবে না, ভয় নেই। আমি তোমাদের রাস্তায় যাব না। আমি যাব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ছায়ার মত। পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি ছাড়া কেউ বুঝবেই না যে আমি আছি।

বলে নয়ন সেই অকপট হাসি হাসে।

শ্যামা রেগে গিয়ে বলে—আমিও তো তোমাকে চাইছি না নয়ন। তোমার একটুও আত্মসম্মান বোধ নেই কেন?

নয়ন অবাক হওয়ার ভান করে বলে—আমাকে চাইছ না। তবে গোলাপটা কার জন্যে?

—তুমি নও, সে তুমি নও।

সেই রকম অবাক হওয়ার ভান করে নয়ন বলে—নই? আমি নই! কেন নই শ্যামা?

—তোমার কথা আমার মনেই থাকে না।

—খুব থাকে। বলে নয়ন হাসে—তুমি আমাকে ভয় পাও।

—তুমি ফিরে যাবে না?

—তুমি আমাকে ভয় পাও কেন? তোমার অতগুলো পুরুষ বন্ধুর কাউকে তো তুমি ভয় পাও না।

—তোমাকেও পাই না।

—পাও, আমি জানি।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ভয় পেলে তোমার জন্য এমন দাঁড়িয়ে থাকতাম না।

নয়ন ভ্রূ তুলে, চোখ বড় করে বলে—আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলে! তবে ফুলটা তুলবার সময়ে আমার মুখ তোমার মনে ছিল শ্যামা।

—ইয়ার্কি কোরো না নয়ন। আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি, আমার মন ভাল নেই।

—কেন?

—তুমি সব সময় কেন আমার পিছু নাও? তুমি তো জান, কোনও লাভ নেই! কায়স্থের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দেবেন না। তোমাকে দেখলে

বাবার প্রেসার বেড়ে যায়।

নয়ন তেমনি অকপট হাসিমুখে বলে—তোমার বাবা জাত মানলেও তো তুমি আর মান না শ্যামা! তোমার বাবা আর কদিন? ততদিন বরং অপেক্ষা করব।

শ্যামা মুখ নামিয়ে অসহায় ভাবে বলে—নয়ন, তুমি বয়সে আমার ছোট।

—ছোট! তোমার ডেট অফ্ বার্থ কবে?

শ্যামা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—তুমি চলে যাও!

—আগে বল।

—বলব না।

—মেয়েরা বয়স লুকোয় অন্যের কাছে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আমার কাছে তো তোমার সে ভয় নেই! তুমি তো আমাকে আকর্ষণ করতে চাও না! আমাকে তোমার ডেট অফ্ বার্থ বলতে ভয় কি?

অনেকক্ষণ পরে শ্যামা এই প্রথম হাসল, বলল—নয়ন স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বয়স চব্বিশ।

নয়ন গম্ভীর মুখে বলে—আমারও তাই।

শ্যামা হেসে বলে—না, তোমার আরও কম। তাছাড়া সার্টিফিকেটে আমার বয়স আরও দু বছর কমানো আছে। আমার এখন ছাব্বিশ।

নয়ন হাসে—আমারও কমানো আছে, তিন বছর। আমার এখন সাতাশ।

—না! তোমার এখন বাইশ কি তেইশ।

—সাতাশ। বলে নয়ন হাসে। তারপর আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়। ব্যথিত মুখে বলে—জাত বা বয়স কিংবা তোমার বাবার মতামত এর কোনটাই তোমার প্রবলেম নয় শ্যামা, আমি জানি। তোমার আসল প্রবলেম কি?

শ্যামা ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থাকে, তারপর বলে—তুমিই আমার চারদিকে প্রবলেম তৈরি করছ। তুমি ছাড়া আমার আর কোন প্রবলেম নেই। তুমি দয়া করে চলে যাও।

নয়ন তার সরল হাসিটি হেসে, শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলে—শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ, আমার বয়স সাতাশ।

—তার মানে?

নয়ন শ্যামার মুখখানা তার কটাসে চোখে পান করতে করতে বলে—জাত বা বয়স দুটোই হচ্ছে ইমাজিনেশন, বেহেড কল্পনা। এক সময়ে সমাজের প্রয়োজনে জাত ভাগ করা হয়েছি . । সেটা ছিল একটা আইডিয়া, সেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এখন সমাজ বদল হয়েছে, সেই প্রয়োজন আর নেই। রক্তের বিশুদ্ধতাও আর টিকছে না শ্যামা। মেডিকেল কলেজে যাও, দেখবে, কত কায়স্থ বৈশ্য শুদ্রের রক্ত কত ব্রাহ্মণের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। জাত-ফাত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

—আমি তোমার মত ডাক্তারি পড়ি নি নয়ন। ওসব জানি না। আমার বাবা—

নয়ন সে কথায় কান না দিয়ে বলে—আর বয়স শ্যামা? বয়স আর একটা ইমাজিনেশন। মানুষের যে রূপান্তর হয়, পৃথিবীর যে পরিবর্তন হয় সেটা দেখেই মানুষ সময় নামে এক আপেক্ষিক কল্পনাকে আবিষ্কার করে। নইলে, সময় বলে যে সত্যিই কিছু আছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের রূপান্তরই হচ্ছে সময়। যদি রূপান্তরকেই সময় বলে ধর, যদি পরিবর্তন বা অভিজ্ঞতাই বয়স হয়, তবে বলি, আমার পরিবর্তন হয়েছে অনেক, অভিজ্ঞতা বিপুল, সে হিসেবে আমার বয়স বোধহয় পঞ্চাশ ষাট।

—অত কথা শোনার সময় আমার নেই নয়ন, বাবা মা আমাকে না দেখে এক্ষুণি অস্থির হবে, হয়তো ফিরে আসবে।

সে কথাতেও কান দেয় না নয়ন। শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—সেবার যখন কয়েকজন শুয়োরের বাচ্চা আমাকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলিতে ছোরা মারে তখন মেডিকেল কলেজে আমার শরীরে যারা রক্ত দিয়েছিল—আমার সেই চারজন বন্ধুই ছিল ব্রাহ্মণ। আমার শরীরের অর্ধেক রক্তই তাদের দেওয়া। সে হিসেবে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি।

—নয়ন, আমাকে যেতে দাও, তুমি চলে যাও।

—শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ। আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশী। এ কথা তুমি তোমার বাবাকে বলো।

—ওটা তোমার কথা নয়, আমার কথা নয়। আমি বাবাকে বলব কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে—ঠিক আছে, তবে বলো না। কিন্তু অপেক্ষা

কর শ্যামা। তোমার বাবা বেশীদিন নিশ্চয়ই বাঁচবে না; তারপর—

শ্যামার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, রাগে ঘেন্নায় সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে—বার বার তুমি বাবার মরার কথা তোল কেন? নিজের ওপর তোমার ঘেন্না হয় না?

এক পা পিছিয়ে যায় নয়ন, তারপর তার অনাবিল হাসিটি হাসে। বলে—কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে?

রাগে দুঃখে শ্যামার চোখ ছল্ ছল্ করে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে চেয়ে থাকে নয়নের দিকে। গলার কান্না সামলায়, ঠোঁটের কেঁপে ওঠা থামায়। তারপর ধীর গলায় বলে—কবে তোমার এই পাগলামী বন্ধ হবে নয়ন?

—যেদিন আমার লাশ পড়ে যাবে।

কথাটা শ্যামাকে চমকে দেয়। আস্তে আস্তে বলে—ফিরে যাও নয়ন, ফিরে যাও।

—আমার কি ফিরে যাওয়ার জায়গা আছে শ্যামা? আমি তো সব ছেড়ে বেরিয়েছি। যে জায়গা থেকে রওনা হই সে জায়গায় কদাচিৎ ফিরে যাই। তুমি আমাকে চলে যেতে বলতে পার, ফিরে যেতে নয়।

—তাই যাও নয়ন, চলে যাও।

নয়ন বলে—শ্যামা, তুমি খুব দুশ্চিন্তা কোরো না। আজ হোক, কাল হোক আমার লাশ একদিন পড়বেই। নিশ্চিত। তখন আর নয়ন তোমার পিছু নেবে না। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি শ্যামা, ততদিন আমি তোমার পিছু নেবই।

—কেন নয়ন?

—কি জানি কেন! তুমি এমন কিছু সুন্দর নও শ্যামা। তোমার রঙ শ্যামলা, নাক চাপা, খুঁজলে আরও কিছু ডিফেক্ট বেরবে, তা ছাড়া তোমার স্যুটার অনেক। তোমার লাবণ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে সব আমি লক্ষ্যই করি না। তুমি যা তোমাকে তার চতুর্গুণ করে দেখতে পাই। যেদিন আমাকে ওরা স্ট্যাব করে, সেদিন অনেকক্ষণ আমি হিন্দু হস্টেলের গেট থেকে কয়েক গজ দূরে গাছ-তলায় পড়েছিলাম। জ্ঞান ছিল, কিন্তু ডিলিরিয়ামের মত অবস্থা। চারদিকে স্বপ্নের মত অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, অ্যাণ্ড ব্লাড ড্রিপিং আউট। টিপ্ টিপ্ করে রক্ত পড়ছে তো পড়ছেই। শরীর থেকে নদীর মত বয়ে যাচ্ছে রক্ত। তার কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। সেই সময়েও,

সেই আশ্চর্য রকমের ভয় আর বিকারের মধ্যেও তোমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, একটা নির্জন মেঠো রাস্তা দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, কিংবা জানালার কাছে বসে চেয়ে আছ বাইরের এক মেঘলা আকাশের দিকে। সব ঠিক মনে নেই, কিন্তু বার বার তোমাকেই দেখছিলাম, মনে আছে। আতঙ্কে চীৎকার করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম—শ্যামা, তুমি সাবধানে থেকো, ভীষণ বিপদ, তোমাকে যেন ওরা না পায়। আবার কখন হয়তো বলছিলাম—শ্যামা, আমি মরে যাচ্ছি, তুমি বিধবা হবে তো?

নয়ন তেমনি অনাবিল হাসি হাসে।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—এ সব আমাকে বোল না নয়ন, আমার ভাল লাগে না।

—তুমি গোলাপটা কার জন্য তুলেছ?

—নয়ন, রাস্তা ছাড়, আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছি। মা বাবা নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছেন। এক্ষুণি খুঁজতে আসবেন। তুমি চলে যাও। পিছু নিও না।

—আমি ছায়া হয়ে যাব শ্যামা, পাখি হয়ে যাব।

—দয়া কর নয়ন, তুমি যাও।

দূর থেকে বাবার ডাক শোনা যায়—শ্যামা-আ—

নয়ন রাস্তা ছাড়ে না।

শ্যামা হাতের গোলাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—এটা তুমি নেবে? নাও।

নয়ন হাত বাড়ায় না, বলে—নেব কেন আগে বল, কার মুখ ভেবে তুলেছিলে, কার নাম ভেবে!

—তুমি নাও।

—কেন নেব?

—নাও। দিচ্ছি।

—এই দেওয়ার মধ্যে কোন ইংগিত নেই শ্যামা?

—না!

—তাহলে নিয়ে কী হবে!

—রাস্তা ছাড়।

—দাঁড়াও। তোমাকেও তাহলে একটা জিনিস প্রেজেণ্ট করি। বলে পকেট থেকে ডিম দুটো বের করে নয়ন।

শ্যামা অবাক হয়ে বলে—ডিম? ও দিয়ে আমি কি করব?

—খাও।

—ডিম খাব কেন?

—খাব বলে কিনেছিলাম, খেতে পারছি না। খালি পেটে খানিকটা তাড়ি খেয়ে খিদে মরে গেল। তুমি অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছ, তোমার খিদে পেয়েছে।

শ্যামা কুঁকড়ে গিয়ে বলে—না। ডিম নেব কেন? ডিম কেউ কাউকে প্রেজেন্ট করে নাকি? আমার খিদে পায় নি।

নয়ন একটু স্থির চোখে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে—এই ডিম দুটো দিলে এখনও এই দেশে কোথাও কোথাও রাতভর একটা আস্ত মেয়েমানুষের শরীর পাওয়া যায়, জান?

শ্যামা লাল হয়ে বলে—তুমি—তোমার মুখে কিছুই আটকায় না নয়ন?

নয়ন ধীর স্বরে বলে—মিথ্যে কথা নয় শ্যামা, এই ডিম দুটোর যা দাম তা অনেকের কাছে অনেকগুলো পয়সা। আমি দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতার বয়স অনেক।

—তুমি বরং মেয়েমানুষের শরীর কিনো নয়ন, আমার পথ ছাড়, বাবা এসে পড়বে।

—রাগ কোরো না শ্যামা, আমি শুধু ডিম দুটোর আপেক্ষিক দাম বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। দামটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার বা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ ডিম দুটোর দাম অনেকের কাছে অনেক, আবার কারও কাছে কিছুই নয়।

শ্যামা হেসে বলে—ফুলের বদলে ডিম?

নয়নও হাসে—ফুলের তুলনায় ডিম অনেক সলিড জিনিস শ্যামা। তুমি জিতে যাচ্ছ। নাও।

শ্যামা একটু ইতস্তত করে। কিন্তু সে জানে, নয়ন বড় দুরন্ত। বাবা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না দেখে ফিরে আসবে। এসে যদি নয়নকে দেখতে পায় বাবা, তাহলে কী হবে! ইতস্তত করেও তাই ডিম দুটো নেয় শ্যামা। ব্যাগে ভরে রাখে। যদি এতে রাস্তা ছাড়ে নয়ন, যদি শ্যামাকে ছেড়ে দেয়!

ফুলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল নয়ন। নির্দোষ হাত, শ্যামা সন্দেহ

করে নি কিছু। বাড়ানো হাতে ফুলসুদ্ধ শ্যামাকে ঘাড় কাৎ করে দেখতে দেখতে বোধ হয় নয়নের ভিতরে কিছু ফুঁসে উঠল। এক পলকে শ্যামার ফুলসুদ্ধ হাত ধরে তাকে টেনে নিল সে। শেকড় সমেত উপড়ে গেল শ্যামা। চারদিকটা যেন ঝোড়ো বাতাসে আবছা ধুলোটে হয়ে গেল, কিংবা একটা কুয়াশা ঘিরে ফেলল তাদের—এরকমই মনে হল তার। পরমুহূর্তেই সে নয়নের বিশুষ্ক ঠোঁট তার ঠোঁটে গালে টের পেল। নয়নের গালের দাড়ি ঘষা খেল তার গালে, পরমুহূর্তে ঝুরো চুলওলা নয়নের মাথা তার কাঁধ থেকে গলার কাছে অশ্লেষে ডুব দিতে থাকে। তাড়ির ঝাঁঝাল গন্ধ পায় শ্যামা, সেই সঙ্গে বহুকাল ধরে রোদে-পোড়া চামড়ার উষ্ণ গন্ধ, জামা কাপড়ে ঘাম আর ধুলোর সোঁদা গন্ধ। এমনটা এই প্রথম নয়। অন্তত তিন চার জন পুরুষ তাকে ইতিপূর্বে আক্রমণ করেছে। নয়নও। তবু এই ঝড় ঠেকানোর কৌশল আজও শ্যামা সঠিক জানে না। মেয়েরা বড় অসহায়। তবু দু হাতে সে নয়নকে প্রাণপণে রুখবার চেষ্টা করে। চেঁচায়। মারে।

নয়ন সহজে থামত না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাছ থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে—বাবা, দেখ—

নয়ন শ্যামাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। মারকুটে হিংস্র ভঙ্গীতে। মিথুনের সময়ে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মত। নয়নের সেই সাপের মত ভঙ্গী দেখে চোখ ফেরাতেই একটা সত্যিকারের সাপ দেখতে পায় শ্যামা।

দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুত। ভাঙা, পোড়ো বাড়িটার আগাছার জঙ্গল ভেদ করে দুজন ভাঙা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন একটা বছর সাত আটেকের বাচ্চা ছেলে, অন্যজন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের একজন গ্রাম্য চেহারার লোক। হাবার মত দাঁড়িয়ে। ছেলেটার চোখের পলক পড়ছিল না। লোকটারও তাই। অদ্ভুত এই যে, লোকটার ডান হাতে লম্বা একটা জ্যান্ত সাপ। সাপের গলার কাছটা মুঠোয় ধরা, সেটা লোকটার হাতে দুটো প্যাঁচ খেয়ে ঝুলছে। আস্ত গোখরো।

শ্যামার বমি পাচ্ছিল হঠাৎ। লজ্জা, লজ্জা! বাচ্চা ছেলেটা এই কাণ্ড দেখেছে, লোকটাও। মথিত গোলাপটা পড়ে আছে রাস্তায়। এক পলক দেখল শ্যামা। তারপরই গোলাপটাকে লাফিয়ে পার হয়ে ছুটল সে।

নয়নের মাথার ঠিক ছিল না। যে মুহূর্তে সে শ্যামাকে দু হাতের ভিতরে পেয়েছে সেই মুহূর্তেই এই বাধা। কত কষ্টে তাকে শ্যামার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিতে হয়! তাই প্রথমটায় রাগে তার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। হয়তো ছুটে যেত সে, লোকটাকে লাথি মারত, ছেলেটাকে থাপ্পড়, যা নয়নের স্বভাব! কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সে লোকটার হাতে ধরা জ্যান্ত গোখরোটাকে দেখে।

নয়নের ভিতরে একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। যা কিছুর ভিতরে ভয়ঙ্করতা হিংস্রতা আছে তা সে ভালবাসে। যার মধ্যে বীরত্ব বা বেপরোয়া কিছু আছে সে নয়নকে মুহূর্তের মধ্যে টানে। লোকটার হাতে সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা খুব অনায়াস দক্ষ সাহসীর ভাব ছিল। নয়নের রাগ বাতাসে উড়ে গেল, ফুলের মত ঝরে গেল। একটু আগে শ্যামার দেহস্পর্শের আগুন নিভে গেল ভিতরে। সে শ্যামার হাত থেকে স্খলিত ফুলটার দিকে চেয়েও দেখল না। যে শ্যামার জন্য সে এত দূর এসে রোদে দাঁড়িয়ে তীব্র পিপাসায় অপেক্ষা করেছে তার কথা ভুলেই গেল প্রায়। গালের একটা জায়গায় শ্যামার বাঁ হাতের লম্বা নখের একটা আঁচড় পড়েছে বুঝি! সেই জায়গাটা কেবল জ্বালা করছে।

গালে একবার হাত বুলিয়ে এক পা দু পা করে লোকটার দিকে হেঁটে গেল নয়ন। লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা এখনও যায় নি। ছেলেটা এখনও হাঁ করে আছে। কৃতকর্মের জন্য তবু একটুও লজ্জা পায় না নয়ন। কোন জবাবদিহি করারও চেষ্টা করে না। তার গলার স্বরও ঠিক থাকে।

একটু হেসে সে জিজ্ঞেস করে—সাপটা ধরলেন?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিল?

লোকটা পোড়ো বাড়িটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে—এখানে। এখনও বিস্তর আছে!

—কামিয়েছেন?

—না। সদ্য ধরলাম তো।

—জাত গোখরো। দেখি—

লোকটা সাপটাকে তুলে দেখায়। নয়ন ঝুঁকে খুব কাছ থেকে দেখে। গভীর শ্বাসের শব্দ করে সাপটা। না এখনও কামান হয় নি। দুটি সূক্ষ্ম দাঁত

ঝিকিয়ে ওঠে। নয়ন হাসে।

—বিষের থলি মনে হয় ভর-ভরন্ত! নয়ন বলে।

—আজ্ঞে।

—এটাকে নিয়ে কি করবেন?

লোকটা একটু হাসে। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাঁটিয়ে উঠেছে। নিজের ছেলের দিকে একটু চেয়ে দেখে। তারপর বলে—ছেড়ে দেব।

—না কামিয়ে? বলে ভ্রূ ওপরে তোলে নয়ন।

—না কামিয়ে ছাড়লে ব্যাটা রুখে আসবে। কামিয়েই ছাড়ব। তার আগে ক-ফোঁটা বিষ ঢেলে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধ করে নয়ন। বলে—দেখি, কী করে নেন!

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে বলে—কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাবে না? উনি তো এগিয়ে গেলেন!

—কে? নয়ন বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটা চোখের পাতা নামিয়ে বলে—ঐ উনি, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন!

শ্যামার কথা মনে পড়ে নয়নের। বিদ্যুৎচমকের মত। কিন্তু এতক্ষণ মনেই ছিল না। একটু হাসে নয়ন। তারপর বলে—এগিয়ে যাক না। ঠিক ধরে ফেলব পা চালিয়ে। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবে, বেশি দূর তো নয়।

—ও। মনস্কামনা আছে বুঝি!

—আছে।

লোকটা উদাস গলায় বলে—অনেকে আসে। মোনা ঠাকুরের খুব বাড়বাড়ন্ত এখন।

—চেনেন।

—না চিনবার কি? আমি তো কল্পতরু মন্দিরের পাশেই থাকি।

—কি করেন? সাপ খেলান?

লোকটা হাসে—না। সাপ ধরা শিখেছি অনেক কষ্টে। এ আমার শখ। মাঝে মধ্যে বিষ বেচি, ওষুধ কোম্পানিগুলো কেনে। বলে ছেলের দিকে চেয়ে বলে—সুকুল, কৌটো বাউটো বের কর।

ছেলেটার কাঁধে একটা ঝোলা। তা থেকে বড় মুখওয়ালা একটা শিশি বের করে আনে। শিশির মুখে পাতলা বেলুন বা ঐ জাতীয় কিছুর

একটা রবারের ঢাকনা সূতো দিয়ে টান করে বাঁধা। শিশিটা বাঁ হাতে ধরে লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হেসে বলে—তেমন কিছু কাণ্ড না। দেখুন।

সাপটা হাঁ করেই ছিল, মুখের কাছে শিশিটা আনতেই নড়ে উঠল। দাঁতের কাছে বিষ ঢালার মত কিছু একটা সে এখন চায়। রাগে আক্রোশে লেজের ঝাপটা মারে। কী সুন্দর সরু ভয়ঙ্কর দাঁত, কী দক্ষতা তার দাঁতে! পাতলা রবার নিঃশব্দে ভেদ করল দাঁত দুটো। লোকটা শিশি সমেত সাপটাকে উঁচু করে দেখাল। নয়ন দেখে, শিশির মধ্যে হাল্কা রঙের দুটি ফোঁটা পড়ল। লোকটা শিশিটা ছাড়িয়ে নিয়ে নয়নকে দেখায়। বলে—অয়েল প্রোটিন।

নয়ন ঐ শব্দ দুটো শুনে বড় চোখে চায়। বলে—আপনি অনেক জানেন দেখছি।

—কিছুই না। ও সবাই জানে।

লোকটার হাতে ছেলেটা একটা চাকু ধরিয়ে দেয়। যে ভাবে ছেলেরা পেন্সিল কাটে সেরকম অনায়াসে মুখের কাছে সাপের মাথাটা তুলে লোকটা দুটো মোচড়ে দাঁত উপড়ে আনে। ছোট্ট দুটি দাঁত, উপড়ে আনার পর কেমন নিরীহ দেখায়। সুকুল নামে ছেলেটি একটা কাগজে দাঁত দুটো সাবধানে মুড়ে ঝোলায় রাখে। সাপটা ছট্‌পট্ করে। লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে একটু হাসে। বলে—ওদের দাঁত ওপড়ালে ব্যথা যেমন পায়, আরামও পায় তেমনি। দাঁত দুটো টন্ টন্ করে তো! যত বিষ ওদের দাঁতে। মানুষের কোথায় বলুন তো!

নয়ন উত্তর দেয় না! চেয়ে থাকে।

লোকটা সাপের লেজ আর মাথা দু'হাতে চেপে ধরে কী একটু বিড় বিড় করে বলে। তারপর আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে সাপটাকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দেয়। প্রাণ পেয়েই যেন বিশাল লক্‌লকে গোখরো ফুঁসে উঠে ঘাসময় তার কিলবিলে ভয়ঙ্কর গতি ছড়িয়ে দিয়ে একবার ফণা তোলে। নয়ন এক লাফে পিছিয়ে আসে। লোকটা সাপটার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। সাপটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে নেয়, তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে যায়, স্বচ্ছন্দে পার হয় দেয়াল, লম্বা দূর্বাঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ঢেকে যায়।

নিঃসাড়ে সাপটাকে দেখছিল নয়ন। চোখ তুলতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সাপটা হাতে ছিল বলেই এতক্ষণ লোকটাকে

ভাল করে দেখা হয় নি। এখন চেয়ে দেখল নয়ন, পরনে মোটা কাপড় খাটো করে পরা, গায়ে হাফ-হাতা শার্ট, খালি পা, মাথার চুল যাত্রাওয়ালাদের মত ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। মুখখানা চৌকো, ভাঙা, কিন্তু তা রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য নয়। যারা শরীর খাটায় তাদের শরীরে একরকম মেদহীন রুক্ষতা থাকে। এ লোকটারও তাই। নয়নের তুলনায় লোকটা লম্বা, ঘাড়টা মোটা, হাত দু'খানায় শিরা আর পেশী কিলবিল করছে। চওড়া কাঁধ। কিন্তু চোখ দু'খানা বড় নিরীহ, মায়াময়। এতটা স্বাস্থ্য থাকলে মানুষ এমনিতেই একটু মারমুখো হয়। কিন্তু লোকটা তা নয়।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে রইল নয়ন। কবে যেন নয়নের চোখ ছিল সাধারণ, তাতে আগুন খেলা করত না, তাতে ভাবালুতা ছিল, স্বপ্ন দেখা ছিল, সেই চোখে মায়া মমতাভরে চারদিককে দেখার প্রবণতা ছিল তার। কিন্তু সে যেন এক দূর অতীতের কথা। মাত্র চব্বিশ কি তারও কম বয়সে নয়নের কত রূপান্তর হয়ে গেছে। এখন নয়ন জানে, তার চোখে কেউই খুব বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারে না। আয়নায় নিজের মুখ অনেক দেখেছে সে, কিন্তু পরিবর্তনটা কিছুতেই কখনও সে ধরতে পারে না। কিন্তু জানে, জেনে গেছে, তার চোখে একটা বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে। তার মনের ছায়া চোখে পড়ে। সেখানে আগুন খেলা করে এখন। লোকটা কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না। চেয়ে রইল। মনে মনে নয়ন লোকটাকে বলল—সাবাস! প্রায় বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছো হে বাপু, নয়নের চোখে এতক্ষণ কেউ চোখ রাখে না।

মুখে খুব সাধারণ পথ-চলতি কথার মত জিজ্ঞেস করল—কি করেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে—চাষবাস, বললাম তো! আর মাঝে মাঝে সাপ ধরি। বুনো পাতা থেকে ওষুধ তৈরী করি নানারকম। আর, ছেলের সঙ্গে খেলা করি। এই যে সুকুল, এ আমার ছেলে।

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলে লোকটা, যেন ছেলের পরিচয়টা দেওয়া সবচেয়ে বেশী জরুরী। মানুষের নানা দুর্বলতা থাকে। নয়ন বলল—আপনাদের এ জায়গাটা বেশ।

—গাঁ-গঞ্জ জায়গা, ভদ্রলোকের উপযোগী নয়। বেশ আর কী।

—ইলেকট্রিক নেই এদিকে?

—কি যে বলেন!

—অনেক গাঁয়ে আছে।

—এদিকে নেই।

—বি ডি ও অফিস?

—সে অনেক দূর। তিন মাইল পূবে চকখালি, সেইখানে।

—থানা?

লোকটা নয়নের দিকে একটু চেয়ে থেকে হেসে বলে—সেও দূর!

—এ দিকটায় তবে আছে কি?

—আছে মোনা ঠাকুরের জাগ্রত কালী—যা দেখতে বহু লোক আসে। আর আছি আমরা, জঙ্গল আছে, সাপ আছে, আর কী থাকবে গাঁয়ে-গঞ্জে। চলুন দেখে আসবেন, বেশী দূর নয়। আপনার লোকও তো এগিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক নয়ন জবাব দিল—হুঁ।

—কে হয় আপনার?

—কার কথা বলছেন? নয়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—ঐ যে উনি, যিনি সঙ্গে ছিল আপনার!

—হয় কিছু। বলে নয়ন একটু হাসে।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটা বলে—উনি ফুলটা ফেলে গেছেন। কুড়িয়ে নেবেন না?

নয়ন রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ফুলটাকে একটা লাথি মেরে বলে—ফুলের অভাব নেই দেশে।

লোকটা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—ঠিক কথা, তা ছাড়া ফুলের তেমন বাসও নেই। লতানো গাছের ফুল তো।

নয়ন গম্ভীর হয়ে বলে—হুঁ।

লোকটা বলে—বর্ষাকালের ফুল ফল সবই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, জলঢোপা।

—এদিকটায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়?

—যাবে না কেন? মোনা ঠাকুরের কল্পতরুর মন্দিরে অনেক জায়গা। যেখানে সেখানে পড়ে থাকা যায়। থাকবেন?

নয়ন মুখ তুলে বলে—ভাবছি থাকলে কেমন হয়।

লোকটা হেসে বলে—আপনারা শহর বন্দরের মানুষ, থাকতে পারবেন না। ওদিকটায় ভদ্রলোকের বাস নেই।

—ভদ্রলোকদের মুখে পেচ্ছাপ কার।

ছেলেটা নয়নের কথা শুনে হি হি করে হেসে ওঠে।

—কী হল সুকুল? লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

—পেচ্ছাপ করবে বলছে। মুখে! হ্যাঁ বাবা! ছেলে হেসে কুটিপাটি।

—তুমি পা চালিয়ে চল তো। আমরা পেছু পেছু যাচ্ছি, দম ধরে তুমি খানিক দৌড়ও। লোকটা তার ছেলের পিঠে আলতো চাপড় মেরে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

—আমি তোমাদের কথা শুনব।

—তার চেয়ে দৌড়লে কাজ দেবে। বড়দের সব কথায় কান দিতে নেই।

—মুখে কি করে পেচ্ছাপ করবে বাবা, অ্যাঁ?

নয়ন ছেলেটার দিকে ঝুঁকে বলে—ভদ্রলোকদের মুখে কি করে পেচ্ছাপ করতে হয় তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তার বদলে তোমার বাবা আমাকে সাপ ধরতে শেখাবেন।

তারা খানিক চুপচাপ হাঁটে। লোকটা একবার নয়নকে সতর্ক করে দেওয়ার ইংগিত করে বলে—সুকুল কিন্তু আমার ছেলে। ওর সামনে—

কথাটা লোকটা শেষ করে না। নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে—আমি ভদ্রলোক নই।

—নন?

—না।

—কেন নন?

—পোষায় না।

—কিন্তু আপনি তো ভদ্রলোকের মতই দেখতে, শহরের বাবুভেয়েরা যেমনটি হয়।

—সে পোশাকে। ভিতরে আমি অন্য মানুষ।

—কলকাতা থেকে আসছেন তো?

নয়ন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—আসছি। কিন্তু সে আমার আগের সাকিন। আসলে আমার জীবন কাটে গাঁ-গঞ্জেই। কলকাতার লোক মাত্রই ভদ্রলোক নাকি!

লোকটা একটু ভেবে বলে—তা অবশ্য নয়। কিন্তু ভদ্রলোকরা যেখনেই থাকুন তাদের জাত যে আলাদা তা দেখলেই বোঝা যায়। সে

জন্ত তো আপনার ঘোচে নি!

—ও হচ্ছে গায়ের ঘেমো-গন্ধের মত, সহজে যায় না।

লোকটা হাসে! ছেলেটাও খি-খি করে হাসে, বলে—ঘেমো-গন্ধ বাবা, কি বলছে দ্যাখো!

—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে—শিখে কি করবেন?

—শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

—কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

—কৌশলটা কি?

—সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কৈ মাছ ধরার মতই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়!

—আমাকে শেখাবেন?

—শেখাতে পারি।

—আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে—আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সবকিছু বেচি না।

—যদি শেখান তো এদিকটায় কদিন থেকে যাই।

—সঙ্গের লোকেরা?

—ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কি যেন বলি বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তারপর বাপ-ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল-ডাক ডেকে ওঠে। কুহু-কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে! লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—আরে বাঃ! লোকটা বলে।

—আমাকে শিখিয়ে দেবে? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

—দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

—দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে—অনেক জায়গা, না বাবা?

ওরা বাপ-ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল—এখানে থাকতে চান কেন?

—এমনিই। জায়গাটা ভাল লেগে গেছে।

—কাজকর্ম কিছু করেন না?

—না। ডাক্তারী পড়তাম. ছেড়ে দিয়েছি।

—ছাড়লেন কেন?

—পোষাল না।

—এখন তবে কি করে চলে?

—চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।

লোকটা একটু ভেবে বলে—এদিকে এসেছিলেন কেন?

—চলে এলাম।

—ঐ মেয়েটা কে?

—ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে—সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁট।

সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে—তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে—মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ-টশীকরণ হয়?

লোকটা হেসে বলে—হয়।

—বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে?

—ঠিক জানি না।

নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে—বশীকরণে কাজ হয় তো? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা

যায় না!

—কেন?

—আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষ দাঁত তুলে নেন।

—হিপনোটিজ্‌ম্ না?

—কে জানে!

—আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

লোকটা বলে—আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কি করবেন?

—তাহলেও ভাঙবো।

—কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে—শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদের উচ্ছেদ করতে চাই।

লোকটা একটু হেসে বলে—যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায়?

—মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। থাকলেই বরং ক্ষতি।

—তাহলে শ্যামার কি হবে?

—কি হবে?

—শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে?

—কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মত জোর আমার আছে।

—তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে—ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে—কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বান মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপতপ করেন

তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আম বাগানের শেষে একটা মাঠ কোণাকুণি পার হয়ে, একটা বড় পুরোনো দীঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মত জায়গা পেরিয়ে সুপারি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরোনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে—দেখেছেন! ঐ হচ্ছে মোনা ঠাকুরের আস্তানা।

নয়ন গম্ভীর ভাবে বলে—হুঁ।

—লোকে কয় মাটির পুত্‌লা। কালী আমার মাটির পুত্‌লা। ঢ্যাস্ করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস্ করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে? বন বন করে ঘোরে কেন মালাখানা? হ্যাঁ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধান চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মতো হিল্ হিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠাণ্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেয়াল তৈরী হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধান। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন। শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড় বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই।

মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশেপাশে আরও দু-চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা, চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসে ছিল শ্যামা। তার মন ভাল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়েছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে—লোকে বলে মাটির পুত্‌লা। তো তাই। তবু কালী আমার হাঁটে চলে, খায়-দায়, চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে হাসে। পাগ্‌লি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝিঁ ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ঐ আলো-আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয় নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারদিকে একটা জাল তৈরী করছে। শ্যামার মন ভাল লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কি করে? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলে নি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর ধরা গলায় বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে—অষ্টসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই। লোকের চোখে মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মত অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে—তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন? এ জায়গা ভাল লাগছে না মা? ভয় করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তারপর একটু হাসে।

—ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ-আপদ নেই।

সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর-বদমাশরা অসাড় হয়। যাও মা, ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এস। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভিতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে। দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভিতরবাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে—তারা, ওরে তারা—

ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরের দরজায় দাঁড়ায়।

—এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন। যাও মা, ঐ আমার মেয়ের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই।

শ্যামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতকগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মত লেগে আছে। মন ভাল নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল—ওটা কি ডাকছে?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল—বেড়াল। আমাদের বেড়ালটার বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশী গাছপালার জন্যই বোধ হয়।

শ্যামা বলল—তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোন অমঙ্গল হয় না! বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিন্নি-বান্নির মতো ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বার বার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে—মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সব কথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে!

—তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা?

মেয়েটা ঠিক-ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তারপর বলে—না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে তার অমঙ্গল হয় না।

—তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে—ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশী কথা বলে না। কি করে জানব বলুন! আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে—কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে?

মেয়েটা বলে—আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর!

—যাঃ, আমি তো কালো।

—খুব কালো না। তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রাণীর মত হতেন।

—আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না?

—কেন?

—আপনি তো পরেন নি।

—আমার বেশী গয়নাই নেই। তাছাড়া দিনকাল তো ভালো না, গয়না পরলে যদি চোর-ডাকাতে পিছু নেয়?

—আপনি যা সুন্দর! চোর-ডাকাত না হোক ছেলে-ছোকরা পিছু নেবেই।

শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

—আপনি এটা কি শাড়ি পরেছেন? শিফন?

—না, এটা কমদামী শাড়ি। ব্রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপছে পড়ে। সে মিটমিটে হাসি চোখে চেয়ে বলে—আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুণি মেয়েটাকে ভাল লাগতে থাকে। সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞেস করে—কেন, ভাল শাড়ি আপনার পরতে নেই?

—বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ারও লোক নেই।

—গ্রামদেশে ভাল শাড়ি পাওয়া যায় না?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে—খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি

বেরোলে তিনদিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

—মন খারাপ লাগে, না?

—লাগবে না? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয়?

শ্যামা একটু হেসে বলে—বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

—বিয়ে কে দিচ্ছে!

—কেন?

—বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে—সে কী!

—সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে—তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে—না। বাবার কোন সমস্যা নেই।

—এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়, সে-ই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কি করে অন্যের ভাল করবে?

মেয়েটা একটু উদাস গলায় বলে—কিন্তু তবু বাবার কোনও সমস্যা নেই।

কেন?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে—আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল—এরা বাবার কেউ না। বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর—মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ঐ চালাতে বসে লেবুকাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবর দিলাম তখনও কাঁটা তোলা হয় নি। বাবা খবরটা শুনল, তারপর আস্তে আস্তে খুঁটে কাঁটা তুলল, তারপর ভিতর বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে—সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে—সত্যি বলছি। বাবার কোন সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মাঠ মত। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

—এসব মন্দির কি বহু দিনের পুরোনো?

—কয়েক শো বছর বোধ হয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

—সুড়ঙ্গটা কোন্ দিকে?

—পশ্চিম দিকে। দেখবেন? নাকি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এসবের উপর মেয়েটির কোন টান নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পূজারীকে গ্রহণ করে নি।

শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে—করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে—মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—তবে কি?

—বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ঐ যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনো ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে। সে আস্তে করে বলে — কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

—মেয়েটা কিন্তু কোন কৌতূহল দেখায় না। কেবল বলে—বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোক আসবে কেন?

—অনেক লোক আসে?

—অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজ গিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশি আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। এ মেয়েটার ভাই নিশ্চিত ভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে—একটু জল খাব।

—আমি বাড়ি থেকে এনে দেব?

—না, না। ঐ তো টিউবওয়েল!

—আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না?

—দূর।

—তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি। জল খাওয়ার সময়ে নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল—কি ডাকছে?

—ওমা! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না! প্রশ্ন করে—সত্যিকারের কোকিল।

—তা নয় তো কি?

—অনেক সময় মানুষ কোকিলের মত ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে—এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যিকারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে—আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মত ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ঐ শিমূল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ঐ ডাক।

চারদিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রৌদ্রের ততদূর উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

—সুড়ঙ্গটা দেখবেন? মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

—চলুন, দেখি। কখনো দেখিনি।

—দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাস ভাবে বলে—আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

—এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি?

—না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই। আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

—এখানেই জন্মেছেন?

মেয়েটা হেসে বলে—তবে আর কোথায়?

—ভাল লাগে এ জায়গা?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে—একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে—এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন?

মেয়েটা হেসে বলল—আপনার মত একটা রঙীন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন!

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে—খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে-ট্রামে-মোটরগাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে।

—এখানে কিছু নেই?

মেয়েটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে—মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখান হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। সেই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহ থাবা দেয়। সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ঐ দিকে মন্দিরের উত্তরে বাঁশঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

—কেন পারে না?

—এই গাঁয়ের সে-ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

—কেন?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে,—তার একটা ছেলে আছে। তার

বৌ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ঐ লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন! কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তারপর আবার বলে—এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালের পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে, তাদের যত দেখি তত ঐ কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙীন কাপড়ের পোশাক, কী রকম ঝলমলে মুখ চোখ, কেমন দূর মাখানো তাদের চেহারায়।

শ্যামা হাসি চেপে বলে—কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—দূর কেন হবে! কত লোক এখান থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মতো বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চূড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নিচে একটা ছোট্ট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিস্বাদ মুখে বলে—ঐ। যাবেন?

—কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা?

—বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইঁটের ডাঁই আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

—সাপখোপ নেই তো।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে—কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুড়ি করত একসময়ে। কেউ কিছু পায় নি।

শ্যামা হেসে বলে—আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই?

মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

—অন্ধকার যে!

—কোন ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে।

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার নাম কি?

—শ্যামা।

মেয়েটা হাসে, বলে—আমার নাম তারা।

—জানি।

—আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে। হাসে।

—শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে—আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাই।

—তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

—কেন?

—আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অনেকদিন নামি নি কিনা!

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল—আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল—না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার দিকে চেয়ে সে বলল—জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়-ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না! কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি? সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তারার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এ রকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে, স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মতো দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা এক রকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে! মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

—কি হল মা?

মা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে—যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

—কী হয়েছে বল না!

মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায় বলে—ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষীকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি ডেফিনিট্ হতে পারছি না!

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে—আমরা কিছু বলার আগেই উনি কি করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি! তুমি তোমার ডেফিনিট্ নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাবো।

বাবা মৃদুস্বরে বলে—এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে—তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভিতরটা মুচড়ে ওঠে ব্যথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি আবার ফিরে আসবে। দাদা কি বেঁচে আছে! আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যান্ট-শার্ট পরে, আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে! যদি আবার আগের মত তারা চারজন

রাতের খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে! কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না। আবার কি সে সব হবে ঠিক আগেকার মত! ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই। কোন নদীর পাড়ে বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে—এ রকমটাই মনে হত তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক্ করে কেঁপে উঠত বুক! বাবা প্রায় সময়েই বলত—দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে-টিক্ষে করছে বোধ হয়। মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না। একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসবে। আবার 'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে....। শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না। এ সব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে, কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল—শ্যামা, একটু পরেই সন্ধ্যে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব।

—দেরি হয়ে যাবে না?

—হোক গে। এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান! একটু থাকি।

বাবা বিড় বিড় করে বলে—দিনকাল ভাল নয়।

মা বড় চোখে বাবর দিকে চায়। বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উদাস একখানা মাঠ। শেষ বেলার বার্লিরঙের আলো পড়ে আছে। একখানা টিনের দো'চালার দাওয়ায় বসে বাপ-ব্যাটা।

ছেলে মুখ তুলে বলে—বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে।

—দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে।

—কামড়ায় না।

—কামড়ায়।

—কেমন লাগে?

—লাগে না। দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি! কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোণাকুণি

মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাক। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে—শ্যামাপাখির ডাক পারেন না?

নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

—কি হল ওখানে?

—কিছু না। এখানে আরতি হবে।

—বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—কল্পতরুর মন্দিরে।

মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগী। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

—তুমি আমাকে কখন পাখীর ডাক শেখাবে?

—কাল থেকে শেখাব।

—আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো?

—না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন থাবা দিয়ে মেরেছিল বল।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে—এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে?

নয়ন ঝুঁকে বলে—কি গল্প?

—গল্প না। একটা ঘটনা।

—আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল?

লোকটা উদাস গলায় বলে—সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ।

—সেটা কি?

—সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত—আসল সিংহ হয় গহীন জঙ্গলে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না। গাউস একটা কেশরী বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

—আপনি সার্কাসে ছিলেন? খেলা দেখাতেন?

—দেখাতাম। প্রথম প্রথম। চুল দিয়ে লোহা তুলতাম, কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম। গায়ের জোর ছিল খুব। একদিন তাঁবুর দড়ি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই। মাজা ভেঙে শেষ হয়ে গেলাম। গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না। দলে রেখে দিল। ফাই-ফরমাস তামিল করতাম, বাঘ সিংহকে খাবার দিতাম, হাতীর জন্য কলাগাছ কেটে আনতাম। এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাঁবু ফেলল। নির্জন জায়গা বাঘ সিংহের ডাকে কেঁপে উঠল। তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে। দুপুরবেলা খাবার দিতে সিংহের খাঁচায় নেমেছি। বুড়ো আধমরা সিংহ, নড়াচড়া করত না বড় একটা, খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত। দেখেশুনে মনে হতো আদুবুড়োর কথাই ঠিক। এটা সিংহ নয় বটে, কেশরী বাঘই হবে। সেদিন কী খেয়াল হল, মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি ব্যাটা করে কী। এইরকম পাঁচ-সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল, আর চোখ পিট পিট করল। মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই। ঠিক বুঝতে পারি নি। হঠাৎ বেমক্কা সব আল্‌সেমি ঝেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল। সে কী ডাক। ভিতরটা আমার ফেটে গেল যেন। সেই ডাক সমালাবার আগেই উপর্যুপরি কয়েকটা থাবা। তারপর এক ঝটকায় আমাকে পেড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর দাঁড়াল সে। পাঁজরার একটা হাড় গেল মাট্‌ করে ভেঙে। সময়মত গাউস্‌ সাহেব চাবুকের শব্দ না করলে আজ আর আমাকে সুকুলের বাবা হতে হত না। বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে।

সুকুল বলে—দেখি দাগ।

লোকটা জামা সরিয়ে পিঠ দেখায়। নয়ন দেখে, সেখানে গভীর এবং লম্বা ক্ষতের চিহ্ন। সে জিজ্ঞেস করে—তারপর কি হল?

—কি আবার হবে! একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাস চারেক পড়ে রইলাম। ততদিনে গাউস পাততাড়ি গুটোল। আমারও সার্কাস ভাল লাগছিল না বলে পিছু নিলাম না। এই গাঁয়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরেছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে, ঘর দেবে, নগদ বিদায়ও দেবে কিছু। মেয়েটাও মন্দ ছিল না। বিয়ে করে থেকে গেলাম। সেই মেয়েই সুকুলের মা। বেশিদিন

বাঁচে নি।

লোকটা চুপ করে মাঠের বার্লিরঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল। একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলল—বাবা সুকুল, তুমি বই নিয়ে একটু বস। আমি রান্না চাপাই। ঘরে অতিথি আছে।

ঘরে সবকিছুই সুন্দর সাজানো। একদিক বাপ ব্যাটার খাট, অন্যধারে একটা ন্যাংটো চৌকি। চতুর্দিকেই মুকুলের খেলনা। চাল থেকে বেলুন ঝুলছে, দেয়ালে পেরেকে লটকানো ঘুড়ি লাটাই, কাচের আলমারি বোঝাই পুতুল, খেলনা-পিস্তল, ভেঁপু, লাট্টু, কলের ঘোড়া। আলনায় সুকুলেরই রঙ-বেরঙের জামাকাপড়। একধারে সুকুলের পড়ার টেবিল, তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের ছবির বই। পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝক্‌ঝকে লণ্ঠন রাখা।

লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে—এ হচ্ছে সুকুলেরই ঘর। সুকুল যখন বড় হবে, তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।

সুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে, কিল মারে নীরবে।

লোকটা হাসে, ছেলেকে সামলাতে সামলাতে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা যাব না। তুমি বই খুলে বস। আমি ভিতরের বারান্দায় বসে রান্না করি।

ভিতরে অন্ধকার উঠোন। তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়ন চুপ করে বসে চেয়েছিল। দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। তার কান সেইদিকে।

লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায়।

—কিছু হল?

—না।

—সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন নাকি? মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে।

—নেমেছিলাম। কিন্তু ও নামে নি।

—নামল না কেন?

—নয়ন ঠোঁট উল্টে বলে—কী জানি! বোধ হয় আপনাদের মোল্লা ঠাকুর আগেভাগে সব জেনে সাবধান করে দিয়েছে।

—ঠাকুরকে দেখলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—দেখেছি! দূর থেকে।

—কেমন মনে হল?

—যেমন হয়।

—পারবেন?

—কি?

—উচ্ছেদ করতে?

নয়ন একটু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে—একটা বোমা মারলেই উড়ে যায়।

লোকটা ধীরে ধীরে বিড়িটা টানে। তারপর চিন্তা করে বলে—শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই।

নয়ন একটু নড়ে। গালে একটা মশা মারে ঠাস করে। পায়ের পাতা খস্ খস্ কর চুলকোয়। কান খাড়া করে আরতির ঘণ্টা শোনে। হঠাৎ বলে—আপনার টর্চ আছে?

—আছে একটা। আমার নয় সুকুলের। ছোট্ট টর্চ, তেমন জোরাল নয়।

—দিন তো। বলেই উঠে দাঁড়ায়।

—চললেন কোথায়?

—ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

—চিনতে পারবে না?

—না। অন্ধকার আছে। টর্চটা নিচু করে ফেলব।

—গলার স্বর?

নয়ন হেসে বলে—আমি হরবোলা।

লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয়। নয়ন কয়েকবার চারদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। বলে—চলবে।

ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে সুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি চলে যাচ্ছ?

—না সুকুল। ফিরব।

—কখন?

—তুমি একটু জেগে থাক। তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব।

—যদি না ফের?

নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে—তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি তো, এটা ফেরত দিতেও ফিরব।

—ফিরো কিন্তু। কাল থেকে ডাক শিখব।

আরতির ঘণ্টা এখনও বাজছে। মাঠটা কোণাকুণি দ্রুত পার হতে থাকে নয়ন। জোনাকি পোকার মতো আলো জ্বালে আর আলো নেভায়।

মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায়। কী সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ। যে-কোন নর্তকির চেয়ে নমনীয় তার শরীর—বেতের মত। কখনো পিছনে হেলে, কখনও সামনে ঝুঁকে নাচে। আলোয় দেখা যায়, মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহ্বল হাসি, চোখে জল, দৃষ্টি সম্মোহিতের মত মোহাচ্ছন্ন। তার প্রকাণ্ড ছায়া দেয়াল জুড়ে এক অপ্রাকৃত ছায়ার সঞ্চার করে। সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে! এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে সে। ধুনো আর গুগ্‌গুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। মন্দিরের বদ্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা! এ যেন এই জগৎ নয়।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা চোখের জল মোছে। শ্যামার হাত-পা আড়ষ্ট লাগে, পিপাসা পায়। তার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে। মনে হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতির ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে নাচতে, কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে। বিপুল কালীমূর্তির দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, লোল জিহ্বায় আলো পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে হিংস্রতা। ঘাম-তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বেয়ে। শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ অসাড় লাগে তার মন। মনে হয়, মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ঐ মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে, কথা বলবে।

আরতি শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে। তারপর অসাড় হয়ে গেল। মোনা ঠাকুরের রোজ আরতির শেষে ভর হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে! মা শব্দ করে কাঁদে। শ্যামার শরীরে ঘাম দেয়।

ঘোর ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। রওনা হতে হতে পৌনে আটা। রাস্তা অন্ধকার। গাঁয়ের লোকেরা

কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এল, তারপর তারা তিন জন। আর কেউ নেই। কেউ কথা বলতে পারছে না এখনও।

আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে বলে—এ যে ভীষণ অন্ধকার! কি করে যাবে?

মার এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরে নি যেন। মা কাঁদছে এখনও। ধরা গলায় বলে—ভয় কি! চল ঠিক চলে যাব।

—যেতে তো হবেই। কিন্তু এই অন্ধকারে খুব রিস্কি। বেলাবেলি চলে গেলে কোন ঝামেলা ছিল না।

—তোমার কেবল পিছু টান। কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে শান্তি নেই। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, সেখানে দু দণ্ড মনটাকে রাখতে হয়, ঘরের চিন্তা করলে কি চলে?

বাবা বিড় বিড় করে বলে—সাপখোপ কত কী আছে হয়ত।

তবু যেতেই হবে। বাবা শ্যামাকে ডেকে বলে—তোকে নিয়েই ভয়, আমরা দুনিয়ার বার। তুই মাঝখানে থাক, সামনে আমি পিছনে তোর মা। বলে বাবা গলা খাকারি দেয়। দু-তিনবার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে।

শ্যামা এই সময়েও ঐ কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে বলে—ও কি করছ?

দেশ-গাঁয়ে অন্ধকারে এভাবে শব্দ করে হাঁটতাম। জীবজন্তু সব শব্দ পেয়ে সরে যায়।

বাবা বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁটে। সামনের পথ খুবই আবছা। রাস্তা উঁচু-নিচু। বার বার পায়ে ঠক্কর লাগে। কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে—কি করে যাবে? হাঁটাই যাচ্ছে না।

—চল তো, যা হবার হবে। মা কালী আমাদের দেখবেন। মা ধমকে বলে।

তবু বাবা সাহস পায় না। সবাধানে হাঁটে। পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে।

নয়ন কি চলে গেছে! শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করে। ঝিঝির শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। এক-আধটা প্যাঁচার ডাক দূর থেকে শোনা যায়। ঐ কি নয়ন? কে জানে।

—এদিকে রাতে লোক চলাচল নেই দেখছি! বাবা চিন্তিত গলায় বলে।

মা ঝংকার দিয়ে বলে—তোমার অত ভয় থাকলে তুমি পিছনে এসো। আমি সামনে যাচ্ছি।

বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে—তুমি বড় সাহসী কিনা! মেয়েছেলের এগারো হাতে কাছা হয় না, বড় বড় কথা।

—তোমাদেরই কাছা দেওয়া উচিত নয়। ঘোমটা দাও। তখন থেকে কেবল চোর-ডাকাত সাপ-খোপের কথা বলে যাচ্ছ।

—তোমাদের আর কি? সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে। সব হ্যাপা সে সামলাবে। তোমাদের গা আলগা দিয়ে থাকলেই হল।

কথা বেশিদূর গড়াল না। সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল। তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড়। একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল। লক্ষ্য করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলে—বাবা, সামনে টর্চ, তাতে কেউ যাচ্ছে। দ্যাখো।

বাবাও দেখল। বলল—মনে হচ্ছে। তোরা পা চালিয়ে আয় তো!

মা ঝংকার দেয়—কী বুদ্ধি! যদি ছেলে-ছোকরা হয় তবে কি আমরা হেঁটে তাকে ধরতে পারব? ডাকো না লোকটাকে, দাঁড়াতে বল।

বাবা বিড় বিড় করে একবার বলে—কেমন লোক কে জানে! তারপরই গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে—ও মশাই, শুনছেন, এই যে—

সামনের বাতিটা থামে। একটা টর্চের মুখ চক্ চক্ করে ওঠে। তারা এগোয়।

লোকটাকে দেখা যায় না। টর্চটা নিচু করে ধরা। একটু মোটা ভাঙা গলায় লোকটা বলে—কিছু বলছিলেন আজ্ঞে?

বাবা বলে—কোন্ দিকে যাবেন? বড় রাস্তা পর্যন্ত?

—ওদিকেই।

—আমরাও যাব। অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি।

—চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। কোথায় এসেছিলেন, কল্পতরুর মন্দিরে নাকি?

—হ্যাঁ। বড় জাগ্রত দেবতা। যা দেখে গেলাম ভোলবার নয়। আপনি কি এদিককার লোক? বাবা জিজ্ঞেস করে।

—পাশের গাঁ। মোনা ঠাকুরকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

—কেমন লোক?

—কী আর বলি বলুন। তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব।

শ্যামা টর্চের আলোর আভায় প্রথমে প্যান্টের রঙটা চিনতে পারে।

তারপর হলুদ শার্টটার আভাস পায়। গায়ে কাঁটা দেয় তার। শীত করে। নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয়, কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার। কিন্তু বাবা মার সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপদজনক! যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন! হাত পা শিরশির করতে থাকে তার।

তারা হাঁটে। আগে নয়ন, তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ।

বাবা নানা কথা বলতে থাকে। নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়।

—এদিকের কোন ডেভেলপমেণ্ট হয় নি, না? বাবা বলে।

—কোন্ দিকটারই বা হয়েছে বলুন?

—রাস্তাঘাট কেমন এখানে?

—যেমন দেখছেন। এই সব রাস্তায় হেঁটেই আমরা বড় হলাম।

—বিপদ আপদ?

—সাপখোপ আছে।

—চোর ডাকাত?

—শুনি না তো বড় একটা।

বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে—চোর ডাকাত না থাক, অভাব তো আছে। অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল। সেই সব মানুষই রঙ পাল্টে চোর ডাকাত হয় কিনা! তা ছাড়া লাশ-ফেলা পলিটিক্স আছে। কাজেই ভয়-ভীতি এখন সর্বত্র।

—তা অবিশ্যি ঠিক; তবে এদিকে কখনও কিছু হয়নি। তবে হবে।

—কি করে বুঝলেন?

দেশের অবস্থা দেখে বুঝছি। শিগ্‌গিরই দেখবেন, এদিকেও লাশ পড়ছে।

শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে। কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ পায় শ্যামা। মনটা চন্‌চন্ করে ওঠে। ভাল লাগে। ঐ তো টর্চ হাতে নয়ন সামনে চলেছে। এখন আর কোন ভয় নেই। তারা ঠিক বাস-রাস্তায় পৌঁছে যাবে।

একটা আলু টপ্‌কে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ। তার মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত-বমি করতে করতে চোখের পটল ওল্টাবে। নয়ন সব জানে। তবে কিনা নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোন ঝগড়া নেই।

কিন্তু লেগে যাবে একদিন।

মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে। শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে। শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায়। কালীমূর্তি বাঙালীমাত্রেরই আজন্ম চেনা। সেই জিভ-বের করা আধ-ন্যাংটো নৃমুণ্ডমালিনী। কোন ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল, সেই সোনালী চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে, আর গায়ের ঘাম তেল! নয়নের কোন আগ্রহ ছিল না, কেবল— মাত্র মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূহলবশতঃ সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ফুল বেলপাতা ধুনো গুগ্‌গুল এসব গন্ধ তো আছেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক-দেড়শো বছরের ছায়ায় ঢাকা শ্যাওলা-পড়া সেতসেঁতে গন্ধ। মন্দিরের বারান্দাটা ঠাণ্ডা হিম। চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। নয়ন ঝুলন্ত ঘণ্টাটায় একবার টং শব্দ করে, তারপর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে। তালা দেওয়া। বারান্দার দিকে দু পাট ভারী, লোহার গুল মারা দরজা খোলা রয়েছে, সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুটো শিক দু হাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধো-অন্ধকার ঘরখানা দেখল। এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভাব হয়, দৈববাণীও হয় নাকি. কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম ম করে চারদিক। দুটো শিক দু হাতে চেপে নয়ন কালীর সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল একটুক্ষণ। এই চোখে প্রাণসঞ্চার হতে কেউ কেউ দেখেছে। নয়ন চেয়ে থাকে। আলো-আঁধারির ভিতর থেকে দু'খানা নিস্প্রাণ সোনার চোখও চেয়ে থাকে তার দিকে। কালীর গায়ে কিছু খাঁটি, নিরেট সোনার গয়না লক্ষ্য করে নয়ন। বিগ্রহের বেদী পুরোটা রূপো দিয়ে মোড়া। এই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের স্টেজ। সঠিক আলো গন্ধে শব্দে রহস্যময় আবহ, দর্শকরা নিরক্ষর গরীব ভবিষ্যৎ-ভীরু মানুষ, এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে। দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জল ফেলে। তবু মোনা ঠাকুরের ওপর কোন আক্রোশ ছিল না নয়নের। কারণ এ অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে। এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে। শ্যামা কোনদিনই পাত্তা দিল না তাকে। নয়ন সবই বোঝে। তবু ছাড়তে পারে না। শ্যামা তাকে ভালবাসে না হয়ত। তাকে নয়নের খুব বেশী কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজনের যুগ। কাউকে কাউকে কারও কারও প্রয়োজন হয় মাত্র। যেমন, নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে। যদি সারা

জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই ভাবে। শ্যামা আজ তার মা বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকরটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায়। সময়টা জানা ছিল না। তবু অনেক সকালেই সে জাতীয় সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গাঁয়ের হাটে অপেক্ষা করছিল। তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনী জেনে নেয়। শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে, ধানের রূপসী মুখে কনে দেখা আলো তখন। শ্যামাকে সে একবার দেখেছিল মাত্র, তারপরই ভীড়ে ডুব দেয়। কারণ শ্যামার বাবা মারা তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে। নয়ন জানত, শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে। সেটা দীর্ঘ পথ। নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল, মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট পথ আছে। ভাঙা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায়। খানিকটা তাড়ি গিলেছিল সে তারপর। যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো, ঠিক মনে নেই, আবছা মনে পড়ে একটা ভাঙা বিপজ্জনক সাঁকো বুক হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভিতর একটা ভাঙা বাড়িতে শ্যামার পথ চেয়েছিল সে। পেয়েও ছিল শ্যামাকে। কি সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেছিল যে! শ্যামার বাবা মা একটু এগিয়ে গেছে তখন, আর শ্যামা পোড়ো বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল। সে সময়ে নয়ন তাকে আক্রমণ করে। উল্টোপাল্টা কী সব বলেছিল যেন, বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সবটাই তাড়ির ঘোরে। নইলে অতটা যেন হয়ত করত না। ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাতে ধরে, অন্যহাতে একটা জীবন্ত গোখরো সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়েছিল। ছেলেটা চীৎকার করে ওঠায় তার ঐ উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল।

নয়নের একটা দোষ এই যে কোন একটা ব্যাপারে তার মন বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তার মনটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচবোর্ডের মত। মুহুর্মুহু লাইন পাল্টে কানেকশন্ নেয়। লোকটার হাতে ঐ সাপ দেখে

সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয়।

এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না। শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল। শ্যামার বাবা মা টের পায়নি যে নয়ন এতদূর এসেছিল। সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার। নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্ত।

কালীর সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীর ভাবে শ্বাস নিল। দেড়শো বছরের পুরোনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক। তাড়ির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। টলমল করছে মাথা। ঠিকমত চিন্তা শক্তি এখনও ফিরে আসছে না। হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল। অবিকল তিতিরের মত। তারপর পুরোনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারন্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা। অন্ধকার চারদিক। মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। সে শুনেছে আরতির পর ঐ ঘরে একটা ধর্মসভা হয়। গাঁয়ের চাষীরা আসে, সাধারণ মানুষেরা আসে, বুড়ো-বৌ-বাচ্চারা ঘিরে বসে। মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায়। শ্যামারা এখানে কেন এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন। তবে আন্দাজ করতে পারে, শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। বহুকাল ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ঐ একটা দুঃখ, বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই। রঙটাই যা ময়লা শ্যামার, নইলে শ্যামার চটক আছে। ঐ কালো রঙ উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল। তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামার নেই। সর্বোপরি রাহুর মত নয়ন লেগে আছে পিছনে। শ্যামাকে নিয়েও ওদের ভয় কম নয়। কে যেন কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে যায়! সেই সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা জানাও ওদের দরকার। সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা।

মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিক বুঝতে পারে না নয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অনেক, প্রতিদিনই এক-আধজন বেড়ে যায়। মন্দিরের ঘণ্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্যমনস্ক ভাবে। মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে—কে?

নয়ন উত্তর দেয় না, লোকটা এগিয়ে আসে, জবুথবু বুড়ো একটা লোক। হেমন্তের শীতেই মাথা-মুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে। কুঁজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে—কে আজ্ঞে?

—কেউ না। মন্দির দেখতে এসেছি। আমাকে চিনবেন না।

লোকটা গলার কফের শব্দ করে বলে—এত রাতে কোথা থেকে এলেন আজ্ঞে?

—যেখান থেকেই আসি না, আপনার কি?

লোকটা স্তম্ভিত এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়ন একটা সিগারেট ধরায়, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে। নয়ন লোকটার মুখ দেখে। সর্বভারতীয় মুখ একখানা, পথে-ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে একরকম একই রকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে। এসব মানুষকে একজনের থেকে আর একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে—দেখুন আজ্ঞে। মন্দির দেখতে বাধা কি? মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে, নয়ন ভরে দেখে নিন। তবে কিনা দিনকাল খারাপ?

নয়ন ঝেঁঝেঁ উঠে বলে—কিসের খারাপ?

লোকটা নরম সুরেই বলে—গাঁয়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু ধন্ধ লাগে। ছেলে-ছোকরারাও সজাগ। গাঁ চৌকী দেয়। আপনি নতুন নাকি আজ্ঞে? কলকাতার লোক?

—তা দিয়ে আপনার কি?

—জিজ্ঞেস করি আর কি! এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি। অচেনা জায়গা।

নয়ন একটু হাসে—তা মায়ের স্থান যখন ভয় কি?

লোকটা কিছু বলে না। চেয়ে থাকে একটু। তারপর বলে—ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন। যদি যেতে চান তো চলে আসুন।

চকিত একটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মত নিঃশব্দে মাঠে নামে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—ঠাকুর কে?

—মোনা ঠাকুর আজ্ঞে আর কে হবেন! মনোময় দেবশর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পূজারী। ওঁর ঠাকুর্দা নরবলি দিতেন। দু'হাতের দশ আঙুলে ওঁদের যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন। নাম শোনেন নি?

তাড়ির নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে। নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক। দিল না। কেবল একটু হাসল। অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ

ছিল না। এরা যা একবার বোঝে তা সহজে ভোলে না। সে শুধু বলল—মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বশীকরণ করবে না তো?

—কি বললেন?

—বলি ভেড়া বানিয়ে রাখবে না তো?

লোকটা হাসে—ঠাকুর কত কী করে তার আমরা কী জানি! তবে ভয় পাই না। উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় একটা। ক্ষতিও করেন না।

—আপনি যান। আমি সময় হলে যাব।

লোকটা বিনীত ভাবে বলে—রাতে ঘণ্টার শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায়। মায়ের শয়ন হয়ে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। লোকটা তেমনি কোলকুঁজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন হাতে।

পকেট থেকে সুকুলের দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশামাখা অন্ধকারে এধারে ওধারে ফেলে নয়ন। মন্দিরের ওপাশে একটা পুরোনো সুড়ঙ্গ আছে। বেশীদূর যাওয়া যায় না। রাস্তা বুজে গেছে। প্রাচীন কালে মানুষেরা সুড়ঙ্গ তৈরী করত। সব প্রাচীন সুড়ঙ্গই বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। নয়ন তা জানে। একটা আলু টপ্‌কালে কোথায় যাবে মোনা ঠাকুর!

কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোন রাগ নেই তার। বলতে কী একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে একপলকের জন্য শ্যামার দেহের স্বাদ পেয়েছিল সে। অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত তাকে লড়তেই হবে। ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ। মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ, মসজিদ-গীর্জা ভেঙে তৈরী হবে ক্ষেত। তাতে সোনার ধানে ঢেউ খেলবে, কিংবা তৈরী হবে শিশুদের জন্য বাগান, যুবক-যুবতীদের মিলন ক্ষেত্র। কী যে হবে তা নয়ন জানে না। কিছু একটা হবেই। হয়ত সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না।

নয়ন বারান্দাটায় আবার ওঠে। উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয়। তার আজকাল কেন যেন মনে হয়, আর খুব বেশীদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

উত্তুরে একটা বাতাস এল হঠাৎ। নয়নের শীত করে ওঠে। সে জবুথবু হয়ে বসে। চারদিকের নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে। আর শ্যামার কথা

ভাবে। কালো, সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা, এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল।

থুতু ফেলে নয়ন উঠল। গায়ের পাতলা শার্টটা ভেদ করে বাতাস লাগছে। শ্যামার পিছু পিছু ফিরে যায় নি নয়ন। যায় নি ঐ সাপওলা লোকটার জন্য, হয়ত মোনা ঠাকুরের জন্যও। শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন, চিন্তা নেই। আপাতত মোনা ঠাকুর আর সাপওলা লোকটার রহস্য ভেদ করে যাওয়াটাই তার কাছে দরকার।

মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝক্‌ঝকে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন লোক এধার ওধার বসে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মোনা ঠাকুর। তেমন কিছু চেহারা নয়। শরীরটা মেদহীন ঝরঝরে, গায়ের রঙ তামাটে, শুধু চোখ খুব উজ্বল। খালি গায়ে একদা সাদা উড়ুনী মাত্র জড়ান। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই।

নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকাল, সেই তাকানোর মধ্যে কোন বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে, সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না। কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বুড়োটা এসে বোধ হয় তার কথা আগে ভাগে বলে রেখেছে।

—আসতে পারি? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মোনা ঠাকুর শুধু ঘাড় নাড়ল। উত্তর দিল না।

নয়ন ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার তাকায়। তার ভাবভঙ্গী সহজ এবং উদ্ধত। এই লোকগুলোর চেয়ে যে সব বিষয়ে উন্নত, এরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তোলে। চারদিকে কয়েকটা ছোট পাটির আসন পাতা। সে একটু পিছনের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘরে কোন কথা নেই। সবাই চুপ। যেন তার উপস্থিতিই ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। কেউ কথা বলছে না, সবাই অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেন এক্ষুণি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন, কিছু অদ্ভুত কথা বলবে। সবাই তাই অপেক্ষা করছে।

মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল। ততক্ষণ কেউ কথা বলল না। নয়ন দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে চেয়ে আছে। আক্রমণ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারে, কিন্তু মুড নেই। আপাতত, সে কেবল দেখে নিচ্ছে। হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের

প্রধান মানুষ। কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব। হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, সাপের বিষ নামান, মারণ বশীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ। সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ। কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে।

এরকম কোন মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ার গুণ্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে কোন লাইনেই কেউ প্রধান হয়েছে শুনলে নয়নের ভিতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে, এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না।

বিড়িটা শেষ করে মোনা ঠাকুর তার দিকে তাকায়। নয়ন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি তাকিয়ে মোনা ঠাকুর নরম গলায় জিজ্ঞেস করে—বাবুমশাই, জায়গাটা কেমন লাগল?

নয়ন ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল—খারাপ কি?

—এদিকে কি কদিন থাকার ইচ্ছে?

—থাকতে পারি। ঠিক নেই।

—জায়গাটা ভালই। তবে কিনা আপনারা শহর-গঞ্জের মানুষ।

—আমি শহর-গঞ্জের মানুষ একথা কে বলল?

—নন?

নয়ন একটু হেসে বলে—না। আমি সব জায়গায় মানুষ। গ্রামেরও।

মোনা ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে—আসলে গাঁ আর শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন। কোন্ ঠাঁইয়ে তার বাস তা থেকে বিচার হয় না। তা এখানে উঠেছেন কোথায়?

—সাপওলা একটা লোক আছে, তার বাড়িতে রাতটা থাকব।

সাপওলা লোক শুনে আবার সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে।

মোনা ঠাকুরের মুখে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, সাধারণ গলায় বলে—সাপওলা লোক তো একমাত্র জগদীশ। তা তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে না কি?

—থাকলেই কি?

—কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম। মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস। তাহলে আপনি তার আত্মীয় নন?

নয়ন দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল—না। আমি একটা

মেয়ের পিছু নিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। পথে সাপওলা জগদীশের সঙ্গে আলাপ।

মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু-একজন তার দিকে তাকাল। মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনই ভাবলেশহীন। নয়ন গ্রাহ্য করল না।

—থাকবেন?

—দেখি। আমার কিছু ঠিক নেই।

মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে। নয়নের দিকে চেয়ে বলে—সে আমাকে দেখতে পারে না।

—কে?

—জগদীশ।

নয়ন চুপ করে থাকে।

মোনা ঠাকুর নিজেই বলে—জগদীশ এ গাঁয়ে আসে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে। তোমার মনে আছে হরিপদ, সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাঁজর ভেঙেছিল?

লণ্ঠনওলা লোকটা বোধহয় আফিং খায়। উড়নী জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিজের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের ঘড়্‌ঘড়ে একটা শব্দ করল মাত্র।

মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে—জগদীশ বড় কালীভক্ত ছিল। মায়ের থানে রোজ আসত। আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালী-টালী কিছু জানি না। আমি গুরু জানি। আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো। সে তখন উল্টে বলল—তাহলে আপনি ভণ্ড, কালী মানেন না তো পুজো করেন কেন? আমি উল্টে বললাম—তো রামকৃষ্ণদেব পুজো করত কেন? বেদান্ত মানলে তো মূর্তি পুজো চলে না! রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালী নয় গো, সে হচ্ছে গুরু। ঠাকুর নিজেই বলেছেন—মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বে না হয়। সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা। তা বাবুমশাই, বলেন তো কোন্‌টা ঠিক! এই মূর্তিপুজো না গুরুপুজো?

নয়ন ঠিকমত শুনছিল না। শুধু বলল—কে জানে! মানুষের কত বাতিক থাকে?

—আপনি গুরু মানেন না?

—না!

মোনা ঠাকুর একটু, খুব সামান্য মাত্র, একপর্দা উত্তেজিত গলায় বলে—আপনি কখনও কারও কাছ থেকে কিছু শেখেন নি? এমন কি অ-আ-ক-খও নয়?

নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে—শিখব না কেন?

—তবে?

—তবে কি? কারও কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় না কি?

—না মানলে হয় না, মানলে হয়।

—তাহলে তো আমার গুরু অনেক। যার কাছে যা শিখেছি, সবাই গুরু!

তাই তো। আপনার চেয়ে যার জ্ঞান-গুণের ওজন বেশী সে-ই গুরু। ওজনওলা লোক চাই। যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু। আপনার গুরুদের মধ্যে কার ওজন সবচেয়ে বেশী বাবুমশাই?

নয়ন একটু হাসে! তারপর বলে—কার্লমার্কস্।

মোনা ঠাকুর একটুও চমকায় না। বলে—তো সে-ই আপনার সবচেয়ে বড় গুরু।

—আপনি মূর্তি মানেন না? তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালীমূর্তি নড়ে-চড়ে, কথা কয়?

মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয়। নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—বাবুমশাই, মেয়েটা কে?

নয়ন উদাস গলায় বলে—ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শুনে লোকজন নড়ে চড়ে বসে। লণ্ঠনওলা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায়।

মোনা ঠাকুর ঠাণ্ডা গলাতে বলে—ও, তারপর একটু চুপ থাকে, তারপর ধীরে বলে—একটা মেয়ে তার বাপ মার সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে। শ্যামলা রঙ, মুখে-চোখে শ্রী আছে। সে-ই কি?

—সে-ই। ওরা আপনাকে কি বলেছে?

মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ঐ মেয়েটার বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সে বছর পাঁচেক ধরে নিরুদ্দেশ। মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায়, তারপর বলে—এমনিতে

তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল। বুড়ো-বুড়ি, একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে, ঝুট-ঝামেলা কিছু নেই। তবু একটা গাঁট পড়ে গেল। ভারী দুঃখ ওদের।

নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে—শুধু ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করল? আর কিছু না?

মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, বলে,—আর তো মনে পড়ছে না। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ, তারপর বলে—তা পাত্রী তো ভালই বাবুমশাই। লেগে যান।

বিদ্রূপটা ধরতে কষ্ট হয় না তার। ভিতরটায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে। স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে—আমাদের বিয়ে কোন শালা আটকাতে পারবে না।

মোনা ঠাকুর একটু নরম, যেন বা সান্ত্বনার সুরে বলে—আটকানোর কি। করবেন বিয়ে। গরীব-গুর্বো, কুঠে-ভিখিরিও বিয়ে করে। ও আর এমন কি? করলেই হয়।

—তার মানে?

—বললাম বিয়ে তো আখছারই হয়। অঘোন পড়ল তো শানাই ধরল পোঁ। কান ঝালাপালা, বিয়ের মাসে এই মায়ের থানেই কত নতুন বর-বৌ আসে। বিয়ে সবাই করতে পারে। কলকাতার ফুটপাতে ভিখিরিদের বিয়ে দেখেন নি?

নয়নের ভ্রূ কুঁচকে আসে, ভ্রূর তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে—বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না সেটাই সমস্যা।

—আপনার বাধা কি?

—আমরা তেলী, ওরা বামুন। ওর বাবা মা এ বিয়ে চাইছে না।

মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে—আর মেয়েটা?

—সে-ও চাইছে না। কিন্তু জাতের জন্য নয়, বাবা মার জন্য। কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে।

—তাহলে?

—তাহলেও কিছু যায়-আসে না। আমি ওকে জোর করে কেড়ে

আনব। কোন শালা কিছু করতে পারবে না।

—কে কি করবে বাবুমশাই?

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল—ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলে নি?

—কি বলবে?

—আমার কথা? বলে নি যে নয়ন নামে একটা লক্কড় ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মত ঘোরে? বলে নি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারে না?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে—না।

নয়ন একটু হাসে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আপনি বাণ মারতে পারেন?

মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চোখে চায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে—ওসব আমি জানি না।

নয়ন অবাক গলায় বলে—জানেন না? কিন্তু লোকে বলে, আপনার বিজনেস-ই হচ্ছে বাণ মারা। সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোরা বসিয়ে দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে, হাত পা ছুঁড়ে দাপিয়ে মরে যায়? ওরা আপনাকে বলে নি নয়ন রায়কে বাণ মারতে হবে?

মোনা ঠাকুর দুঃখিত মুখ করে বলে—না বাবুমশাই।

নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে—যাক, বাঁচা গেল।

মোনা ঠাকুর তার দিকে মিট মিট করে চেয়ে থেকে বলে—বাণ মারার চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবুমশাই?

নয়ন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে—ভীষণ।

—আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।

—কি মনে হয় না?

—যে আপনার ভয়-ডর আছে।

নয়ন একটু হাসে। তারপর শান্ত বিদ্রূপের গলায় বলে—আপনি তো ছবিতে বাণ মারেন! কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারের মানুষটাকেই বাণ মারে, সামনা-সামনি। আপনার বাণের চেয়ে এই বাণ আরও বিপজ্জনক। দেখবেন? বলে নয়ন তার শার্টটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে। তারপর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু-আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায়। কয়েকজন লণ্ঠন তুলে ঝুঁকে পড়ে। দেখে। মোনা ঠাকুর উদাস মুখে বসে থাকে।

বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে দাগটা দেখে মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বলে—কি হয়েছিল?

—স্ট্যাব্। ঠাণ্ডা গলায় বলে নয়ন।

—জোর বেঁচে গেছেন, ছোরাটা ঠিকমত টানতে পারে নি। পারলে বাঁচতেন না।

মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বলে—যারা আমাকে হিন্দু হোস্টেলের পাশের গলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভাল বাণ মারতে পারে। তাদের বাণে ভুলচুক হয় না। কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বাণ মারার সুযোগ খুঁজছে। ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর।

মোনা ঠাকুর উত্তর দেয় না। চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক হাতে হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিলটা খোঁজে। নয়ন তার চারদিকে চায়। লণ্ঠনওলা বুড়োর ঝিমুনি পুরোপুরি কেটে গেছে, হাঁ করে চেয়ে আছে নয়নের দিকে, গলায় অবিরল কফের শব্দ হচ্ছে ঘড়্ ঘড়্। একজন প্রৌঢ় মানুষ নস্যি রঙের খদ্দরের চাদর গায়ে সামনে বসে আছে, কালো হাতে সাদা একটা ঘড়ি, চোখে চশমা, বোগহা গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, নাড়ুগোপালের মত থল্‌থলে মুখ। লোকটা মোনা ঠাকুরের দিক থেকে ইতিমধ্যেই অর্ধেক ঘুরে বসেছে নয়নের দিকে। মুখে একটা বিস্মিত বোকা হাসি। চল্লিশ বছরের ধূর্ত চেহারার লোকটা নিশ্চিত পঞ্চায়েতের লোক, রোগা রোগা হাত-পা, মাথার চুলে প্রচুর তেল, গায়ে বিয়ের শালটা আধময়লা ধুতির ওপর বেমানান। লোকটা অনেকখানি ঘেঁষে নয়নের কাছাকাছি এসে গেছে। তার চোখে-মুখে চঞ্চল কৌতূহল। মোনা ঠাকুরের বাঁ ধারে আরও দুজন লোক বসে আছে। তারা চাষীবাসী শ্রেণীর, ভাবলেশহীন এবড়ো-খেবড়ো মুখ। চোখে নির্বুদ্ধিতার নিষ্প্রভতা। তারা নয়ন আর মোনা ঠাকুরের চাপান-ওতরটা ঠিকমত বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। ছুরি-ছোরার কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে চেয়ে দেখছে নয়নকে। খুন-খারাপী যে তারা কিছু না দেখেছে এমন নয়, তবে নয়নের চোটপাটের কথাবার্তা যে তারা পছন্দ করছে তা তাদের মুখে সম্ভ্রমের ভাব দেখেই বোঝা যায়। মোনা ঠাকুরের ডান ধারে পুঁটুলির মত তিন-চার জন মেয়েছেলে। তাদের রি-অ্যাকশন নয়ন এই অল্প আলোতে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা ঠিক, মোনা ঠাকুরের দিক থেকে সকলের মনোযোগ নিজের দিকে এনে ফেলেছে। সেটা পেরেছে

বলে একটু তৃপ্তি বোধ করে নয়ন। এখন ইচ্ছে করলেই সে মোনা ঠাকুরের আসনটিকে একটি ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু তা দেবে না নয়ন। সময়ের অপেক্ষা করা ভাল। তাছাড়া, মোনা ঠাকুরের ওপর নয়নের যথেষ্ট রাগ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মোনা ঠাকুর একটা শ্বাস ফেলে। নয়নের দিকে চায়। তারপর জিজ্ঞেস করে—আপনার কি অনেক শত্রু?

নয়ন আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে—অনেক।

—কেন বাবুমশাই?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন হঠাৎ বলে—আপনি আমাকে বাবুমশাই-বাবুমশাই বলছেন কেন?

—শহরের মানুষ আপনারা, সয়-সম্মান করা ভাল।

—শহরের মানুষ কি আলাদা কিছু? আমি শহর-গ্রাম আলাদা করে বুঝি না। এই যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেমন, আমিও তেমনি।

—তাই কি হয়। জায়গা বুঝে আমরা মানুষ চিনি।

—শহরের মানুষকে আপনারা বেশী সম্মান করেন কেন?

—তারা যে তাই চায়। গাঁয়ের লোকরা তাদের সমকক্ষ তো নয়।

—ওটা ছেঁদো কথা। আসলে আপনারা নিজেদের খাটো ভাবেন।

—তা হোক বাবুমশাই, তা হোক। লোককে শ্রদ্ধা-সম্মান করার শিক্ষা ভালই। ওতে ক্ষতি হয় না।

নয়ন ধরতে পারে কথাটার দ্বিতীয় অর্থ আছে, যা তাকেই বলা। নয়ন গায়ে মাখল না। কেবল বলল—আমার শত্রুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

—আজ্ঞে।

—ঐ যে যেমন আমি ঐ মেয়েটাকেই চাই বলে ওর মা-বাপ আমার শত্রু, তেমন আমি আরও অনেক কিছু চাই বলে আরও অনেকে আমার শত্রু।

মোনা ঠাকুর চুপ করে বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি খাওয়ার একটা নিজস্ব ধরন আছে তার। যেন ধোঁয়া তার বুক পর্যন্ত পৌঁছয় না, গলা থেকেই ফিরে আসে। দু'একবার ছোট্ট টান দিয়ে বলে—মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক। মা হয়ে, বৌ হয়ে, মেয়ে হয়ে কত খেলা যে দেখায়। পুরুষের জান লবেজান। তা মেয়েমানুষ বাদে আপনি আর কি চান?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—মেয়েমানুষ চাই বটে, তবে ঐ মেয়েটিকেও চাই। ওকে না পেলে আমার ক্ষিদে মিটবে না।

কথাটার নির্লজ্জতা সবাইকেই স্পর্শ করে। এই নির্লজ্জতারও একটা স্বীকারোক্তির মত আকুলতা আছে। এর সাহস সবাইকে আকর্ষণও করে। ল্যাংটো কথার জোর বেশী।

নয়ন বলে—আর যা চাই তা হচ্ছে ক্ষমতা মোনা ঠাকুর। এই জায়গায় আপনার যেমন ক্ষমতা, দেশ জুড়ে তেমনি ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা পেলে কী করব তার কি কোন ঠিক আছে? তবে হয়ত আপনাকে এবং আপনার মত লোকদের উচ্ছেদ করব। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভেঙে তৈরী করব রাস্তা, ক্ষেত, শিশুদের জন্য বাগান। বড়লোকদের ধরে চাবকাব তারা বড়লোক বলে, গরীবদের ধরে চাবকাব তারা গরীব বলে। অলস আর চোরদের তাড়িয়ে দেব। কত কী প্ল্যান আছে আমার! দেখবেন।

মোনা ঠাকুর একটু হেসে বলে—মেয়েমানুষদের ধরে চাবকাবেন তারা মেয়েমানুষ বলে আর পুরুষদের তারা পুরুষ বলে।

—তা কেন? আমি কি পাগল? মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটো দুরকম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সেটা তাদের দোষ নয়।

—তো গরীব বা বড়লোক হওয়াটা কি দোষের?

—নিশ্চয়ই। যে বড়লোক সে পাঁচজনেরটা একা ভোগ করে বলে দোষী, যে গরীব সে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে না বলে দোষী।

এটা যুক্তি নয়, নয়ন জানে। কিন্তু কুযুক্তির মধ্যেও জোর প্রকাশ করাটা তার স্বভাব। তাতে কাজ হয়।

সবাই চুপচাপ তার দিকে চেয়ে আছে। আত্মতৃপ্তিতে তার ভিতরটা টল্ টল্ করে। নয়ন বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। হেডমাস্টার আর গ্রাম-পঞ্চায়েতের লোক দুজন কথা বলছে গুণ গুণ করে। লণ্ঠনওলা বুড়ো স্খলিত চাদরটা দিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বাইরে অবিরল ঝিঁঝির ডাক। দূরে একঝাঁক শেয়াল চীৎকার করে। কুকুর কাঁদে। জ্যোৎস্না ফুটেছে নাকি! কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্নার দৃশ্য নয়নের বড় প্রিয়! মলিন পৃথিবীর গায়ে কে ছবি এঁকে দেয়! অলৌকিক ছবি।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল নয়ন। ঠিক সেই সময়ে সে মেয়েটিকে দেখল। ভিতরের দরজায় কপাটের আড়ালে ছায়ায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

বিকেলেও দেখেছিল, শ্যামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের মাঠে। মোনা ঠাকুরের মেয়ে। মুখ চোখ খারাপ না। শরীরটাও ভালই। ভোগের চাল-কলা খেয়ে দিব্যি আছে। এমনিতে মেয়েটির প্রতি নয়নের কোন আকর্ষণ বোধ করার কথা নয়। কিন্তু শ্যামা ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে, তার নাগালের বাইরে, এই চিন্তাটা তার ভিতরে একটা আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। শোধ নিতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ ক্ষিদে জেগে ওঠে। এই মেয়েটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে এক ধরনের তৃপ্তিকর অবসাদ আসত তার। ভিতরটা তার কখনও জুড়ায় না। কখনও না। কেবল যখনই সে কোন মেয়েকে আক্রমণ করে, উন্মোচন করে ফেলে তার সবকিছু, নিংড়ে নেয় দেহ, কেবল তখনই একটা অবসাদের প্রলেপ পড়ে ভিতরটায়। নইলে সে জ্বলছে, জ্বলছে।

কপাটের ছায়া থেকে মেয়েটির চোখ তারই চোখে পড়ে আছে। সে তা স্পষ্ট অনুভব করে। নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকে। হেডমাস্টার একবার গলা খাঁকারি দেয়, পঞ্চায়েতের লোক নড়ে চড়ে নয়নের আরও কাছে আসে, নয়ন সে সব খেয়ালই করে না। তাকিয়ে থাকে।

মোনা ঠাকুর হয়ত নয়নকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করেই অনুচ্চস্বরে বলে—কপাটের আড়ালে কে রে? তারা?

মেয়েটি আলোর মধ্যে আসে। হাতে চাবি। বলে—বাবা মন্দিরের কপাটে তালা দেব?

—দে। উদাস গলায় বলে মোনা ঠাকুর।

পরনে পুজোর খাটো কাপড়, খোলা এলো চুল, মাজা পরিষ্কার শরীর, সতেজ দাঁত। সাজগোজ নেই বলে মেয়েটার সুস্বাদ শরীর তাকে আরও আকর্ষণ করে। তক্ষুণি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নয়ন, হাত-পা নিশপিশ করতে থাকে তার। দাঁতে দাঁত চাপে সে। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে মেয়েটা এক ঝলক চোখ তাকে দিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতের মত মেয়ের পিছু নেওয়ার জন্য নয়ন উঠে দাঁড়ায়। সে ইঙ্গিত বোঝে, সে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে।

—দাদা কি চললেন? বলতে বলতে পঞ্চায়েতের লোকটা তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, বলে—আমিও জগদীশের বাড়ির দিকেই থাকি, কুমোরপাড়া, চলুন এগিয়ে দিই।

—আমার সঙ্গী দরকার হয় না।

—দু চারটে কথাও বলবখন, চলুন না।

—শুয়োরের বাচ্চা'। মনে মনে গাল দিল নয়ন। তার ভিতরটা ঝিমিয়ে

এল।

বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে ঠিকই। কুয়াশার পাতলা আবরণ চারদিকে একমাত্র এই হেমন্তেই এরকম অপার্থিব ব্যাপারটা দেখা যায়। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে মোনা ঠাকুরকে বলে—চলি।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে—বাবুমশাই, আর্জ সারা বিকেল এ অঞ্চলে খুব কোকিল ডেকেছে, তিতির পাখী ডেকেছে, আরও কত কী পাখী! পাখীর ভাষা যারা বোঝে তারা জানে ওসব আসল পাখী নয়। নকল।

নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে—আপনি পাখীর ভাষা জানেন?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। মুখে বলে—কিন্তু কেউ কেউ জানে।

লোকজন একটু অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল, সেই হেডমাস্টার লোকটা বলে উঠল—বাস্তবিক ঠাকুরমশাই, আজ কোকিলের ডাক খুব শুনেছি বটে। এ সময়ে এত ডাকে না তো!

নয়ন বা মোনা ঠাকুর কেউ কোন উত্তর দিল না লোকটার কথায়। কেবল নয়ন বলল—মোনা ঠাকুর, মনে হচ্ছে আপনি পাখীর ভাষা জানেন। নইলে ওটা যে নকল ডাক তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি।

মোনা ঠাকুর চুপ করে থাকে।

নয়ন হঠাৎ বলল—কিন্তু মোনা ঠাকুর, মানুষের মনের কথা যখন পাখীর ডাক হয়ে যায় তখন সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ঐ নকল ডাকেও কিছু কথা বলা ছিল।

মাঠের রাস্তাটা মন্দির ঘুরে নাবালে নেমে গেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। অক্ষম আক্রোশে দৃশ্যটা দেখলে নয়ন। এমন নির্জনে, একাকী ব্যাধ ও হরিণ। পঞ্চায়েতের লোকটা ভালুকের মত তার গায়ে গা ঘষড়াচ্ছে। কিছু বলছে। নয়ন শুনছে না। মেয়েটার পা সিঁড়িতে ধীর হয়ে এল। শেষ দুটো সিঁড়িতে দুটো পা রেখে মেয়েটা জ্যোৎস্নায় চেয়ে আছে তার দিকে। তারই দিকে! এসব সময়ে কোন ভাষা ব্যবহারের দরকার হয় না, শরীরই তো কথা, শরীর -গন্ধে শরীর চলে আসে কাছে। বৃথা তখন ভাষার ব্যবহার। নয়ন জ্বলে। হাত মুঠো পাকায়।

পঞ্চায়েতের লোকটা বলে—বুঝলেন?

মাঠ ঘুরে তারা নাবালে নেমেছে। মেঠো পথে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে সামলে নয়ন জিজ্ঞেস করে—কি?

—লোকটা সিদ্ধ পুরুষ।

—কে?

—মোনা ঠাকুর।

—ও।

—তবে ওঁর ঠাকুর্দার আরও ক্ষমতা ছিল। শুনেছি তাঁর চোখের দিকে তাকান যেত না।

—ও।

—জগদীশের সঙ্গে আপনার আগে চেনাশুনা ছিল না?

—না।

—লোকটা বড্ড গোঁয়ার।

নয়ন চুপ করে থাকে। হুঁ-হাঁ কিছুই করে না। তবু লোকটা বলে—কি হয়েছিল জানেন? জগদীশ এসেছিল এক সার্কাসওলার সঙ্গে। খেলা-টেলা দেখাত না বড় একটা, বাঘ-সিংহীকে খাবার দিত। একদিন খাবার দিতে গিয়ে সিংহ ক্ষেপে থাবা মারে। পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল আট-ন মাস। সেই সময়ে তার খুব দেখাশোনা করেছিল হারাধন বারিক। জগদীশকে সেই-ই তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি, নগদ টাকা এসব পেয়ে বিয়ে করে এই গাঁয়েই জমে গেল জগদীশ। বিয়ের সাত মাস বাদে তার ছেলে হল, বুঝলেন? বলে লোকটা খিক খিক করে একটু হাসে।

অন্যমনস্ক নয়ন বলে—বুঝেছি।

—কি বুঝলেন?

—বিয়ের পর জগদীশের ছেলে হল তো! সকলেরই হয়।

—দূর মশাই! ছেলে ঠিক সময়ে হলে তো দশ মাস লাগার কথা। এতো হল সাত মাসে। কিছু বুঝলেন না! আরও দেখুন, জগদীশের চালচুলো নেই, ভিনদেশী, কেউ চেনেও না তাকে, তবু হারাধনদা তার সঙ্গেই বিয়ে দিল কেন! দু'হাজার নগদ, দশ বিঘে জমিও তো সোজা কথা নয়! গাঁয়েও সুপাত্রের অভাব ছিল না। সব যোগাযোগ করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝে যাবেন।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! অপার্থিব ছবি মলিন পৃথিবীর গায়ে। এই সময়ে কোন আবর্জনা চোখে পড়ে না নয়নের। সে মুগ্ধ এবং সম্মোহিতের মত হাঁটতে হাঁটতে বলে—ও।

—হারাধনদার মেয়েটা ছেলের জন্ম দিয়েই মরে গেল। বেঁচেই গেল বলা যায়। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে পাড়াগাঁ দেশে বিস্তর কথা শুনতে হত তাকে।

—হুঁ।

লোকটা খিক্ খিক্ করে একটু হেসে বলে—কিন্তু জগদীশের বিশ্বাস ঐ ছেলে তারই। বুকের পাঁজর করে রেখেছে। ছেলের কোষ্ঠী করতে এসেছিল মোনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই কোষ্ঠী করলেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপের নাম কোষ্ঠীতে লিখলেন না। জগদীশের সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের ঝগড়া তখন থেকেই। জগদীশ বলে, আমিই ওর বাপ। মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, এর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। বুঝলেন মশাই, আমাদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোলে তা আন-কথা কান-কথা, লোকে দোষ ধরে, বলে কুচ্ছো গাইছি। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের কথা তো আর ফেলবার নয়! ও তো বাকসিদ্ধের কথা। মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল। গাঁয়ে রটে গেল সব ব্যাপার-স্যাপার, যারা বিশ্বাস করত না তারাও বিশ্বাস করতে লাগল। জগদীশ সেই থেকে নিজে নিজে একঘরে। পাছে ছেলের কানে কথাটা যায় সেই ভয়ে সে কারও সঙ্গে মেশে না, কারও বাড়ি যায় না, শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না। চাষ-বাস করে, বাগান করে, বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। বলে—আমিই গাঁয়ের লোকদের একঘরে করে দিয়েছি। বুঝুন আস্পদ্দা!

গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার আঁকিবুকি। কোন গেরস্তর উঠোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। এ দেশের কুকুরগুলো পর্যন্ত কাজের নয়—ভাবল নয়ন। মানুষগুলোর মতই অপদার্থ। উল্টাবাগে দুটো লোক হেঁটে আসছে, একজন বলে—কে, দিগিন নাকি?

—হয়।

—কাল তো সাক্ষী দিতে সদরে যাচ্ছ!

—যাব।

—আমার ফর্মটা এনো। সঙ্গে কে?

—আনব। ইনি জগদীশের বাড়ি এসেছেন।

লোকটা দাঁড়িয়ে যায়—কোন্ জগদীশ? সাপওলা?

—হুঁ।

—তার আবার কে এল? তিন কুলে তো তার.....

লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে তারা হেঁটে যায়। একটা ভেজা উদ্ভিদের গন্ধ উঠে আসছে আশপাশ থেকে। হাওয়া ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। এদিকটায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। খেজুর গাছের গলায় কলসী। পায়ের পাতা ঘাসে পড়লে টপ্ টপ্ জল ঝরছে ঘাসের গা বেয়ে শুকনো পাতা খসছে গাছের। শীতে নাকে জল সরছে। নয়ন দুটো হাত বুকে চেপে ধরে।

—আপনার কথাগুলি কিন্তু বেশ পষ্ট পষ্ট।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে—মশাই কি পলিটিক্স টলিটিক্স করেন না কি?

—কেন?

—জিজ্ঞেস করছি। কার্ল মার্কসের কথা বললেন কিনা!

—ও এমনিই।

—লাল-ঝাণ্ডার লোক এদিকেও আছে অনেক। তবে গাঁ-দেশের মানুষ তো সব, ঠিক ঠিক কিছু বোঝে না। আবছা আবছা ধরে নেয় ঠিক বিশ্বাসও করে না।

—কেন?

সবাই তো গাঁয়ের লোকের ভালই করতে চায় মশাই, কিন্তু একদলের ভালর সঙ্গে আর একদলের ভাল যে বনে না। চাষী-বাসী গেঁয়ো লোকের মাথাও তো তেমন শার্প নয়, সব দলের ভাল ভাল কথা তো সেই সব ভোঁতা মাথায় সেঁদোচ্ছে! শেষে মাথার ভিতরে সব ভাল কথা খটাখটি লাগিয়ে তালগোল পাকায়। তখন আবার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে তারা মায়ের থানে একটা ঢিপ্ করে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

বলে লোকটা খিক্ খিক্ করে হাসে।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা গতি ধীর করে বলে—আমি বাঁ ধারে যাব।

—আচ্ছা।

লোকটা গাছের ছায়ার একটা শুঁড়ি-পথে ঢুকে যায়।

সুকুল জেগেই ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সুকুল মশারি তুলে বাইরে আসে। উত্তেজিত গলায় বলে—তুমি শেয়াল ডাক ডাকছিলে?

—না তো!

—তবে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম এইমাত্র!

—সে সত্যিকারের শেয়াল সুকুল।

সুকুল বলে—একবার ডাক না।

চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে—এখন শুয়ে পড়। কাল সকালে তোমাকে অনেক ডাক শেখাব।

ভিতরের বারান্দায় রান্না করছিল জগদীশ। সাড়া পেয়ে ভিতরে এল। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য আর চাষাড়ে চেহারার জগদীশ। কিন্তু তার মুখে নির্বুদ্ধিতা নেই। একটু হয়তো ভালমানুষী আছে, কিন্তু উজ্জ্বল চোখজোড়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে চোখ দু'খানা অনেক কিছু লক্ষ্য করে।

জগদীশ সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ চাপা গলায় বলল—অনেক দেরি হল আপনার।

নয়ন জামাটা খুলে কাঠের চেয়ারের পিঠে রেখে বলে—মোনা ঠাকুরের একটা ইন্টারভিউ নিলাম।

—কী মনে হয়?

—কিছু না। ফাঁকা আওয়াজ। একটা আলু টপকালেই.....

জগদীশ মাথা নাড়ল, বলল—মোনা ঠাকুর শক্তিমান লোক।

—কিসের শক্তি?

জগদীশ একটুক্ষণ ভেবে বলে—কারও প্রতি খুব ভালবাসা থাকলে মানুষ একরকম শক্তি পায়। এই যেমন সুকুলকে ভালবাসি বলে আমি অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারি, অনেক সইতে পারি। ঠিক সেই রকম। মোনা ঠাকুরের ভালবাসা তাঁর গুরুর ওপর। ঐখানে মোনা ঠাকুরের ফাঁকি বড় একটা নেই। শক্তিও সেখানে। আপনি বিশ্বাস করেন না?

নয়ন অন্যমনস্ক ছিল, তার চোখের সামনে শ্যামার মুখ। সে বলল—করি।

—যদিও মোনা ঠাকুরের সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব নেই।

—কেন?

জগদীশ একটু ম্লান হাসে, তারপর বলে—কিছু শোনেন নি? গাঁয়ের সবাই তো জানে, আর বলাবলিও করে।

নয়নের খুব খারাপ লাগল হঠাৎ। সুকুল মশারির বাইরে বসে চৌকি থেকে পা দোলাচ্ছে। মুখখানায় শৈশবের সুন্দর হাবলা ভাব। একটু হাঁ-মুখ, চোখে অপার কৌতূহল। মাথার চুল অনেককাল কাটা হয় নি বলে চুলের চালচিত্তির মুখখানাকে ঘিরে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। অবাক চোখে নয়নকে দেখছে সুকুল। ভাবছে, এ লোকটা কী করে অমন পাখীর ডাক ডাকে! ইস, ঠিক তো পাখীর মতই!

রাতকানা একটা গুবরে পোকা ভোঁ চক্কর দিচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছে। সুকুল মুখ তুলে পোকাটা দেখে বলে—বাবা, দ্যাখো এরোপ্লেনপোকা।

নয়ন সুকুলের সুন্দর মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

জগদীশ বলল—যে যাই বলুক, সুকুল আমারই।

সুকুল তার বাবার দিকে চাইল। বড় বড় দুখানা চোখে একটা স্বাভাবিক কাজলটানা ভাব আছে। বিষণ্ণ চোখ। জগদীশের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গী এমন আকুল যে নয়নের আবার একটা শ্বাসকষ্টের মত হয়। সে মুখটা ফিরিয়ে জগদীশকে বলে,—ওসব আমি পাত্তা দিই না।

গুবরে পোকাটা চক্কর দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আসছে। সুকুলের মাথা ছুঁয়ে গে- বুঝি! জগদীশ তড়িৎ পায়ে গিয়ে একটা ঝাপটা মারল। কোন কোণে কোথায় ছিটকে পড়ল পোকাটা।

নয়ন বলল—ও পোকা কামড়ায় না।

—জানি। তবু সতর্ক থাকা ভাল।

সতর্কতার কথা শুনে নয়ন একটু হাসে। বলল—আপনি যদি অত সাবধানী, তো ছেলেকে নিয়ে সাপ ধরতে যান কেন?

জগদীশ গিয়ে সুকুলের পাশে বসে। বসতেই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুকুল। শুয়ে নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জগদীশ বলে—ভয়ঙ্করদের নির্বিষ করার শিক্ষা থাকা ভাল। একদিন তো সুকুলকে নিজে নিজেই চলতে হবে! ওকে তাই তৈরী করে দিচ্ছি।

সুকুল হাই তোলে। জগদীশ আলতো হাতে ওকে চাপড়ায়। মায়ের মত।

নয়নের দিকে চেয়ে বলে—বারান্দায় বালতিতে জল তোলা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

নয়ন বাধ্য ছেলের মত ওঠে।

দরজার পাশেই দড়ির দোলনায় দুটো বেঁটে সাপের ঝাঁপি ঝুলছে। তার পাশে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর কাচের বাক্স! নয়ন দাঁড়ায়। কাচের বাক্সটার মধ্যে দুটো কেউটে। মাথায় রুইতনের চিহ্ন। শরীর পাক খেয়ে আছে। নিঃসাড়, ঘুমন্ত যেন। ঝুড়ি দুটোর গায়ে একবার হাত রাখল নয়ন। নিস্তব্ধ। একটু হাসল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কোলে আধ-ঘুমন্ত সুকুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মৃদুস্বরে গল্প বলছে। বাইরে কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে।

হাত-মুখ ধুয়ে নয়ন এসে দেখে সুকুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারধারে যত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে জগদীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে কাঠের চেয়ারটায়। দুটো চোখ শূন্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার আধখানা মুখ আলোকিত, বাকি আধখানা আবছায়। মুখের রেখাগুলো পাথরের মূর্তির মত স্থির। নয়নের হঠাৎ মনে হয় দুঃখচাপা জগদীশকে যে-রকম ভালমানুষ আর নির্বিষ মনে হয় ততটা সে নয়। খোঁচা খেলে ও ভিতর থেকে প্রবল হিংস্রতা আর সিংহনাদ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ায় নয়ন। মৃদু আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। সাপ আর সাপিনী। আবছা সরীসৃপ শরীর দুটো বালুর ওপর অনেক রেখা এঁকেছে। তীব্র আগ্রহে নয়ন দেখে। তার শ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। হাত দুটো নিশপিশ করে। কেমন ফুল তোলার মত অনায়াসে জগদীশ বন-জঙ্গল থেকে তাদের গোপন শরীর তুলে আনে।

হ্যারিকেনটা তুলে আনে নয়ন। কাঁচের বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে। কী চমৎকার সতেজ কালচে শরীর! যখন ছোবল তোলে তখন কী মারাত্মক আকর্ষণকারী সেই আক্রমণের ভঙ্গী। বিষ! বিষ! আর চিন্তাশূন্য আক্রমণ।

বাক্সটার গায়ে ছোট্ট দুটো টোকা দেয় নয়ন। তারপর দুটো জোর টোকা দেয়।

জগদীশ পিছন থেকে বলে—কী করছেন! ও দুটোর আবার বিষদাঁত উঠেছে, কামাতে হবে। চলে আসুন।

—আমি দেখব।

—কী?

—ওদের.....কথাটা শেষ না করে হাসে নয়ন। বিলোল হাসি।

—কী বলছেন? জগদীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

একটা হতাশার শ্বাস ফেলে নয়ন বলে—কিছু না। চলুন খেয়ে নিই।

জগদীশ বলে—চলুন।

বলে ওঠে।

রাত খুব বেশী হয় নি। কিন্তু পাড়াগাঁ বলে অনেক রাত মনে হয়।

খেতে বসে জগদীশ হঠাৎ বলে—মানুষ কোন কোন ব্যাপারে নিয়ম মানে না। কিন্তু জীবজন্তুরও একটা নিয়ম আছে।

—কী রকম?

জগদীশ একটু হেসে বলে—আপনি ঐ সাপ দুটোর কী অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন?

নয়নের মুখটা লাল হয়ে যায়, সে তরল ভাবে হাসতে থাকে। বলে—ভালবাসা।

জগদীশ মাথা নেড়ে বলে—বুঝেছি! তাই বলছিলাম যে মানুষ সময় মানে না, দিনক্ষণ মানে না। এ এক আশ্চর্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত সবচেয়ে বেশী প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে। সাপ কুকুর বেড়ালও মানুষের মত এত নির্লজ্জ নয়। তারা নিয়ম মেনে চলে। একজোড়া সাপ আর সাপিনী এক জায়গায় আছে বলেই যে তারা যা-খুশী করবে এমনটা দেখা যায় না। ঠিক সময়টি এলে, ক্ষিদে জাগবে, আর তখনই মাত্র আপনি যা দেখতে চাইছেন দেখতে পাবেন। নইলে শতবার ঐ বাক্সটা নাড়ালেও লাভ হবে না।

বলে জগদীশ হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বলে—মানুষের মত বেলাজা কেউ নয়। ক্ষিদে না পেলেও খাবে। খাওয়া, ভোগ এসবই তার সর্বস্ব।

খেয়ে উঠে জগদীশ সুকুলের বিছানায় শুতে গেল। পাশের ঘরে নয়নের বিছানা। সুন্দর পরিপাটি মশারি টাঙানো, জলের গেলাসটি ঢাকা দেওয়া, কোথাও খুঁত নেই। ঠিক যেন মেয়েলি হাতের কাজ। কার যে কোথায় ভাত মাপা থাকে! নইলে নয়ন তো আজ বিকেল অবধি লোকটাকে চিনতই না এখনও যে চেনে তা নয়। শুধু জানে লোকটা সাপ ধরে, ছেলেকে (সে নিজের হোক আর অন্যেরই হোক) বড্ড ভালবাসে। আর জানে, লোকটা গৃহকর্মে নিপুণ।

ছাঁচবেড়ার ঘর। ফুটো-ফাটা আছে। হেমন্তের গড়ানে রাত। টেনে

বাতাস দিয়েছে একটা। শুকনো পাতার শব্দ পাওয়া যায়। দুদ্দাড় শেয়াল বা কুকুর দৌড়ে গেল উঠোন ভেঙে। বাতাসের শিস্ শোনা যায় বেড়ার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। এতে কোন অসুবিধে হয় না তার। গত একবছর তার জীবন এরকম কেটেছে। সেবার বুড়ি ঝি সুখীয়ার চোখে ছানি পড়লে সে দেশে গেল। বাড়িতে কাজের লোক ছিল না। তখন সুন্দরবনের দিকে বান ডেকেছিল বলে কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠেছিল জোয়ানমদ্দ মেয়ে-পুরুষে। কালো কালো চেহারার হাবা মানুষ সব, দিনমানে ভিক্ষে করে, রাতে চুরি। ফুটপাথে ছেঁড়া কাঁথার সংসার বিছিয়ে ছানাপানা জাব্ড়া-জাবড়ি করে বসে। ঝাঁকড়া চুলের উকুন মারে, গালাগাল দিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে। গাছাড়া ভাব। বান হয়েছে তো করব কী, এই রকম গা-সওয়া নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে কলকাতার রাস্তায়। গাছতলায় বেলাশেষে কুড়োন কাঠ কাগজ ঠেসে ইঁটের উনুন জ্বেলে মেটে-হাঁড়িতে নাড়ি-ভুঁড়ি, তরকারীর খোসা, গমের ভুষি, খুদসেদ্ধ চাপায়! তারই মধ্যে আবার পাথরের টুকরো ফুটপাথে ঘষে মশলা বাটে। সেই সব আধা-মানুষের সমাজ থেকে একটা নোনা মেয়েমানুষ তুলে আনল বড় জামাইবাবু। শাশুড়ি ঠাকরুণের কষ্ট বুঝে ঝি ঠিক করে দিয়ে গেল। নোনা মেয়েছেলেটার গা-গতর যে ভাল তা দিন সাতেক খাওয়া-দাওয়া করার পরই বোঝা গেল। কোল-পোঁছা একটা ছেলে, স্বামী হাজত খাটছে কার বাজারের থলে টেনে দৌড়েছিল বলে। ঝাড়া হাত-পা সেই মেয়েটিকে নয়ন লক্ষ্য করেছে কখনও সখনও। লক্ষ্য একবার করলে নয়নের দেরী সয় না। সন্ধ্যের ঘোরেই বাড়ি নিঝুম। বাবা উকিল মানুষ, বাইরের ঘরে মক্কেল ঠাসা, দম ফেলার সময় নেই। মা হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে সন্ধ্যের পরই মশারির নীচে চলে যায়, হাতপাখা নাড়ে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মেয়েছেলেটা সিঁড়ির নীচে ছেলে ঘুম পাড়াতে গেছে। সেই সময়ে নয়ন গিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। চালটায় ভুল ছিল। চেঁচানিতে মক্কেল সুদ্ধু বাবা চলে এসেছিল। বেড়ালের মত ছুটেছিল নয়ন। কিন্তু মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিল দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন। সদরে তাকে জাপটে ধরে ফেলল। পরে অবশ্য উকিল বাবুর ছেলে শুনে সে খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই রাতেই বাবা তাকে বের করে দেয়। সেই মেয়েমানুষটাকেও। সেই থেকে বাইরে বাইরেই কাটে নয়নের। কোন কিছুর ঠিক থাকে না। খাওয়া, শোওয়া এইসব অবশ্য ভাববার ফুরসৎই

পায় না সে। তারটা দশজনই ভেবে আসছে একবছর ধরে। নয়ন কেবল শ্যামার কথা ভাবে বা আর কিছু। বাড়ির সদর বন্ধ হলেও মায়ের জন্য খিড়কীটা এখনও বন্ধ হয়নি। কলকাতায় ফিরলে সে বাড়িতেই থাকে। একটু বেশী রাত করে ঢুকতে হয়, এই যা। বাবা টের পায় হয়ত, দেখি না দেখি না করে এড়িয়ে যায়।

কাজেই এই সুন্দর পরিপাটি বিছানাটিতে তার ঘুম না হওয়ার কারণ নেই। বলতে কী, জগদীশের আশ্রয় না জুটলে হয়ত বা মোনা ঠাকুরের মন্দিরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হত। এই শীতে, খোলা হাওয়ায়, গেঞ্জির ওপর একটামাত্র শার্ট সম্বল করে।

ঘুম তবু আসছে না। মাথাটা বড্ড গরম। শরীরও। মোনা ঠাকুরের মন্দিরের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সে জেগেই এক মায়া দেখল। কুয়াশায় মাখা সেই অলৌকিক জ্যোৎস্না, মন্দিরের প্রাচীন সাদা সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপে বঙ্কিম সুন্দর ভঙ্গীতে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তার চোখ চেয়ে আছে নয়নের দিকে। বিভ্রম? না। মাথা নাড়ে নয়ন। একথা ঠিক, সে মেয়েদের এখনও চেনে না। চিনবার বয়সও নয়। সে মাত্র চব্বিশ পেরোল। মেয়েদের বুঝতে বয়সও চাই। সে তো এখনও জানে না কেন শ্যামা খেলা করে তাকে নিয়ে, কেন বা সেই সুন্দরবনের নোনা মেয়েমানুষটিকে চেঁচিয়ে বলেছিল—হারামীর বাচ্চা! মেয়েদের না চিনেও নয়নের মনে হয়, ঐ মেয়েটি মন্দিরের শেষ দুটো সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ঘাটের পৈঠায় স্নানের আগে মেয়েটা যেমন দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে, তেমনি ছায়া দেখতে চেয়েছিল নয়নের চোখে।

ঘুম হবে না। নয়ন মশারির মধ্যেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় মশারির ভিতরটা ভরে ওঠে। হ্যারিকেনের গন্ধ পায় সে। উঠে বাইরে আসে। পায়চারী করে। শরীর। শরীরই সব। জগদীশ কী একটা তত্ত্বকথা বলছিল! ক্ষিদে, ভোগ এ হচ্ছে মানুষের সর্বস্ব। জীবনজন্তুরা মানুষের মত নির্লজ্জ নয়।

নয়ন একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ মানুষ ছাড়া আর কেউ পোশাক পরে না। পোশাক পরে কেন? মানুষ কি জানে না যে পোশাকের ভিতরে তার শরীরটা ন্যাংটো! সব মানুষই জানে মানুষের, মেয়ে মানুষের শরীরে কি আছে, কিংবা কেমন করে সেই শরীর ব্যবহার করা যায়। তবে কেন মানুষ পোশাক পরে।

নয়ন একটু হাসে আপনমনে। ক্ষমতা হাতে পেলে সে নিয়ম করবে, পোশাক পরা চলবে না। বেহায়া, নির্লজ্জ, সবই তো জানো তোমরা, তবে কেন ঐ পোশাক? ছেড়ে ফেল, ছেড়ে ফেল, উদোম হও, লজ্জার কি আছে? পরস্পরের ন্যাংটো শরীর দেখ, লজ্জা জুড়িয়ে যাবে হে!

সাপদুটো এখন কী করছে? এই মায়াবী জ্যোৎস্নার শীত রাত্রিটি, এই তো সময়। এখনও কি নিস্পৃহ দড়ির মত শুয়ে আছে? যখন একটি মেয়ে শরীরের অভাবে নয়নের চোখে ঘুম নেই।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। হ্যারিকেনের পলতে নামানো। মৃদু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসে জগদীশের বিছানা থেকে। নিঃসাড়ে ঘুমোলে সুস্থ মানুষের শ্বাস ওরকম দ্রুত হয়। তা ছাড়া গাঁয়ের মানুষ, ঘুমটা গাঢ় হওয়ারই কথা।

নয়ন নিঃশব্দে হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে আলোটা উস্কে দিল। আলো হাতে কাচের বাক্সটায় ঝুঁকে দেখল, যেমন দেখেছিল খানিক আগে তেমনি দুটো পড়ে আছে। ন্যাংটো কালো শরীর! শীতল। নিস্পৃহ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল নয়ন। তারা নড়ল না।

এভাবে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না। শব্দ করলে জগদীশ জেগে যাবে। নয়ন বাক্সটা ভাল করে দেখে। সাধারণ বাক্স। একটা কবজায় পুঁচকে তালা ঝুলছে। পকেট থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে নয়ন। ফলাটা তালার ভিতর ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই আলগা হয়ে গেল। গা-টা একটু শির শির করে তার। সাপদুটো নড়লও না।

নিঃশব্দে ডালাটা তুলে ফেলল সে। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে আসে। সম্ভবত ইঁদুর বা ব্যাঙ খেতে দেওয়া হয়েছিল ওদের, তারই কোন টুকরো-টাকরা পড়ে পচছে। একটু দূর থেকে সাবধানে উঁকি দেয় নয়ন। ভয়ের কিছু নেই। যদি মাথা তোলে ঝপ করে ডালাটা ফেলে দিলেই হবে। আপাততঃ ওদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে দেওয়া দরকার। নয়ন কখনও সাপদের মিলন দেখে নি। না-ঘুমোন সময়টাও কেটে যাবে অন্যমনস্কতায়।

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটা ঘরের কোণে। একটা শল খুলে নয়ন সাবধানে বাক্সের ভিতরে একটা খোঁচা দেয়। গায়ে লাগে না। বালিতে গেঁথে যায়। অনভ্যাসের হাত। আবার খোঁচা দেয়। এবার কোণের বিড়ে-পাকানো সাপটার গায়ে লাগে ঠিকই। কিন্তু সে নড়ে না। কোন্‌টা মাদী, কোন্‌টা

মদ্দা তা অবশ্য সে চেনে না। তবু ওটাকে তার মদ্দা বলেই মনে হয়। মেয়েমানুষের রাগ বেশী।

দুটো তিনটে খোঁচা বৃথা গেল। সাপটা কেবল মাথাটা একটু সরিয়ে নিল, শরীর নাড়ল! নয়ন ডালাটা প্রায় বন্ধ করে ধরে রইল। সাপটা আবার ঝিমিয়ে পড়তেই ডালাটা আবার সাবধানে তুলে ফেলল সে। আবার কাঠিটা স্পর্শ করল শরীরে......

কালো-বিদ্যুৎ কখনও দেখে নি নয়ন। দেখল। বিশ্বাস হয় না, এত দ্রুত ঘুম থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে যেতে পারে কেউ। একটা প্রবল শ্বাসের শব্দ হল কেবল। একপলকের মুগ্ধতায় আর একটু হলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল সে।

ডালাটা খাড়া তোলা ছিল, কোন্‌দিকে পড়বে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটুক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ডালাটা আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই একটা মসৃণ ছোবল খেয়ে সাপটা বাক্সের কার্নিশ বেয়ে ঝুলে পড়েছে। কিছু করার নেই।

কালো একটা স্রোতের মত নেমে আসছে। নেমেই আসছে সরীসৃপ চিকণ শরীরখানা। ডালাটা পড়েছে। কিন্তু হাল্কা ডালাখানা তাকে চেপে রাখতে পারছে না। স্বচ্ছন্দ শরীরটা বেয়ে আসছে সুন্দর মুক্তির দিকে, প্রতিশোধের দিকে।

নয়ন হ্যারিকেনটা ফেলে এক লাফে পিছিয়ে আসে। পাগলের মত চেঁচায়—জগদীশবাবু...জগদীশবাবু....

চোখের পলকে মশারি প্রায় ছিঁড়ে জগদীশ বেরিয়ে অসে। হ্যারিকেনটা কাৎ হয়ে দপ্ দপ্ করছে, তেল পড়ছে গড়িয়ে। এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। কালো অন্ধকারে সাপের কালো শরীরটা জগদীশও খুঁজে পাবে না।

—কী? কী? বলে জগদীশ গর্জন করে। ঘুম-লাগা চোখে মাথায় কিছু বুঝতে পারে না।

নয়ন কেবল 'সাপ' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল।

জগদীশ এক ঝটকায় আগে হ্যারিকেনটা সোজা করল। সেটা নিভল না। কিন্তু আলো ঘুলিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সাপটাকে দেখতে পেল নয়ন। দরজার দিক থেকে ঘুরে মুখটা তুলেছে। চোখে জ্বালা, মুখে শ্বাস।

জগদীশ মুহূর্তের মধ্যে সাপুড়ে হয়ে গেল। কুঁজো হয়ে দুটি সতর্ক জাগ্রত হাত উদ্যত করে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। মুখো মুখি।

নয়ন মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে।

মানুষের ছোবল কত সুন্দর হয় তা দেখল নয়ন। এত সুন্দর কিছু সে কখনও দেখে নি। জগদীশ ঢেউ হয়ে গেল যেন। চকিতে শরীর ঝুঁকল। হাত প্রসারিত হল। এত দ্রুত যে বিশ্বাস হয় না। বাঁ হাতে সাপটাকে ফুলের মত যেন গাছ থেকে তুলে নিল সে। এত অনায়াসে, যেন যে-কেউ করতে পারে।

ডালাটা খুলে, জগদীশ সাপটাকে ভিতরে ছেড়ে দেয়। সেটা আবার শরীরটাকে পাকে পাকে জড়ায়। মাথা কোলে নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

জগদীশ নয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলে—এটা কী হল?

নয়ন সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—ঘুম আসছিল না।

—কী দেখতে চেয়েছিলেন?

—ঐ, সেটা।

দাঁতে দাঁত ঘষল জগদীশ। অস্বাভাবিক ধীর গলায় বলল—এই ঘরে সুকুল আছে, আপনি জানেন না? যদি সুকুলের কিছু হত!

—ওটা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারি নি।

—কিন্তু যদি বিছানায় যেত সাপটা? ওখানে আমার সুকুল আছে!

নয়ন বুঝতে পারে, তার অনুমানই ঠিক। বাইরে ঐ বিষণ্ণ ভালমানুষীর আড়ালে তীব্র হিংস্রতা রয়ে গেছে জগদীশের। রাগে চাপা গলা। সমস্ত শরীর টান, রগ, শিরা-উপশিরা এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে।

—মজা, না? বলেই জগদীশ আচমকা তার চাষাড়ে হাতে একটা থাপ্পড় কষায়। নয়ন ভাবতেও পারে নি। চড়টা বোমার মত ফাটল তার কান, গলা, কণ্ঠা জুড়ে। মাথার মধ্যে সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল হঠাৎ।

পড়ে গিয়েও টাল সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে কাঠের চেয়ারটা ধরে দম নিল।

—বেইমান! জগদীশ বলে।

মার কিছু কম খায় নি নয়ন। কিন্তু মার দেখলে সে পালায়ও নি কখনও। এ তার জল-ভাত! যেখানে মার সেখানে উল্টে মার দেওয়ার জন্যই সে জন্মেছে। চড়টা সামলেই দুটো হাত তার আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেল।

কিন্তু একটা বিশাল গাছের মত জগদীশ দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো মাটিতে পোঁতা, দু'খানা চাষাড়ে হাত তাকে বলের মত ছুঁড়ে লুফে নিতে

পারে।

মুঠো শিথিল করে শরীরের ভর চেয়ারের হাতলে ছেড়ে নয়ন জগদীশকে একটু দেখল, বলল—অতিথি নারায়ণ।

বলে হাসল।

জগদীশ গম্ভীর ভাবে বলল—অতিথির ভেক ধরে চোর ডাকত এলে সে তখন নারায়ণ থাকে না। গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি দরজার বাঠাম দিয়ে দিচ্ছি। ফের কোন বাঁদরামী করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

নয়ন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে তার দারুণ ভাল লাগছে এখন। দারুণ!

মসজিদ বাড়ির বাইরের ঘেরা-দেয়ালটায় নোনা ধরেছে। গেটটা পাল্লা হারিয়ে হাঁ করে আছে। ভিতরে একটা চমৎকার মাঠ। নির্জন। মসজিদের গায়ে একটা মোটা লতা উঠেছে, অশ্বত্থ গজিয়েছে! ভিতরের মাঠের একটেরে একটা কাঠচাঁপা গাছ। খুব ফুল এসেছে। তলায় বিছিয়ে আছে ফুল। এই ফুলটার তেমন আদর নেই। কেউ কুড়োয় না, ঘর সাজায় না। ফুলের দোকানে এই ফুল বিক্রি হতেও দেখেনি শ্যামা। কিন্তু হলদেটে সাদা রঙের এই ফুলটার চাপা গন্ধ শ্যামার বড় ভাল লাগে। সে একবার চারধারে চেয়ে দেখল। কেউ নেই রাস্তায়, দু'চারজন সাধারণ চেহারার মানুষ ছাড়া। মসজিদের ভিতরেও লোকজন বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। এই অঞ্চলটায় মুসলমানরা বড় একটা থাকে না এখন। আজানধ্বনি শোনা যায় না। আগে যেত, যখন সে খুব ছোট ছিল। তখন একটা পেয়ারাগাছ ছিল এখানে, আর ছিলেন হাজিসাহেব। বদনার জলে ওজু করতে করতে তাদের দুই ভাই বোনের গাছে চড়া দেখতেন। নমাজের সময়ে বাচ্চারা ছোটাছুটি করলে অসুবিধে হবে বলে ছোকরা মোল্লা কি বুড়ো মৌলভী তেড়ে এলে তিনি আটকাতেন। তাদের ডেকে বলতেন—শব্দ করো না। পেয়ারা পাড়। যতটা খেতে পার ততটা। নষ্ট করো না।

হাজিসাহেব নেই। কেউই নেই। নিস্তব্ধতা আছে। দু-একজন কেয়ারটেকার থাকে হয়ত বা। মানুষ যে কোথায় চলে যায়! বড় হয়ে অবধি বাড়ি থেকে দু পা দূরে মসজিদের মাঠে কখনও আর আসে নি শ্যামা, ভুলে গিয়েছিল।

আজ বহুকাল বাদে সে নির্জন মাঠটায় ঢুকে পড়ল। সকালের রোদ এখন ঈষদুষ্ণ। ভালই লাগে। বাতাস দিচ্ছে। 'কিরিচ' শব্দ করে চুলে ঘেঁষে চড়াই উড়ে যায়। কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আর গাছগাছালির ছায়া!

কাঠচাঁপা ফুল কয়েকটা কুড়োল শ্যামা। স্কার্ফের আঁচলে তুলল। একটু ঘুরে দেখল চারদিক। মসজিদের চাতাল ঝাঁট দেওয়া। মেঝে পরিষ্কার। বাতাসে ধূপগন্ধ। মেহেদীর ঝোপে পাখীর হুড়োহুড়ি।

হঠাৎ কোকিল ডাকে। চমকে ওঠে সে। কোকিল! না নয়ন?

স্খলিত আঁচল থেকে দু-একটা ফুল পড়ে যায়।

সেই যে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে যেতে আমবাগানে দেখা হয়েছিল, তারপর আর তাকে দেখেনি সে। ফিরেছে কি নয়ন? কে জানে!

নিমগাছ থেকে একটা সত্যিকারের কোকিল উড়ে গেল। তবে নয়ন নয়, কোকিলটাই ডেকেছিল। শ্যামা নিশ্চিন্তে একটু হাসে। একটা ফুল তুলে গন্ধ শুঁকল। মৃদু গন্ধই তার প্রিয়। বুক ভরে ওঠে না গন্ধে, কেবল স্মৃতির মত, গত রাত্রির স্বপ্নের রেশের মত অস্পষ্ট গন্ধ।

গত রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায়ই দেখে। সকাল থেকে মনটা ভার হয়ে আছে। বাবার জন্য একটা ফুল-হাতা, উঁচু গলার সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। পান্নাদির বাড়িতে গিয়েছিল প্যাটার্ণ তুলতে। আসলে প্যাটার্ণ তোলাটা ছল। ঘরে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। হরিদ্বার যাওয়ার গোছগাছ শুরু হয়েছে, মা বাবা যাবেই। মোনা ঠাকুর বলেছে, ঐ দিকেই কোথাও দাদা আছে সন্ন্যাসী হয়ে। পূর্বস্মৃতি নেই বলে ফিরতে পারছে না। শ্যামার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আশা হয়।

হরিদ্বার কি কোথাও যেতে শ্যামার ইচ্ছে করছিল না এখন। বাবার শরীর ভাল না। মাঝে মাঝে প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে যায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে তারা মা আর মেয়ে বাবাকে নিয়ে কোন্ আতান্তরে পড়ে কে জানে! কিন্তু মা বাবাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, অনেক বুঝিয়েছে সে, বেশী বোঝাতে গেলে ঝগড়া হয়ে যায়।

বাবা হরিদ্বারে গিয়ে মারা গেছে—এ রকমই একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল কাল। সকালটা তাই মনের অন্ধকার নিয়ে কাটছিল। পান্নাদির বাড়িতেও প্যাটার্ণ তোলা হল না। আজ ছুটির দিন, ওরা পিকনিকে যাচ্ছে কল্যাণীতে। বলল—চল্ না, মাসীমাকে বলে তোকে নিয়ে নিই। শ্যামা রাজী হয় নি।

রাজী হয় নি অভিমানে। তার কোন আনন্দ করতে নেই। বাড়িতে অবিরল শোক লেগে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। বিরাম নেই। দীর্ঘশ্বাসে বাসার বাতাস ভারী। মাত্র তিনটি প্রাণী তারা। পরিবারটা বড় হলে হয়ত একজনের শোক ভুলে থাকা যেত। মোটে তিনজন বলেই হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ জনের কথা ভোলা যায় না। চার পায়া একটা আসবাবের একটা পা ভেঙে গেলে সেই পায়ার দিকেই যেমন ঝুঁকে থাকে আসবাব, তেমনি হারানো দাদার স্মৃতিতে ঝুঁকে আছে তারা। খেতে বসতে কাজ করতে দাদার কথা এসে পড়ে। মা কাঁদে, বাবা সান্ত্বনা দেয়, তারপর নিজে কাঁদে। শ্যামার চোখে তখন জল আসেই, তাই তাদের আনন্দ নেই। গত পাঁচ বছরে বাবা শ্যামার বিয়ের চেষ্টাই করেন নি। প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন—ছেলেটা নেই, ঐ মেয়েটা মাত্র আমাদের সম্বল। অন্ধের নড়ি। ও গেলে থাকব কি করে?

তবু গত পাঁচ বছরে দু-তিনটে পাত্রপক্ষ দেখেছে শ্যামাকে, পছন্দও হয়েছে। বিয়ে হয় নি বাবা মার গরজের অভাবে। পাত্রদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ ছিল শ্যামার। স্নিগ্ধ চেহারার দীর্ঘ ছেলেটি। মুখখানা গম্ভীর। বিলেত ফেরত ডাক্তার। প্র্যাকটিশ যখন সবে জমে উঠেছে সেই সময়ে লোকটাকে হঠাৎ অল্প বয়সেই ধর্মে পায়। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর ছেলেটির একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। দিন-ক্ষণ সব ঠিক। বিয়ের দিন গায়ে-হলুদের স্নান করতে গিয়ে মেয়েটির কেঁপে জ্বর আসে। ধূম জ্বর উঠতে না উঠতেই গায়ে মায়ের দয়া বেরোয়। ঝেঁপে গুটি উঠেছিল। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোকা মেয়েটা যখন বুঝতে পারল যে তার মুখখানার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার প্রাণের চেয়ে শরীরের মায়া বেশী হল, প্রায়ই কাঁদত—ও মা গো, এই মুখে তাঁর ঘর করতে যাব? রোগ সারার মুখে মেয়েটা বিষ খেয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে মারা যায়। ছেলেটি সেই থেকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াত। কী যেন খুঁজত, কাকে যেন। তারপর দেওঘরের এক আশ্রমে থেকে যায়।

আশ্রমবাসী সেই বিলেত ফেরত ডাক্তারের মা বাবা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলের গুরুদেব বললেন—বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে কর। বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী।

বনের সন্ন্যাসী দিয়ে কী হয় রে? কাম দমন করতে চাস না কি। ওসব জোর করে করতে গেলে মাথার দফা শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতাই কাম দিয়েছেন, সে তো এমনি নয়, তারও কিছু প্রয়োজন আছে বলেই দিয়েছেন। ওর দমন ওভাবে হয় না, জোর করতে গেলে উল্টো বিপত্তি সুষ্ঠু ব্যবহার কর, স্ত্রীর প্রতি কামভাবেই কেবল ভাবিত হয়ো না, তা হলেই হবে। ভাল ঘর দেখে জাতে-কাটে কর।

সেই ডাক্তার নিজেই এসেছিল দেখতে? হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরা ধুতি, লম্বা, কৃশ কালো চেহারাটি। ভারী বীর। গম্ভীর। ঘরে ঢুকলে ঘরটা থম থম করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু ডাক ওঠে। বাবা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি এই অল্প বয়সেই কেন সন্ন্যাসী বাবা?

সে উত্তর দিয়েছিল—সন্ন্যাসী কোথায়? আমি তো সংসারীই। কেবল সংসারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

—সেটা কেমন?

ছেলেটা একটু ভেবে বলল—আপনার ঘরের পাশে যদি আবর্জনা থাকে তবে মশা মাছি জীবাণুর উৎপাত বাড়ে। বাড়ে না? নিরাপদে থাকতে গেলে তাই আপনার ঘরের মতই ঐ বাইরের ময়লাও পরিষ্কার করা দরকার! তেমনি নিজের পরিবার সংসারের ভালর জন্যই চারপাশটাকে ভাল রাখা দরকার। এই ভাল রাখতে গেলেই সংসারের পরিধি বেড়ে যায়। কেবল নিজের ভালর জন্য করলেই ভাল থাকা যায় না।

বাবা উত্তরে বলেছিল—তো তার জন্য আশ্রম কেন? ঘরে থেকেও তো হয়।

—আশ্রম মানে যেখানে শ্রম করে কাজগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শেখা হলেই সংসারে ফিরে আসা! সেকালের ব্রহ্মচারীরা ভাল গৃহী হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য করে মনটাকে উদার, শান্ত ও আনন্দিত ও স্থির করে নিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার, ব্রহ্মচারী মানে বিস্তারে বাস করা। চারপাশটাকে জেনে নেওয়া। এই জানা সংসারে তাকে সাহায্য করে। আমি সংসার বিমুখ নই।

ধীর স্থির কথা। বিনীত এবং অকপট স্বর।

বাবা তবু মনস্থির করতে পারছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল—তুমি কেন গেলে?

ছেলেটা বিষণ্ণ একটু হাসল। কী মায়াময় হাসিটি! অনেকক্ষণ উত্তর

দিল না। তারপর আস্তে করে বলল—আর একবার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা কি শুনেছেন?

—শুনেছি।

ছেলেটা আবার মাথা নীচু করে চুপ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল—মেয়েটির যখন বসন্ত হয়েছিল তখ্ন আমি মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তার হিসেবেই যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না, এই যেমন আজ এসেছি আপনার বাড়িতে সেরকমই উপলক্ষে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে দেখা, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বসন্ত হওয়ার পর তার সেই সৌন্দর্য যে কোথায় গেল! একটি সুন্দরী মেয়ের বসন্ত হলে ডাক্তারের খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু রুগী দেখা এক কথা, আর নিজের ভাবী স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখা আর এক কথা। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবু মনকে আমি স্থিরই রেখেছিলাম। ঐ মেয়েকেই বিয়ে করব। আমি তাকে তাই প্রায়ই দেখতে যেতাম। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত, কথাবার্তাও বলত না। চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে থেকে চলে আসতাম। একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে দেখতে গেছি। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। তাতে নিমডাল বাঁধা, ঘরে আবছা আলো পড়েছে। মেয়েটি শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমি চেয়ারে বসা। মশারিটা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি তাকে দেখতে পাই। তিনদিকে মশারি ফেলা, একদিকের মশারি তোলা। ফলে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন থিয়েটারের স্টেজ-এর মত। সে শুয়ে আছে, শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা লালচে মারাত্মক গোটায় ভরা। গোটা গলে পুঁজ আর রস চাপটা বাঁধছে। এলো চুল বালিশে ছড়ান, দৃশ্যটা করুণ, ভয়ঙ্কর। দেখছিলাম। পশ্চিমের জানালার নিমডালের ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর কুচি এসে বিছানায় পড়েছে। চৌখুপী আলো কাঁপছে, দুলছে। কোনদিন সেই যা করে না, সেই সময়ে সে হঠাৎ মুখ ফেরাল। বস্তুত রোগ হওয়ার পর তার মুখ ওরকম স্পষ্ট ভাবে সে কখনও আমাকে দেখায় নি। মুখখানা ফুলে-টুলে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। কিন্তু তাতে চমকাবার কিছু নেই। আমার মন তো প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখ দু'খানার দৃষ্টি দেখে আমার কেমন লাগল। মানুষের খুব অভিমান হলে চোখে যেমন একটা আলগা আলো আসে ঠিক সেরকম কিছু ছিল তার চোখে। জলভরা, লালচে এবং আগুনের মত যা এসে ছোঁয়। তক্ষুণি মনে হল, একে পাহারায় রাখা দরকার। চোখে

চোখে না রাখলে এ মরবে, এর মরার ইচ্ছে জেগেছে। কিন্তু এরকম মনে হওয়াগুলো কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, আমাদের কত সময়ে কতকিছু মনে হয়! তার ওপর ঘরটার আলো স্পষ্ট নয়, মশারির মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর সেই আলোর চৌখুপীগুলো, সেগুলোর কোন ছিটেফোঁটা তার চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিল কি না—এ সবই আমি ভাবতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, ঘরে একটা জর্মিসাইডিসের চেনা গন্ধ। আর পোকামারা বিষের গন্ধ। সেই গন্ধ আমার নিত্যসঙ্গী। তবু হঠাৎ সেদিন সেই গন্ধ বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে একটা আকুল ইঙ্গিত করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার মন একটা একটা অস্পষ্ট কিছু বলতে চাইছে। উঠে আসবার সময়ে দেখি, কে যেন পোকামারা বিষের শিশিটা ছোট্ট আলমারির মাথায় রেখে গেছে। চলে আসতে গিয়েও থমকে শিশিটা দেখলাম। একবার হাত বাড়িয়ে ধরলামও, ভাবলাম কাউকে বলি শিশিটা সরিয়ে নিতে। তারপর সচেতন মনে ভাবলাম, থাকগে। কি হবে!

ছেলেটা চুপ করে আবার একটু ভাবল। তারপর ম্লান এবং সুন্দর হাসিটি হেসে বলল—এই হচ্ছে গল্প। মেয়েটা মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার মরার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। সেটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। চুকে-টুকে গেছে। কিন্তু তারপর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। প্রশ্ন এই—আমি কেন সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম? আর কেন তা উপেক্ষা করেছি? আমি যদি এতই আনাড়ী যে বুঝতে পেরেও সাবধান হতে জানি না তবে তো একদিন আমার অধীত বিদ্যাও সঠিক প্রয়োগ করতে পারব না! সঙ্কট যখন আসে তখন মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যার পরিচয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থির ভাবে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে জানে না, কোন্ সিদ্ধান্ত সঠিক এ বিষয়ে যার দ্বিধা থাকে সে অবিশ্বস্ত। চিন্তা করতে করতে আমি দেখলাম, মানুষ যত তুচ্ছ ভুলই করুক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুলের পিছনে থাকে তার জীবনের যত কাজকর্ম, যত অভ্যাস, যত আচরণ। জল খেয়ে কাচের গেলাসটি টেবিলের ধারে রাখতে গিয়ে ভাবলাম—এখানে রাখছি কারও ধাক্কা লেগে পড়ে ভেঙে যাবে হয়ত! ভাবলাম, তবু আবার রেখেও দিলাম। ভাবলাম—থাকগে, এক্ষুণি ভিতরবাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটু লেগে টেবিলটা

নড়ল। গেলাসটা নড়ে উঠে আবার স্থির হল। ভাবলাম—গেলাসটা পড়ে যাবে। টেলিফোন বাজছে, দৌড়ে গিয়ে ধরি। কে একজন ফোন করে একটা ঠিকানা দিল লিখে রাখতে। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি এসে ঠিকানাটা লিখে রাখতে যাচ্ছি। ডায়েরীটা খুঁজছি। তখন গেলাসটার কথা ভুলে গেছি। জরুরী ঠিকানাটা লিখে রাখা দরকার, ডায়েরীটা কোথা? ফাইলের তলায় চাপা ডায়েরীটা পেয়ে 'ইউরেকা' বলে টেনে বার করতে গেছি, তখন হঠাৎ কনুই লেগে ফটাস্ করে পড়ে ভাঙল, ওটা কি? সেই গেলাস!

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটো পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে বলল—তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু ভেবে দেখলে এর পিছনে আমার সমস্ত জীবনটাই কাজ করছে। ঐ দীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত আলস্য। কাজ ফেলে রাখা, অন্যে এসে নিয়ে যাবে—এই পরনির্ভরতা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেও উপেক্ষার সর্বনাশা শিথিলতা। জরুরী কাজের সময়ে বিশৃঙ্খলা। সবকিছুকে একযোগে দেখার অক্ষমতা, আর সব মিলিয়ে একটা সাময়িক অন্ধত্ব। যে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভুলগুলো করে তার জন্য বড় বড় ভুল অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি মরে যাওয়ার পর নিজের এই অন্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তের অভাব আমাকে পাগল করে দিল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি রুগীদের সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারব না, ভুল ওষুধ দেব হয়ত, অপারেশন করতে হাত কাঁপবে এবং কোন মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কেবলই উল্টোপাল্টা ভেবে যাব। নিজের সম্পর্কে এই বিশ্বাসের অভাব মানুষের মস্ত এক শত্রু। তখনই ঠিক করি ডাক্তারীর চেয়ে বড় কিছু শিক্ষা আমার দরকার। সেই শিক্ষা জীবন যাপনের। ক্ষুদ্র চোখে আমরা যা দেখি তা যথেষ্ট নয়, চাই ব্যাপক দৃষ্টি। কোন কিছু দেখলে তার সবটা দেখা চাই, কোন কিছু জানলে তার সবটা জানা চাই। কে শেখাবে আমাকে?

ছেলেটি মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলল—আমি তখন গুরুর সন্ধানে বেরোই। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়, সংসারী হওয়ার জন্যই। কিন্তু এমন সংসারী যার ইন্দ্রিয়গুলি ক্রটিমুক্ত। যে স্থির, আত্মবিশ্বাসী, যে ভুল করে না।

বাবা খুশী হয়েছিল হয়ত। অনেকক্ষণ আলাপ করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি এক পলকমাত্র দেখেছিল শ্যামাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তোলে নি। কিছু জিজ্ঞেস করে নি। তবু শ্যামা জানত, সে শ্যামাকে পছন্দ করেছিল।

বাবা কেবলই দ্বিধা করতে লাগল। সন্ন্যাসী ছেলে, আশ্রমে থাকে, নিরামিষ খায়! শ্যামা কি পারবে? কয়েকবার শ্যামাকে ডেকে ওই কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। শ্যামা উত্তর দেয় নি। মনে মনে সে উন্মুখ ছিল সেই পুরুষটির জন্য। প্রস্তুত ছিল। তার মনের ভিতরে শাঁখ, উলুধ্বনি বেজেছিল ঠিকই। কেউ শোনে নি।

বাবার উত্তর না পেয়ে তারা আর আসে নি। কী হল সেই ছেলেটির কে জানে! মানুষ যে কোথায় যায়।

নির্জন মসজিদের চত্বরে শ্যামা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। মনে এক অভিমান। কার ওপর কে জানে! হয়ত দাদার ওপর! কেন তুই পাগল হয়ে চলে গেলি? দ্যাখ তো, আমাদের কী করে রেখে গেছিস! ফিরে আয় লক্ষ্মী দাদা আমার, একটা ঝুঁকে-পড়া দিক তুলে ধর। আমরা চারজন হলে সংসারটার দাঁড়ানো হয়। কেন যে চলে যাস তোরা! কেন যে চলে যায় মানুষ! দূরে যায়! মরে যায়! হারিয়ে যায়! কেন রে! কোথায় গেল মেহেদীরঙা দাড়িওলা হাজিসাহেব? কোথায় সেই কাশীর পেয়ারাগাছ? আর সেই মসজিদের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দোলনচাঁপা? কি সুন্দর গন্ধ তার! কিছু নেই দ্যাখ। কেন রে হারিয়ে যায় মানুষ? গাছপালা!

মাঝে মাঝে তার অভিমান হয় মা বাবার ওপরেও। কেন তোমাদের অত শোক? উৎসবের মত শোক তোমাদের। মন খুঁড়ে তোমরা দুঃখ তুলে আন রোজ! দুঃখই তোমাদের ভাল লাগে। নইলে কেন ভুলতে পার না? পাছে ভুলে যাও সেই ভয়ে রাত জেগে তোমরা ছেলের কথা বল, অবসর সময়ে বসে ভাব ধ্যান কর। কেন? ভাল লাগে বলে? ঘরের বাতাস তোমাদের সেই দুঃখের ভার নিয়ে ভারি হয়ে থাকে। এক কলি গান গাইতে পারি না আমি, মনে হয় বুঝি গান গাইলে বাড়ির ভিতরে দুঃখের পবিত্র মূর্তিটি—যা তোমরা রচনা করেছ, তা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে! আয়নায় মুখ দেখতে যাই, অমনি মনে হয়—আয়নায় মুখ দেখছিস মুখপুড়ি, তোর না দাদা নেই? যে ছিল তোর খেলার সাথী, প্রিয়জন—সে না নেই!

অভিমান তার নিজের ওপরেও। কেন যে বড় হতে গেলাম! কেন যে বুঝতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম, টের পেতে শিখলাম! কী দরকার ছিল এ সবের? তার চেয়ে জন্মে শিশু হয়ে থাকলাম না কেন? সেই তো ভাল হত সবচেয়ে! অবোধ শিশু হয়ে চেয়ে থাকা! কেবল বিস্ময় আর

আনন্দ। খিদে মিটলেই ঘুম! আর আহ্লাদ!

অভিমান আরও অনেক শ্যামার। বুক টৈ-টুম্বুর করে। এমনই কপাল তার! দেয়াল টপকে নয়ন এসে চিঠি রেখে যায় ঠিক। ভোরবেলা প্রায়ই চিঠি পায় সে। তাদের বাসার দুটো ঘর। সামনের ঘরে বাবা মা, পিছনের ঘরে সে। তার শিয়রের জানালার পাশ দিয়ে মেথর বা কয়লাওলা আসার একটা গলিপথ। গলিটা বাড়িরই অংশ, উঁচু দেয়াল, সামনে দরজা। কড়াক্কড় করে শিয়রের জানালা বন্ধ করে শোয় শ্যামা। তবু সকালে উঠে যখনই জানালা খোলে, ভোরের প্রথম আলোটি, কি শীতের কুয়াশা কিংবা রূপোলী বৃষ্টি দেখে দিনটা সুন্দর লাগে, মনটা ভাল হয়ে যায়, তখনই দেখতে পায় জানালার খাঁজে নীল খাম, কিংবা, ভাঁজ করা চিঠি। সব চিঠিতেই সে এক কথা—'বিয়ে কর, না হলে মরব।' কিংবা—'মেরে ফেলব শ্যামা, জান তো আমি খুনে!' চিঠি দেখে মনটা ঝাঁৎ করে ডুবে যায়। মা বাবা দেখার আগেই সে চিঠি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, উনুনে দেয়। চোখে জল আসে। বাইরে কোকিল ডাকলে, মাটির বেহালা বাজলে, বৌ-কথাকও কথা বললে, শ্যামা চমকে ওঠে। নয়ন নয় তো! কপাল!

ইচ্ছে করলেই পিকনিক যেতে পারত সে। হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসত। কিন্তু সব ঘটনা মিলে-মিশে একটা গভীর অভিমান বুকে থম্ ধরে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। কষ্ট পা শ্যামা, আরও কষ্ট পা। গান গাস নে, কোথাও যাস নে, মুখ দেখিস নে আয়নায়। তোর আনন্দ পেতে নেই।

গাছের ছায়ায় শিশির এখনও শুকোয় নি! পায়ে পায়ে জল ঝরে পড়ছে। হাঁটতে শ্যামার ভালই লাগে। একা। মসজিদ বাড়ির এই পোড়ো ভাবটা তার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে সে দাদার সঙ্গে কত খেলেছে! কিছুই ভোলে নি সে। এখানে সে এবার থেকে আসবে। রোজ। বসে থাকবে একা একা।

অভিমানটা বিকেল পর্যন্ত রইল।

পাঁচটা নাগাদ তার পিসতুত দিদি কমলা আর তার স্বামী শঙ্কর ট্যাক্সিতে এসে হাজির। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকেই হাঁক-ডাক শুরু করল শঙ্করদা—শ্যামা, শীগগীর সাজপোশাক করে নাও, সিনেমায় যাচ্ছি। তোমার

টিকিট কাটা আছে।

ওর ঐরকম। আগে থেকে খবর দেবে না, হঠাৎ এসে হুড়ো দেবে।

—বুঝেছি, কারও টিকিট বাড়তি হয়েছে, তাই আমাকে নিতে এসেছেন! শ্যামার গলায় সকালের অভিমানের রেশ এখনও।

—মাইরি না, তোমার মুখখানা মনে করেই কেটেছি।

—যদি এসে আমাকে না পেতেন?

—তাহলে বেচে দিতাম। হিট ছবি, বেচলে দু-চার আনা বেশীই পেতাম। জলদি কর।

—আমি যাব না।

কমলা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—যাবি না কী? তোর ইচ্ছেয় না কী। পুজোয় যে পিওর সিল্কটা মামা দিয়েছে সেটা পর আজ। কি যে করিস ভাল শাড়িগুলো দিয়ে। সব জমিয়ে রাখছিস বাক্সে।

—ইচ্ছে করছে না রে কমলাদি। মন ভাল নেই।

—ওমা। সে আর নতুন কথা কী! তোর আবার কবে মন ভাল থাকে?

—যাঃ! কবে মন খারাপ দেখেছ?

শঙ্করদা বলে—ওটা ওর ব্যক্তিত্ব কমলা। অনেক মেয়ে আছে যাদের মন খারাপ থাকলে ভাল দেখায়।

—ইয়ার্কী হচ্ছে? শ্যামা হাসে।

—মাইরি না, তোমার চোখ দু'খানা যা ঢুলু ঢুলু, ওতে হাসি ছ্যাবলামি ভাল খেলে না। মন খারাপ তোমার থাক শ্যামা, কেবল মাঝে মাঝে একটু মুখোশ খুল, বাব্বাঃ, মেয়েরা সুন্দর দেখাবার জন্য যে কত কষ্ট করতে পারে! একটা মেয়ে ছিল যাকে বাঁ দিক থেকে বেশী সুন্দর দেখাত, সেই থেকে তার অভ্যাসই হয়ে গেল লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে বাঁ দিকে ফিরে থাকা, ঐ ভাবে মেয়েটার একটা দোষ দাঁড়িয়ে গেল, সোজা হয়ে কথা বলতে পারে না, তাকাতে পারে না, বাঁ দিকে কেতরে তাকায়, কথা বলে। ঘাড়ে ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। কী জ্বালা!

—আমি সেরকম নই মোটেই।

—তোমাদের সেই সন্নিসি ডাক্তার আমাকে বলেছিল—মেয়েটি ভারী দুঃখী মনে হয়। দুঃখীরাই ভাল, তারা ঈশ্বর সকাশে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

—কোন্ সন্নিসি ডাক্তারের কথা বলছ? কমলা জিজ্ঞেস করে।

—ঐ যে অরিন্দম ব্যানার্জি এম-আর-সি-পি, দেওঘরের আশ্রমে যে আছে সে-ই। আমি তো ঐ একটা সম্বন্ধই এনেছিলাম শ্যামার। সবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটু ডিফেক্ট ঐ সন্ন্যাসটা। ওটা না হলে....

শ্যামা কথা বলল না, বুকটা একটু চমকাল মাত্র।

ট্যাক্সিতে শ্যামা আর শঙ্কর দুধারে বসেছে, মাঝখানে কমলা। পাড়ার মোড়টা পেরোতে গিয়ে একটা চায়ের স্টল আর রক দেখিয়ে শঙ্করদা বলে—শ্যামা, এ সব অঞ্চলের ছেলে-ছোকরাগুলো গেল কোথায়! দিন-রাত আড্ডা দিত, চুরি-ছিনতাই করত, টিটকিরি দিত! সব হাপিস হয়ে গেল না কি?

—কী জানি! দেখছি না তো! পাড়াতেও ঘোরে না।

জিভ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করে শঙ্করদা বলে—হাপিসই হয়ে যাচ্ছে শ্যামা। খুব ধরপাকড় হচ্ছে তো! কিছু পুলিস নিয়ে গেছে, কিছু মরেছে নিজেদের হাতেই, কিছু পালিয়েছে। সব পাড়াতেই ছেলে-ছোকরা কমে যাচ্ছে। আফশোসের কথা।

শ্যামা হাসে—কেন?

—তোমাদের খাঁটি অ্যাডমায়ারার তো এরাই ছিল!

কমলা ধমক দেয়—থাম তো!

—থামবার কী! আমার তো মনে হয় তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাডমায়ারার ছিল কাবুল, ভুল বানানে প্রেম পত্র লিখত, কিন্তু কী ভালবাসা! তোমার বিয়ের পরই কাবুল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল না?

—ওকে অ্যাডমায়ারার বলে না।

—ওরাই খাঁটি অ্যাডমায়ারার। শ্যামা, তোমারও একজন আছে না? নয়ন না কি যেন নাম!

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

—সে এখনও বেঁচে-বর্তে আছে তো? না কি হাপিস হয়ে গেছে?

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে বলল—শঙ্করদা, ওকে কিছু করতে পারেন না? বড্ড জ্বালায়।

—রিসেণ্টলি কিছু করেছে না কি?

—করেছে।

—কী?

—বাবা মার সঙ্গে কদিন আগে একটা মন্দিরে গিয়েছিলাম না। সেইখানে ও পিছু নিয়েছিল। একটা মস্ত আমবাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাবা মা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমি বুনো ফুল তুলতে দাঁড়িয়েছি, সেই সময়ে আমার রাস্তা আটকেছিল। সাহস বড় বেড়ে গেছে।

—কাছে আসার চেষ্টা করেছিল না কি?

—হুঁ!

শঙ্করদা একটু চুপ করে থাকে। কমলা বলে—ভাবিস না। ওরা ঐরকম। কাবুল আমাকে কম জ্বালায় নি।

—ও মাঝে মাঝে আমাকে খুন করবে বলে শাসায়। শাসানিটা মিথ্যে নয়, ও পারে। বলল শ্যামা।

শঙ্করদা চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে একটু। বলে—কী করব শ্যামা, এদের মুকাবেলা করতে হলে একটা প্রস্তুতি দরকার। দুঃখের বিষয় আমার তা নেই। ভদ্রলোক হয়েই গেলাম। দেখি যদি কিছু করা যায়।

উদ্বেগ নিয়ে কমলা বলে—তুমি আবার কী করবে? নয়নকে আমি চিনি। রাসবিহারীতে যারা একজন এস-আইকে মেরেছিল ও তাদের দলে ছিল। এসব এলিমেন্টের সঙ্গে খবরদার লাগতে যেও না। শ্যামার পিছনে ঘুরছে ঘুরুক। শ্যামার একটা বিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সন্ন্যাসিঠাকুরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা ভাল কর নি শ্যামা। মানুষটার মধ্যে একটা ভারী সৎ ব্যাপার ছিল। শঙ্করদা বলে।

শ্যামা মৃদু শ্বাসের স্বরে বলে—আমি কী করব?

কমলাও বলে—ও কী করবে? ওর মতামতের কোন দাম আছে না কি! মামা আর মামী কেবল ছেলে-ছেলে করে ক্ষেপে থাকলে ওর কোনদিন বিয়ে হবে না। ওঁদের মতামত ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। হ্যাঁরে শ্যামা, নয়ন কি রাড়াবাড়ি করছে খুব? আগে তো কেবল চিঠিটিঠি দিত, আর কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত?

থমথমে মুখে শ্যামা বলে—এখনও যায়। আমার কিছু ভাল লাগে না কমলাদি।

কমলা মুখ ফিরিয়ে শঙ্করদার দিকে চেয়ে বলে—তোমার খোঁজে আর ছেলে নেই? কত তো আড্ডা দাও বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাও না? আমি কালই একবার উমার বাসায় যাব তো, আই-সি-আই-এর একজন এঞ্জিনীয়ার ছেলে আছে ওর পাশের ফ্ল্যাটে,

দুবার বিলেত গেছে...

—ওসব বিলেতবাজ পাত্র ছাড়। খাঁটি দিশি ছেলে দেখ।

—আহা, তোমার সন্নিসিঠাকুরও তো বিলেত-ফেরত।

—সে লোকটা বিলেতের গন্ধ মুছে ফেলেছে।

—বিলেতের দোষ কী। তোমার যত.....

—কিছুই না। কিন্তু কমলা, ইংরেজ আমলেও বিলেত-ফেরতের এত কদর ছিল না এখন যতটা হয়েছে। বিলেত-ফেরত নিয়ে এখন হাঁই কম্পিটিশন, সুবিধে হবে না। তার চেয়ে দিশি পাত্র যোগাড় করা সোজা।

—তাই দেখ না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। মামা-মামীর উদাসীন ভাব আমার ভাল লাগে না। শেষে দেখ আইবুড়ো থেকে থেকে লাবণ্য ঝরে যাবে, গালে মেচেতা ধরবে, তখন যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। শ্যামা, তুই ভাবিস না রে, কাল থেকেই আমি লাগছি।

শ্যামা ম্লান হাসে।

বিকেলটা তবু ভালই কাটল। সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়াল শঙ্করদা।

শ্যামার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, সেই ছেলেটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমরা অন্য পাত্র খুঁজবে কেন। সেই তো বেশ ছিল। কিন্তু শ্যামার বড় লজ্জা করে।

শঙ্করদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—শ্যামা, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সব মেয়েরই কিছু স্যুটার জোটে। তোমার তেমন কেউ নেই? আমি শুনেছি, তোমার অনেক স্যুটার।

শ্যামা চায়ের কাপে মাথা নীচু করে বলে—ছিল তো।

—তাদের কাউকে পাত্তা দাও নি, না?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলে—না। তারপর হাসতে থাকে।

—তোমার সবই ভাল, কেবল ঐ একটাই ডিফেক্ট। তুমি ভারী ভীতু আর আনস্মার্ট।

কমলাদি ঝঙ্কার দিয়ে বলে—আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই। যা আছে বেশ আছে। যারা নিজে বর খুঁজে বিয়ে করেছে তারা কিছু বেশী সুখে নেই।

—তুমি বড্ড সেকেলে। শ্যামা, তোমার মত কী?

—শঙ্করদা, আমি কিছু বুঝি না।

—কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ সে সম্পর্কে কখনও কোন আইডিয়া কর নি?

—আইডিয়া কি ধরা-ছোঁয়া যায়? আইডিয়া আইডিয়াই থাকে।

—তবু বল না।

কমলা রাগ করে বলে—বলে কী হবে? কোন মেয়েই সেরকম পুরুষ পায় না ঠিক যেমনটি সে চায়, আবার যাকে পায় তাকে নিয়েও তার চলে যায়। ভাবে, আমি এরকমটিই চেয়েছিলাম।

কমলাদি বেশ গম্ভীর মুখে বলছিল। শুনে শঙ্কর এক চোখে হেসে বলে—তা তুমি কেমন চেয়েছিলে?

কপট শ্বাস ফেলে কমলাদি বলে—তার সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না।

—যাকে পেয়েছ তাকে নিয়ে চলছে তো?

—নিজে বুঝে দেখ।

—বুঝেছি।

—শ্যামাকে জ্বালিও না। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ওর তেমন কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। ও সত্যিকারের ভাল মেয়ে।

শঙ্করদা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—সত্যি? কখনও ভাবী স্বামীর কথা, ভাব না? কখনও না?

শ্যামা একটু হাসে। ম্লান সেই হাসিটি তার। বলে—ভেবেছি।

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে শঙ্কর—কেমন?

শ্যামা চোখটা একটু বোজে। শীর্ণ, কালো, দীর্ঘ একটি আবছা চেহারা দেখতে পায়। চোখ দু'খানা উজ্জ্বল এবং আবিলতাহীন। আস্তে করে বলে—তেমনি পুরুষ যে খুব ভালবাসবে। খুব। কখনও দোষ ধরবে না আমার। আর সে নিজে খুব ভাল হবে। আর কিছু না।

শঙ্করদা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বলে—দূর! ও থেকে কিছু কি বোঝা যায়। ভাবলাম কী না জানি সব স্পেসিফিকেশন শুনব। যাঃ! এই বেয়ারা, বিল!

—হতাশ হলেন?

—হব না? ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার কিংবা স্মার্ট কিংবা সুন্দর—কত কী স্পেসিফিকেশন ছিল। তুমি সত্যিকারের ভাল মানুষ শ্যামা। ভাল মানুষকে

আজকাল কী বলে জান তো?

—কী?

—লেদ্রু। তুমি পারফেক্ট লেদ্রু।

কমলাদি বলে—ও ঠিক বলেছে। মেয়েদের পছন্দসই পুরুষ হওয়া অত সোজা নয়। ন্যাং ন্যাং করে অনেকেই ঘোরে পেছনে, জোর করে ভালবাসা আদায় করে। কিন্তু পছন্দসই পুরুষ খুব রেয়ার।

শ্যামা কমলাদিকে ঠেলা দিয়ে বলে—কী যা তা বকছ কমলাদি! শঙ্করদাও তো বলতে পারে পুরুষদের পছন্দসই মেয়েও আমরা কেউ নই।

কমলাদির চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, স্বামীর দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলে—বলুক না! বলে দেখুক!

সিগারেট মুখে শঙ্করদা হেসে হাতজোড়া করে বলে—আমি বলি নি। বলছি না। আমি যেমনটি চেয়েছি তেমনটিই পেয়েছি। শ্যামা, তোমার কমলাদিকে যৌবনের কাননদেবীর মত দেখতে নয়?

—আমি তো দেখি নি। তবে অনেকটা সেরকমই মনে হয়। বলে হাসে শ্যামা।

—দেখ নি! বলে ভারী অবাক হয় শঙ্করদা—দেখ নি কানন দেবীর ছবি?

—কী করে দেখব? আমাদের সময়ে সে সব ছবি তো দেখান হয় না।

একটু গুম হয়ে থেকে শঙ্করদা বলে—বাস্তবিক আমাদের কত বয়স হয়ে গেল! আমরা কৈশোরকালে কাননদেবীর গান গাইতাম, ছবি দেখতাম। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ বোধহয় এইটাই। আমাদের সময়কার ক্রেজ্ তোমাদের সময়কার বিস্মৃতি! আরে বাঃ!

কমলাদি বলে—ওঠ, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমি আমার মত দেখতে। কারও কৈশোরের হিরোইন হতে চাই না, আমি যেমন ঠিক তেমনি।

—সবাই তাই কমলা। কিন্তু শ্যামা, তোমাকে ঠিক বোঝা গেল না। কমলাদির সামনে লজ্জা পাচ্ছ বলতে। বুঝতে পারছি। একদিন না হয় আমাকে গোপনে তোমার স্পেসিফিকেশনটা জানিয়ে দিও।

ফেরার সময়ে ট্যাক্সিতেও একবার শ্যামার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই লোকটা এখন কোথায়! জিজ্ঞেস করল না।

শঙ্করদা কমলাদির ওপাশ থেকে ঝুঁকে বলল—শ্যামা, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হব। তোমার স্পেসিফিকেশন থাকলে বল, বিশেষ কাউকে পছন্দ থাকলে তাও বল, নেগোশিয়েট করব।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে কেবল। বলে—বিয়ের চেয়েও আমার একটা চাকরি বেশী দরকার।

—কেন?

—বাবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটাও বোধ হয় শীগ্‌গীরই হবে, দাদার জন্য এত উদ্বেগ ইদানীং, মোনা ঠাকুর বলেছে হরিদ্বার বা হৃষীকেশ কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমরাও চললাম বুনো মোষ তাড়ালে। এই শরীরে বাবার ঐ-সব দূর দেশে, পাহাড়-টাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে কী যে হবে! আমার সব সময়ে বাবার জন্য ভয়। কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

—ভেব না শ্যামা।

—ভাবনা কি কারও পোষ মানে? ভাবি, বাবার কিছু যদি হয় তবে আমাদের কী হবে! একটা চাকরি থাকলে তবু ভরসা থাকে।

কমলাদি মাথা নেড়ে বলে—চাকরি দিয়ে কি হবে রে মুখপুড়ি! মামার টাকা কিছু কম নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির অ্যাতো টাকা রয়েছে ব্যাঙ্কে, বাড়িটাও তো অনেকটা হয়ে গেছে। তোর চিন্তা কী?

—আমার বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে।

—ওমা! খরচ তো ঐ একটাই। মামা-মামীর মত এমন লাইট ফ্যামিলি কটা আছে! চাকরির চিন্তা ছাড়, তোর বিয়ে দিয়েও মামার অনেক থাকবে। মামা খুব কেপ্পন ছিল, জমিয়েছে অনেক।

—যাঃ!

—যাঃ বলিস না শ্যামা। মামার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল খাওয়ার। খাওয়া-খাওয়া করে চিরকাল পাগল। আমকাতল, চিতলপেটি, ইলিশ ভাপে, মুড়োর ডাল—এইসব নিয়ে সারাটা জীবন খরচ করল, মামীর গায়ে একটা গয়না বা দামী শাড়ি দেখলুম না। কেপ্পন বলব না তো কী? তোর বিয়েটাই বা মামা দেব-দিচ্ছি করে দিল না কেন? কত ভাল সব সম্বন্ধ এসেছিল! খরচের ভয় না তো কি?

—কী সব বলছ? বলে ধমক দেয় শঙ্করদা।

—ঠিকই বলছি। পাগলের কি চিকিৎসা নেই? দিলীপ তেমন পাগল

তো ছিল না। একটু আনব্যালান্সড্ ছিল, তা রাঁচী বা লুম্বিনিতে রাখলে ভাল হয়ে যেত না? মামা গেল কবিরাজী আর হোমিওপ্যাথী করতে। মামী কত দুঃখ করেছে, ঝগড়া করেছে। শ্যামা, কিছু মনে করিস না, দিলীপকে খুঁজে পেতে এখন যে খরচ হবে তার অর্ধেক খরচে দিলীপের চিকিৎসা করে ওকে ভাল করা যেত। খাওয়ার খরচ ছাড়া মামা আর কোন্ খরচটা করেছে! নইলে বাড়িটা.......

শঙ্করদা ব্যগ্র ভাবে প্রসঙ্গটা ঘোরায়—খাওয়া ছাড়া বাঙালী যে কিছু বোঝেই না। রোজ ট্রামে-বাসে রাস্তায়-অফিসে যত আলোচনা শুনি সবটাই খাওয়ার। পলিটিক্সের কথা, সাহিত্যের কথা, দর্শনের কথা, সব কথার মধ্যেই বাঙালী ঠিক খাওয়ার কথা তুলে ফেলবে। বাঙালী খাওয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যায়। মামার দোষ কী?

—কথা ঘুরিও না। আমার রাগ হয়।

শঙ্করদা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে—কার ওপর?

—পুরুষ জাতটার ওপর। ভারী নিমকহারাম। আর স্বার্থপর।

শঙ্করদা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

ওদের বিয়েটা ভালবাসার নয়। কিন্তু ভালবাসাটা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। ওদের কাছে গেলে সেই চাপা স্রোতস্বিনীর কুল কুল শব্দ পাওয়া যায়। ওরা গতিময়, বহমান। শ্যামার মন চনমন করে। আলোকলতার শরীরে যখন আঁকশি জন্মায়, ছোট্ট ছোট্ট কোঁকড়ান বাহুর মত শূন্যে প্রসারিত হয়ে অবলম্বন ধরতে চায়। তেমনি শূন্যতার মধ্যে শ্যামা একজনকে খোঁজে। প্রকাণ্ড গাছের মত সে। ঝড়ে-ঝাপটায় স্থির।

দিনটা ভালই কেটে গেল শ্যামার। আবার কাটলও না। সারাটা রাত তার বুকের এক ধারটা, মনের এক ধারটা ফাঁকা লাগল। আজ রাতে সে স্বপ্ন দেখল না, কিন্তু ঘুমটাও তেমন হল না গভীর। সকালে খানিকটা বেলায় উঠে তার ক্লান্তি লাগল খুব। শিয়রের জানালা খুলতেই দেখল রোদ আজ বড় তেজী। ফটফটে। জানালার খাঁজ শূন্য। নয়ন বেশ কিছুদিন হল চিঠি রেখে যাচ্ছে না। নয়নের হল কী?

কাকভোর। পাখীর ডাক সদ্য শোনা যায়। শিশির-ভেজা মাটির গন্ধ

এখন বাইরে। উঠোনে হলুদ-গাঁদা আলো করে ফুটেছে। শিউলি জমেছে গাছের তলায়। দিনের আলো সব মানুষকেই বাইরে ডাকে।

অবিকল মুর্গীর ডাক শুনে সুকুলের ঘুম ভাঙল। তড়বড় করে উঠে বসে সে! বাবাকে নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলে—বাবা ঘরের ভিতরে মুর্গী ডাকছে গো।

জগদীশ পাশ ফিরে ঘুমচোখে সুকুলের দিকে চায়। সুকুলের চোখে-মুখে সব সময়ে একটা অবাক ভাব। নতুন মেলায় গেলে কচি-কাচাদের যেমন হয়, যতই দেখে মেলার বাহার ততই বাক্য হয়ে চেয়ে থাকে, তেমনই সুকুলের চার ধারে দুনিয়ার মেলা লেগেই আছে। তার বিস্ময় ফুরোয় না। ছেলেটি জগদীশের। জগদীশেরই। আর কার? যারা বলে যে তা নয়, তারা নিষ্ঠুর, তারা মিথ্যেবাদী! এই ভোরে বন্ধ ঘরের ভিতরে আবছায়ায় সুকুলের সরল মুখশ্রী দেখলে বুকের ভিতরে যেন ধূপগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর সব ভুল পড়ে যায়।

জগদীশ মৃদু গলায় বলে—মুর্গী নয় বাবা, ও নয়নখুড়ো।

সুকুলের গালের এক ধারে এঁড়ানীর দাগ, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। চুল হামলে পড়েছে কপালে, কিছু উঁচিয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে কান ঢেকে। সব মিলিয়ে এক যশোদাদুলালের ছবি।

—নয়নখুড়ো? দেখি তো!

বলে মশারি তুলে লাফিয়ে নামে সুকুল!

এই ভোরে নয়নের ওঠার কথা নয়। বহুকাল ধরেই ঘুমহীনতার রোগ তার। মাঝে-মধ্যে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তার প্রিয় বড়ি সোনেরিল। ক্রমশঃ বড়ির মাত্রা বেড়ে বেড়ে এখন একসঙ্গে তিনটে চারটে খায়, কখনও বা তারও বেশী। তারপর এক ধরনের আচ্ছন্নতা নিয়ে পড়ে থাকে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও হিজিবিজি চিন্তা করে। কখনও সে ডাক্তার দেখায় নি।

জগদীশ সেই রাতের ঘটনার পর মাঝখানের দরজা বন্ধ রাখে। কেউটে দুটোর বিষদাঁতও কামিয়ে ফেলেছে। কিছু দেখার নেই। সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে, ঘরে পায়চারী করে আর সিগারেট খেয়ে কাটায় সে। মাথা অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তখন দরজা খুলে উঠোনে যায়। তারা-ভরা আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ে, টুপটাপ পাতা খসার শব্দ। গাছেরা অলক্ষ্যে নিষ্পত্র হয়ে যাচ্ছে। আজকাল দু'তিনটে দমকা বাতাসে

গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। গভীর রাতে তারের যন্ত্রের মত ডাকে ঝিঁ ঝিঁ, কাঁদে শেয়াল-কুকুর, বাদুড় ডানা ঝাপটায়। জ্যোৎস্নায় ভোরের স্বপ্ন দেখে ভুল করে জাগবার ডাক দিয়ে ককিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাখী। তখন কালিঢাকা আকাশের পশ্চিম প্রান্ত-সীমায় চাঁদ নেমে ঝুলে আছে। নিষ্পত্র গাছের শেষ হলুদ পাতাটির মত দুল্ দুল্ করছে ক্ষয়া ভাঙা চাঁদ, ভোরের প্রথম বাতাসেই খসে পড়ে যাবে। নিঃঝুম দৃশ্যটির দিকে চেয়ে থেকে নয়নের আচমকা মনে হয়—এখানে কেন পড়ে আছি? কী চাই আমি?

উত্তর তার জানা নেই। সে এমন অনেক কাজ করে যা কেন করে তা তার জানা থাকে না। এক রকম নেশারু ঘোরের মধ্যে সে চলে। রেগে যায়, উত্তেজিত হয়। কামুক হয়ে পড়ে। এক সময়ে মনে হয় শ্যামাকে ছাড়া সে আর একদিনও বাঁচবে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, শ্যামাকে দিয়ে কী হবে? তার কাছে চার দিক সব সময়েই আলো আঁধারি। যেন বা তার জীবনযাত্রা কেবলই এক বনভূমির ছায়ায় ঢাকা আবছায়া পথটি বেয়ে। দিনের আলো আছে, আবার নেইও। কিছুই স্পষ্ট নয় সেখানে। এই অনন্ত বনভূমিটি কোনদিন ফুরোবে না, মনে হয়।

ভোরের প্রথম পাখীটি যখন ডাকল তখন পূবের আকাশ ছাইরঙা। একা ভূতের মত নয়ন উঠোনে দাঁড়িয়ে। স্থির ও একাকী। পাখীরা ক্রমে তার চারধারে ডাকতে থাকে। তারপর ওড়ে। দূরে ব্রাহ্মসময় ঘোষণা করে মুর্গীর ডাক। সারা ভোর জুড়ে নানা শব্দের আজান ধ্বনিত হয়। তখন হিমে ভিজে গেছে নয়নের চুল, তার গা বরফ, চোখে শীতের অশ্রুবিন্দু। শরীরের বোধ তার নেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নির্ঘুম, জ্বালা-ধরা চোখ সে একবার হাতের পিঠে মুছে নেয়।

ভোরে এই যে চতুর্দিকে জেগে ওঠা এটা টের পেয়ে নয়নের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করে নড়ে যায়। যার ঘুম নেই, তার জেগে ওঠাও নেই। এই সুন্দর ভোরবেলাটির সঙ্গে নয়নের নিজস্ব চেয়ে থাকার কোন মিল নেই। ভারী একা লাগে তার। ভয় করে সে কেন ঘুমোয় না?

ঘরে এসে নয়ন তার পার্সটা আর একবার খোঁজে। কোণায় কি খাঁজে যদি এক আধটা বড়িও খুঁজে পাওয়া যায়। নেই। সে জানে। কাল রাতেও খুঁজেছে। হতাশ নয়ন আবার পায়চারী করে কিছুক্ষণ।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় নয়ন, র‍্যাপারের মত। দরজা টেনে শিকলি দিয়ে বেরোবার আগে অবিকল মুর্গীর মত একবার

দু'বার ডাক দেয়। পাশের ঘরে সুকুলের গলার স্বর পায়। বাবাকে ডেকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে সুকুল। জগদীশ উত্তর দিল।

উঠোনটা পার হয়ে সে রাস্তা ধরে। ঝোপঝাড়ের পাশে রাস্তাটা আঁকাবাঁকা কেমন পড়ে আছে। সাদা হাড়ের মত রঙ। আবছায়া এখনও। পূবে কেবল ফ্যাকাসে রঙের ওপর লাল একটা ছোপ ধরেছে। গাছপালায় ঝুলে আছে অন্ধকার। পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাস শ্বাসে ঢুকে বুক চিরে দিচ্ছে।

কোথাও যাওয়ার নেই। তার পথ সবদ্দিকে খোলা। দূর থেকেই মোনা ঠাকুরের পুরোনো মন্দিরের ওপর জাপানী ছবির মত একটা অশ্বত্থচারাকে আকাশের গায়ে আঁকা দেখা যায়। পৃথিবীর সব মন্দিরের গায়েই বোধহয় অলক্ষ্যে অশ্বত্থচারা জন্মেছে এখন। গভীর শিকড় নেমে যাচ্ছে মন্দিরের অভ্যন্তরে নালী ঘায়ের মত। মোনা ঠাকুরদের দিনকাল শেষ হয়ে এল। খামোখা আলু টপকাবার পরিশ্রম। দরকার নেই। অশ্বত্থের চারাটি মুখ উঁচিয়ে তো বলেই দিচ্ছে, শেষ শুরু হয়ে গেছে। দেরী নেই।

নয়ন নাবাল মাঠটি থেকে মন্দির চত্বরে উঠে আসে। নির্জন। কেবল পাখীর ডাক, আর পতনশীল পাতার শব্দ। একবার সে মন্দিরটার মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোহার গুল বসানো ভারী দুটো কাঠের পাল্লা বন্ধ। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

মাটিতে পড়া ফুলে পুজো হয় না। রাতে তাই শিউলিতলায় কাপড় বিছিয়ে রাখে তারা। সকালে কুড়িয়ে নেয় রাশি ফুল। শিউলিতেই ভরে যায় সাজি। তারপর স্থলপদ্ম আর জবা।

স্থলপদ্ম এ সময়টায় রাশি রাশি ফোটে। নীচু ডালগুলো শেষ করে তারা আঁকশি দিয়ে উঁচু একটা ডাল নুইয়ে আনছে। ফুলটা এসেও গেছে আঙ্গুলের ছোঁয়ায়! আর একটু.....একটু.....। টুপ করে এক-ফোঁটা হিম শিশিরের জল তার গালে পড়ল। হাসল তারা। ডালটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে গাল মুছল। শীত করে তার। বড্ড শীত করে। পদ্মটা পাড়ল না তারা। থাক একটা দুটো পদ্ম। গাছের ফুল গাছে থাক।

কুয়োর পাড়ে জবা গাছটা ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে। ঝুপসী। ফুল তুলবার আগে তারা এই আবছায়া ভোরের আলোতে কুয়োয় ঝুঁকে জল দেখল। জল নীচে নেমে গেছে অনেক। সেই কোন্ পাতালে একটা গোল আয়না বসানো, তাতে ফিকে ফিরোজা রঙ। স্থির জলে তারা নিজের ছায়া দেখল। কিছু বোঝা যায় না। না রঙ, না মুখ-চোখ। একটা ভূত যেন সে। এই

ভোরবেলা ঘুম থেকে সদ্য উঠে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? কে জানে। তাদের ঘরে একটা বড় আয়নাও নেই যে দেখবে। কাঠের আয়না, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলার বন্দোবস্ত আছে। সেই ঢাকনার ওপর ফুল পাতা পাখী আঁকা, লেখা—সুখে থাক। মরি মরি, কে যে আয়নাটা কিনে এনেছিল! সেই সুখের আয়নার ঢাকনা খুললে ঢেউখেলান কাচে নিজের মুখখানা দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কম দিনই সে নিজের কোমর পর্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখেছে। যদি কখনও দিন পায় সে, একটা বড় আয়না কিনবে। নিজের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। নিজের কত কী দেখার থাকে, কেউ বোঝে না।

সবার আগে বাবার গুরুপুজো, চক্রের দিকে চেয়ে ধ্যান, জপ তারপর বিনতি প্রার্থনা। ততক্ষণ বাবা এদিকে আসবে না। তারা নিশ্চিন্তে আবছায়া ছায়াটির দিকে চেয়ে থাকে। ছায়ার পিছনে আকাশ কী উঁচুতে! সে কি খুব রোগা? ছিপছিপে, না রোগা? কোন্‌টা বলবে তাকে মানুষ? কালো, না শ্যামবর্ণ? মুখখানা কেমন তার?

অনেক পাখী-পক্ষী আর মুর্গীর ডাক সে শুনছিল এতক্ষণ। এ সময়ে ওরা তো ডাকবেই। চমকায় নি। হঠাৎ শুনতে পেল, মন্দিরের চাতালে, কি বারান্দায়, কোথায় যেন খুব কাছেই একটা মোরগ ডাকছে।

ডাকার কথা নয়। কাছাকাছি মোরগ পোষে না কেউ। পুষলেও মন্দিরে আসতে পারে বলে ছাড়ে না, বাবা শুনলে....

তারা দুই হাতে তালি দিয়ে বলল—হুশ্।

আবার মুর্গী ডাকল। পরিষ্কার ডাক। মন্দিরের বারান্দাতেই উঠে এল বুঝি! তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফুলকপি উঁকি মারছে সদ্য, ক্ষেতের ঢিবিগুলো পেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। বলল—হুশ্।

দেখা গেল না। মন্দিরের চাতাল ফাঁকা, বারান্দা শূন্য।

আড়াল থেকে আবার মুর্গী ডাকে। আনন্দিত ডাক।

তারা বেড়াটা টপকে পার হয়। পাখীর মত উড়ে আসে মন্দিরের 'বারান্দায়। হাততালি দিয়ে' হুশ্ হুশ্' শব্দ করে ছোটে। প্রথমটায় দেখতে পায় না কিছু। কিন্তু মনে হয় গোল বারান্দাটা দিয়ে একটা পায়ের শব্দ মন্দিরের দেয়ালের আড়ালে আড়ালে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হলুদ জামার অংশ চকিতে দেখা গেল। মিলিয়ে গেল দেয়ালের ওপাশে।

তারা দাঁড়িয়ে সতর্ক গলায় বলে—কে?

উত্তর নেই।

—আমি কিন্তু লোক ডাকব।

নয়ন বারান্দাটা থেকে লাফ দিয়ে ঘাসে নামে। অন্ধকার আর নেই। উঁচু গাছের মগডালে প্রথম আলোর লাল কণাটি এসে পড়েছে। আলো ফুটবার সময়টি বড় সুন্দর। ফুল যেমন ফোটে। তারপর থেকে শুরু হয় দিন। দিন তারার ভাল লাগে না। মানুষ জেগে উঠলেই পৃথিবীটা নোংরা হয়ে যায়।

নয়ন উঁচু বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মেয়েটার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শ্বাসের শব্দ। নয়ন অপেক্ষা করে। পিছনে তাকায় না। উদাস চোখে পূব দিকে চেয়ে থাকে। তার শরীরে ঘুমহীনতার জ্বালা। শরীর বুঝি বা একটু ক্লান্ত। তার খোলা শরীরের ওপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম চলে যায়, চলে যায় দিন রাত। তবু একটুও ঘুম আসে না। সোনেরিল ফুরিয়ে গেছে। আনা হয় নি। ধ্যুৎ তেরী!

মেয়েটা এগিয়ে আসে। থমকায়।

একটু চুপ। নয়ন ফিরে তাকায় না।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

সিগারেটের একটা গোল ধোঁয়া জট খুলতে খুলতে নিথর বাতাস বেয়ে উঠে আসে।

তারা ভয় পায়। কে?

নয়ন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল। তেলহীন মুখ চোখ তার, রাতে ঘুমোয় নি বলে শরীরের রস টেনে গেছে। হাসতে গিয়ে নিচের ঠোঁটটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পায় নয়ন। তার চুল রুক্ষ, চোখের কোলে কালি। মেয়েটার ভয় পাওয়ারই কথা।

সে বলে—আমি নয়ন রায়। সুকুলদের বাড়িতে—

—ও। তা এখানে কেন?

—মায়ের স্থান। আসতে তো বাধা নেই।

তারা কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে—একটা মুর্গী ডাকছিল এদিকে, সে কি আপনি?

নয়ন মাথা নাড়ে।

—কেন ডাকছিলেন ওরকম? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তারা।

—এমনিই। খেয়াল হল।

তারা একটু চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আঁচল মুখে তুলে 'খুক' করে হেসে ফেলে। সামলে বলে—কাল সুকুল বলছিল বটে একজন হরবোলা এসেছে তাদের বাড়িতে। এতক্ষণে বুঝলাম সে আপনিই তবে।

—আমিই।

সকালের আলোতে মেয়েটাকে সাদাসিধে দেখাচ্ছে। তেমন কিছু দেখার নেই। তবে কিনা যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। তাই মেয়েটির শরীর লাউডগার মত ডাঁটো, চামড়ায় ঘামতেলের মত চিকচিক। সবচেয়ে সুন্দর তার দীর্ঘ চুল। মস্ত একটা এলোখোঁপায় বেঁধে রেখেছে। নয়ন ঊর্ধ্বমুখে মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত চোখে একটু দেখল, বলল—আমি অনেক ডাক ডাকতে পারি।

তারা শ্বাস ফেলল। বলল, ওসব ডেকে কী হয়।

—মানুষ চমকে যায়। এই কথা বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসে।

তারা অস্বস্তি বোধ করে বলে—বাবা এক্ষুণি আসবে।

—আসুক না।

তারা আবার কথা হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটু। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে—ফুলের সাজি কুয়োপাড়ে ফেলে এসেছি। ঐ যাঃ! যদি কাকপক্ষী ছুঁয়ে দেয়!

বলে আবার পাখীর মত উড়ে যায় সে। পালায়।

নয়ন বারান্দায় তেমনি ঠেস দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে। বাগানে মেয়েটি এখন একা। চারদিকে ঝোপ ঝাড়, নির্জনতা। ইচ্ছে করলেই পিছু নিতে পারে নয়ন। কেউ লক্ষ্য করবে না। লক্ষ্য করলেই বা কী? নয়ন গ্রাহ্য করে না। শীতের সুন্দর বাগানে মেয়েটিকে জ্বালানো যেত। কিন্তু আজ তার সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। কোনদিন ঘুমের জন্য দুঃখ করে না সে। না ঘুমোন তার অভ্যাস। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ঘুমের জন্য তার বড় তেষ্টা পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘুমের কথা ভাবে। তার কেন ঘুম নেই?

লোকটা চাষা না ভদ্রলোক বোঝা যায় না। মালকোঁচা দিয়ে কাপড়

পরে খালি গায়ে কেমন মাটি কোপাচ্ছে দেখ। কী তেজ শরীরে, বাঁট পর্যন্ত কোদাল গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হুবহু চাষার মত মুখে নাকেঁ হুমুস শব্দে শ্বাস ছেড়ে উল্টে দিচ্ছে গভীর চাপড়া। রোদ এখন তেজী। শরীরটার থাকে থাকে পেশী সেই রোদে ঝলসায়। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, বেলা বাড়ল। লোকটার গায়ে ঘাম, থুতনীর কাছে একটা ফোঁটা দুল্ দুল্ করছে। মাটির চাপড়াগুলো রোগা হাতে একটা খুরপী দিয়ে ঠুকঠুক করে ভাঙছে সুকুল। তার গায়ে পুরোহাতা হলুদ সোয়েটার।

মেহেদীর নীচু বেড়াটা ডিঙিয়ে নয়ন জমিতে নেমে আসে। একটু দূর থেকে দেখে। সুকুলের রঙ ফর্সা, নরম-সরম গা, মুখখানা লম্বাটে ছাঁচের, চোখ দুটো দীঘল। জগদীশের সঙ্গে কোন মিল নেই। জগদীশের শরীর চৌকো, মুখ চৌকো, চোখ গর্তে, গায়ের রঙ কালোই, তবে মিশ মিশে নয়। সুকুল হয়ত তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তবে বলতে হবে, ওর মা সুন্দরীই ছিল।

নয়নের দীর্ঘ ছায়াটা সুকুলের গা ছুঁতেই সুকুল মুখ ফিরিয়ে চেঁচাল—নয়নখুড়ো!

—উম্।

—সকালে তুমি মুর্গীর ডাক ডেকেছিলে?

—হুঁ।

—আমাকে শিখিয়ে দাও।

—দেব।

—বেড়ালের ঝগড়াটা শিখিয়ে দাও নি কিন্তু। ঐ যে দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া হয় যখন গায়ে জলের ছিটে দিলে একজন আর একজনকে বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, অন্যটা বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, কি রকম করে বলে যেন? ফ্যাঁ-ও-ফ্যাঁ-অ্যাফ্যাঁস ফ্যাঁস—বলো না।

জগদীশ একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যায়। কথা বলে না। কেবল সুকুলকে ধমক দেয় একটা—আমার কোপানো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, তোমার চাপড়া ভাঙা পড়ে রইছে। থাক তবে তোমার পালা রোয়া হবে না—

সুকুল তাড়াতাড়ি চাপড়া ভাঙতে ভাঙতে হি হি করে হাসে। বলে—পোড়েলদের বুড়ো কাল বলছিল—কী কাণ্ড বাবু, এই দিনে এমন কোকিল ডাকে কেন রে? এত কোকিলের মচ্ছব লাগল কেন। কী জানি বাবু,

কোনা অলক্ষুণে ব্যাপার। জানে না তো, যে তুমি ডাক।

জামগাছটার গোড়ায় কিছু ঘাস। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নয়ন। একটু অন্যমনস্ক। রোদে পাথুরে লোকটা মাটি উল্টে দিচ্ছে। ও রাতে কী নিঃসাড়ে ঘুমোয়! তবে কি পরিশ্রমই ঘুমের ওষুধ? না কি পুত্রস্নেহ? স্বাস্থ্য নয় তো? একা শ্বাস ফেলে নয়ন। কী ভাবছে আবোল তাবোল! সব্বাই তো ঘুমোয়। ঘুম আসে বলে। তার আসে না।

পলকের মধ্যে কাঠা দেড়েক ক্ষেত কুপিয়ে ফেলে জগদীশ। এখন ক্ষেতের শেষে দাঁড়িয়ে গামছায় ঘাম মুছছে। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কোদালখানা। হেসে বলল—হেরে গেলি সুকুল! ঠুক ঠুক করে এখন সারাদিন লেগে যাবে তোর।

গামছায় গা মুছতে মুছতে জগদীশ এসে পাশে বসল। কোল থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করল। আর লাইটার। বলল—কোথায় গিছিলেন?

—ঘুরে এলাম।

—আলায় বালায় ঘুরলেন তো অনেক। কী খুঁজছেন আসলে?

নয়ন বলল—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আপনার!

জগদীশ চুপ করে থাকে। সে রাতে নয়নকে চড় মারার পর থেকেই বোধ হয় তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নয়নের সব কথার উত্তর সে দিচ্ছে না দু'দিন। বিড়িটা ধরিয়ে খব আরামে দীর্ঘ টান দিয়ে ঘন ধোয়া আস্তে ছেড়ে দিল। আরামের কাশি কাশল খুক্ খুক্ করে।

—শিখবেন?

—নিশ্চয়ই।

—তবে গুরু বলে মানুন।

নয়ন একটু তাকায়—মানে?

জগদীশ হাসে—এসব গুপ্তবিদ্যা, কাউকে শেখানো যায় না অমনি। যদি শিষ্য হয় তবে শেখানো চলে।

নয়ন একটু হেসে বলে—আপনারা সবাই এত গুরু গুরু করেন কেন? মোনা ঠাকুরও গুচ্ছের গুরুতর কথা বলে গেল সেদিন। ব্যাপারটা কী?

জগদীশ দূরের দিকে চেয়ে বিড়িটা শেষ করে। তারপর হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শহরের মানুষ গুরুর মর্ম কমই বোঝে। সেখানে সবাই

গুরু। গাঁ-গঞ্জের লোকেরা গুরু মানে, কারণ, তারা প্রকৃতির নিয়ম জানে। নিয়মই বলে দেয়, গুরু ছাড়া কিছু হয় না। উটকো লোককে কেউ কিছু শেখায় না। একটা আধবুড়ো নোংরা অশিক্ষিত লোককে গুরু মেনে, একবছর তার পদসেবা করে তবে আমি শিখেছিলাম। সে ভারী কষ্ট। লোকটাকে ঘেন্নাও হত। হেগে কাপড় ছাড়ত না, দাঁত মাজত না, গায়ে চিমসে গন্ধ, চোখে কেতুর, কথায় কথায় মেজাজ নিত, জাতেও ঠিক না। তবু লোকটার পিছুনে ঘুরতাম নেশাখোরের মত। মাঠে-ঘাটে ছিল তার সাপের বাগান, যেতে যেতে ফুল তোলার মত বিষধরদের টুকটাক তুলে নিত ঝাঁপিতে। না-কামানো সাপ বের করে সকাল বিকেল একা একা খেলত। তার সেই কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হ্যাঁ, গুরু বটে। লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবু আমি মাঝে মাঝে পাথরঘাটায় তার কবরের কাছে যাই সুকুলকে নিয়ে। বসে থাকি কবরটার পাশে। বেশ লাগে।

নয়ন চুপ করে থাকে।

জগদীশ একটু হেসে বলল—গুরু মানতে বলায় রাগ করলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলল—না। তবে আমার গুরু-ফুরুতে বিশ্বাস নেই।

জগদীশ বলে—তাহলে শেখানো চলে না।

—কেন?

—গুরু না মানলে বিদ্যেটা একদিন অবিদ্যে হয়ে দাঁড়াবে। গুরু যেন রক্ষাকবচ, সে না থাকলে একদিন বিষধরই খাবে আপনাকে। গুরুর দেওয়া নিষেধ বারণ আছে, সে-সব শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে হবে। নইলে বিদ্যে কিছু না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিয়ম ভাঙতেই জন্মেছেন। আপনি বিদ্যে নিয়ে বিপদ করবেন।

নয়ন একটু হাসে। বলে—তাহলে শেখাবেন না?

জগদীশ মাথা নাড়ে—না। বললাম তো আপনাকে কিছু শেখানো বড় বিপদ। রাতবিরেতে উঠে যদি সাপ-সাপিনীর হরগৌরী দেখতে চান তাহলেই হয়ে গেল।

নয়ন একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে—ঠিক আছে। আমি নিজেই শিখে নেব।

জগদীশ অবাক হয়—নিজে শিখবেন! কী করে!

নয়ন হাসে—কায়দাটা খানিকটা বুঝে গেছি। একটু প্র্যাকটিস দরকার। ও হয়ে যাবে।

জগদীশ গম্ভীর গলায় সতর্ক করে দেয়—ও কাজ করতে যাবেন না।

ও বড় হীন জীব। ওস্তাদ ছাড়া আর সবাই তার বধ্য। এ কেবল একটা দুটো কায়দা নয়, এ হচ্ছে একটা শাস্ত্র। সর্পচরিত্র জানা কি শুধু একটা দুটো সাপ ধরতে দেখেই হয়ে যায়?

—দেখা যাক।

জগদীশ মাথা নাড়ে—ও হয় না। আপনি না শিখে ধরতে গেলে হয় নিজে মরবেন, নয়তো সাপকে মারবেন। দুটোই খারাপ।

—আপনি সাপ মারেন না?

—উরে ব্বাস রে! মারতে পারি।

—কেন, মারলে কী হয়?

—যারা শাস্ত্র জানে তারাই জানে মারতে নাই কেন? প্রকৃতির কোন জীব ফেলনা নয়। মারতে শুরু করলে তো সবই মেরে ফেলতে পারি, তখন মাথায় রক্তক্ষরণের ওষুধ আসবে কোত্থেকে?

—ওটা যুক্তি নয়। সংস্কার।

—তা হবে। আমি অত ভাবি না। গুরুর নিষেধ আছে, তাই যথেষ্ট। জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে জীব চলে-ফিরে বেড়ায় গুরুর দয়ায়। বেড়াক।

—তবে ধরেন কেন?

—ধরি তাকে জানবার জন্য। চেনা জানা কি সাপ? যেমন মানুষ চিনি, তেমনি সাপও চিনি, পাখী-পক্ষী চিনি। কত কী জানার আছে পৃথিবীতে। সুকুলবাবা, তোমার কি হাত ব্যথা করছে?

চিকণ গলায় সুকুল উত্তর দেয়—না তো।

—চলে এসো বরং। বাকীটা বিকেলে কোরো। তোমার তো নরম-সরম হাত পা, সইবে না। রোদটাও তেজালো।

সুকুলের সুন্দর মুখখানা তেতে লাল, মুখে হাসি, হাতের চেটোয় রোদ থেকে চোখ আড়াল করে চেয়ে বলল—দাঁড়াও না, কামিনী গাছটা অবধি করি, তারপর এসে নয়নখুড়োর কাছে ডাক শিখব।

জগদীশ মুখটা ফিরিয়ে নয়নকে বলে—শুনছেন?

—কী?

—ও ডাক শিখবার জন্য আপনাকে গুরু বলে মেনেছে। আপনি কিন্তু সাপ ধরতে শেখার জন্য গুরু মানছেন না।

নয়ন হালকা গলায় বলে—কাউকে গুরু মানা আমার গুরুর নিষেধ।

—কে গুরু?

—কার্ল মার্কস।

জগদীশ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—নামটা চেনা-চেনা লাগছে। শহরে যখন বসত ছিল এক সময়ে তখন শুনতাম বটে নামটা। অনেকদিন শুনি নি।

ঠাট্টা কি না ধরার জন্য নয়ন জগদীশের মুখটা দেখল। তার ভাঙা চৌকো মুখে কোন ভাব প্রকাশ পায় না। একটা ভালমানুষী বা বোকামী সেখানে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে বলল—তাঁর চেলা একসময়ে আমিও ছিলাম। বঙ্গবাসীতে ছাত্র ফেডারেশন করতে বছরখানেক তাঁরও চেলা ছিলাম। তারপর শরীর ডাক দিল। তখন কোঁৎ পেড়ে বিশাল ওজন তুলতাম, বানরের মত রিং-এ ঘুরতাম, অনায়াসে করতাম গ্রেট সার্কেল, উঁচু-নীচু প্যারালাল বার, রোমান রিং, ভল্টিং বক্স—কত কী করতাম! ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লাহিড়িদা। গুরু। তিনি ডেকে বললেন—তোমার হবে হে। সব ছেড়ে-ছুড়ে লেগে পড়। কাছের গুরু দূরের গুরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমাকে। নইলে মার্কস সাহেবকে নিয়ে একটা তোলপাড় করার ইচ্ছে ছিল আমার।

নয়ন শান্ত গলায় বলে—আমার ইচ্ছেটা এখনও আছে।

—ভাল। বিশ্বাস থাকলেই ইচ্ছে জোর পায়। লেগে থাকুন। সাপখোপ নিয়ে ভাববেন না।

নয়ন ঠাণ্ডা কৌতুকের গলায় বলে—আপনি আমাকে ভয় পান।

জগদীশ অবাক গলায় বলে—ভয় পাই?

নয়ন আস্তে হাত বাড়িয়ে জগদীশের মাংসল প্রকাণ্ড কাঁধে রাখে, পেশী-বহুল হাতখানায় হাত বুলিয়ে বলে—এই বিশাল শরীর, শাবলের মত হাত, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন? সেই রাতে চড় কষালেন, আমি জবাবী কিছু করি নি, চড়টা মেনেই নিয়েছি। আপনিও জানেন আমাকে ঐ দু'হাতে পিষে মেরে ফেলা যায়, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন?

প্রকাণ্ড চেহারার জগদীশ কথাটা শুনে কেমন একটু কুঁকড়ে যায়, তার চোখে মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে বলল—কিসে বুঝলেন?

নয়ন এক ধরনের ঠাণ্ডা হাসি হাসে। বলে—জগদীশবাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনি চড়টা মারলেও ভয়টা আপনার উড়ে যায়

নি।

জগদীশের বিড়িটা ধরে নি। দু'একবার টিপে-টুপে সেটা ফেলে দিল সে। বলল—ঘরের দরজা বন্ধ রাখি বলে বলছেন? তা আপনার বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড-কারখানাকে ভয় পেতেই হয়। পাগুলে কাণ্ডকে কে না ভয় করে?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—আর কোন ভয় নেই?

—আবার ভয় কিসের?

—ভয় যে কিসের তা কি আমি জানি? তবে লোকে ভয় পায় দেখেছি।

—ওটা বাড়িয়ে বলছেন।

—হবে। নয়ন উদাস গলায় বলে। তারপর হঠাৎ জগদীশের দিকে চেয়ে বলে—আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?

—না। কেন?

—আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কতদিন যে ঘুমোই নি!

—ঘুমোন নি কেন?

—ঘুম আসে না। এদিকে তো কোথাও সোনেরিল বড়িও পাওয়া যাবে না।

—বকখালিতে ওষুধের বড় দোকান আছে। দেড় ক্রোশ। ওষুধ ছাড়া ঘুম আসে না?

—না। ঘুমোতে পারি না। ইচ্ছে করে পড়ে কাঠ হয়ে ঘুমোই। স্বপ্ন দেখব না, চিন্তা করব না, একবার ওরকম ঘুম ঘুমোতে পারলে একটানা কয়েকদিন পড়ে থাকতাম।

জগদীশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তারপর বলে—ঘুমোন না বটে! তাই সারারাত পাশের ঘরে মাঝে-মধ্যে পায়ের আওয়াজ শুনি। জেগে থেকে করেন কী? শরীরে আলিস্যি আসে না?

—আসে। সারা রাত কী যে যন্ত্রণা! বড় একা লাগে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছে করে। রেগে যাই। তাড়ি, বাংলা, সব খেয়ে দেখেছি। ঝিমুনী আসে। কিন্তু সে ঠিক ঘুম না।

—আমার কাছে মোদক আছে। খেয়ে দেখবেন?

—দেখেছি। যত নেশা সব করেছি। কিন্তু নেশা তো ঘুম নয়।

—ভারী মুশকিল দেখছি।

—আগে কষ্ট হত না। আজকাল হয়।

দুপুরে অনেকক্ষণ ডাক শিখল সুকুল। বারান্দায় বসে। ক্লান্তিকর, তবু অনেক রকম ডাক ডাকল নয়ন। কুকুর শেয়াল বেড়াল পক্ষী। নানাজনের গলার স্বর নকল করল। সুকুলের চোখ চক চক করল, মুখে চোখে ভীষণ কৌতূহল।

—আরও ডাক। সে বলল।

—সুকুল, একদিনে সব শিখতে নেই।

সুকুল জেদ ধরে—ডাক না, শুনি।

—এ সব শিখে কী হয়?

—আমি শিখব। আমি হরবোলা হয়ে যাব।

—কেন?

—রাস্তা দিয়ে অনেক ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি যেমন যাও। লোকে বুঝতেই পারবে না যে সুকুল যাচ্ছে। চমকে উঠবে।

—লোকে চমকাতে ভালবাসে না সুকুল। দেখ, আমাকেও কেউ ঐ জন্যই ভালবাসে না।

—আমি বাসি। খু-উ-ব।

নয়ন হাসে। হাসতে তার কষ্ট হয়। ঠোঁটে রক্ত জমে আছে। চোখে জ্বালা। সকালে একহাঁড়ি খেজুর রস নামিয়েছিল জগদীশ। অনেকটা খেয়েছে সে। শরীর ঠাণ্ডা হয় নি। জ্বরের মত লাগে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে একটু চোখ বোজে।

—এই নয়নখুড়ো, ঘুমোচ্ছ যে! চোখ খোল—বলে সুকুল তার চোখে আঙ্গুল ঠেকাতে চেষ্টা করে। চোখের পাতা ধরে টানে।

নয়নের চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বাইরে একটা সাদা চাদরের মত রোদ আজ। চেয়ে থাকলে চোখ জলে ভরে আসতে চায়।

'সুকুল' বলে বেড়ার আগলের ধার থেকে কে ডাকল। মেয়ে গলা। সুকুল টপ করে উঠে দুদ্দাড় দৌড়ে গেল।

বেড়ার ওপাশে তারা দাঁড়িয়ে। হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা কাঁসার বাটি। স্নানের পর এখন চুল এলো। পরনে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি। মোম মাজা শরীর। বোধহয় কোথাও কোন ব্রণ বা গোটা নেই। দাঁতগুলো বড় ঝকঝকে। কপালে একটা তেলসিঁদুরের বড় টিপ। চোখে কাজল দিয়ে থাকতে পারে, চোখ দুটো বড় ডাগর দেখাচ্ছে দূর থেকেও।

তারা দাঁড়াল না। সুকুলের হাতে বাটিটা দিয়ে বলল—একসময়ে চুপ করে গিয়ে বাটিটা দিয়ে আসিস।

চলে যাওয়ার আগে একবার সজল বিদ্যুৎ হেনে গেল নয়নের দিকে। এক পলক মাত্র তারপরই পিছন ফিরে বাঁশঝাড়ের আড়াল হয়ে গেল।

—কী সুকুল? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

সুকুল বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয়।

—নতুন গুড় গো! দেখ, এখনও গরম। জ্বাল দিচ্ছিল সকাল থেকে। খাবে?

—না, তুমি খাও। মেয়েটা মোনা ঠাকুরের মেয়ে না?

সুকুল মাথা নাড়ে—তারা-মা।

—মা কেন?

—আমি মা ডাকি। তারা-মা ডাকতে শিখিয়েছে। সকলের সামনে ডাকি না তো, আড়ালে ডাকি।

—কেন মা ডাকতে শিখিয়েছে সুকুল?

—ইচ্ছে। দেখ, তারা-মা কাল পিঠে পায়েস দিয়ে যাবে। যা হয় ওদের সব দিয়ে যায় চুপি চুপি।

—কেন?

—আমাকে ভালবাসে তো! পাঁচজনের সামনে দিলে নিন্দে হবে।

—নিন্দে হবে কেন?

—কী জানি! লোকে বলে বাবা নাকি তারা-মাকে বিয়ে করবে। ধ্যাৎ, বাজে কথা। বাবা বিয়ে করবেই না।

নয়ন একটু হাসে। অন্ধি-সন্ধি একটু-আধটু বুঝতে পারে সে। কোথাও একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যেখানে মানুষ সেখানেই ঘোঁট।

ভুঁইচাষ বড় প্রিয় জগদীশের। এ সময়টায় রবিশস্যের চাষ। তা থেকেও কিছু আয় হয়।

চক্ষুলজ্জা বড় জিনিস। সে চাষা নয়, জমির মালিক। আধাভদ্রলোক। অতএব বর্গাদার রাখতে হয়েছে। ছাতা মাথায় পিছু পিছু ঘুরছে সে।

চাষীটা রোগা-ভোগা বটে। ফাল তেমন গভীরে ঢুকছে না। এই যে ওপরের মাটি এ হল গে একশো বছরের পুরোনো। ওপরে হাত-তিনেক

পুরু জমি উল্টে-পাল্টে আবহমান চাষ চলে আসছে। এই পুরু আস্তর সরালে নীচে আছে সেই কুমারী। ওপরের এই বুড়ীবিয়োনী জমি দিয়ে আর কতকাল চলবে! অনাবাদী ফেলে রেখে আর কেমিক্যাল সারে এ জমি পানসে হয়ে আসছে। ফসলের ঢল নেই। গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই অনূঢ়া ভুঁইয়ের রূপ দেখতে ইচ্ছে করে তার। উঠে এস গো কুমারী, দেখি তোমার কালচে সোনা রঙ, লাঙলের ফালে ফালে ঘুচে যাক লজ্জা, ঢল দাও ফসলের। তার ইচ্ছে করে পৃথিবীর ওপর থেকে ঐ পুরু বুড়ী-বিয়োনী আস্তরটা তুলে ফেলে। কিন্তু তা হয় না। তত জোর লাঙলের ফালে নাই।

চাষীটা মারকুটে শরীর ভর দিয়ে ঠিকমত গাঁথতে পারছে না। চাঙড় উপড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে না।

—তামাক খাওগে। বুঝলে! জিরিয়ে ঠাণ্ডা হও, আমি দেখছি। বলে হাঁক দেয় সে। গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে, মালকোঁচা দিয়ে কাপড়টা পরে নেয়, গামছা বাঁধে কপালে। জমিতে নেমে যায়।

জিনিসটা বড় ভাল লাগে তার। লাঙলটা যখন সে মাটিতে গাঁথে তখনই সে মাটির গভীর নরম মায়া টের পায়। ঠিক যেন মেয়েমানুষের শরীর। পায়ের আঙুলে উঠে দু'খানা লোহা-হাতে সে চেপে ধরে হাতল। রি রি করে কেঁপে ওঠে মাটি। আনন্দে, যন্ত্রণায়। উপড়ে আসে গভীর শীতল কালচে সোনা মাটি। ভারী এক রকমের তৃপ্তি পায় সে। 'অ-ড়-ড়-ড়' বলে বলদ দুটোকে তাড়া করে। তার হু-হুঙ্কারে বলদ দুটো নিষ্পেষিত ঘাড়ে ছোটে।

—মেল ছেড়েছে গো! রোগা-ভোগা চাষীটা গাছতলা থেকে হেঁকে বলে। হাসে খুব। জগদীশের গায়ের জোর এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

ঘাম ফুটে উঠতে থাকে। শরীরে ছলাৎ ছল রক্তের শব্দ। দাঁতে দাঁত। লড়াই। উঠে এসো গো কুমারী মা, উঠে এসো। মাটি ওল্টায়, তবু জগদীশের মন ভরে না। গভীর, আরও গভীর মাটি চাই, যে মাটিতে মানুষের হাত পড়ে নি কখনো। গুপ্তধনের মত সেই মাটি কোথায় কোন্ পাতালে এখন? ভারী লাঙলটা একবার তোল্লা দিয়ে ঝাঁকিয়ে বসায় সে। র-য়ে র-য়ে ফেটে যাচ্ছে ভুঁই, চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নানা ঢঙের ঢেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাটির স্বাদ, দু হাতে মাটির কাঁপন উঠে আসে লাঙল বেয়ে। সুখ। তার সুখ এরকমই। চাষাড়ে।

দূরে মাথা তোলা দিয়ে আছে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের চূড়োর কলস। তার উপর একটা লাল নিশেন ছিল, এখন নেই। নিশেনের বদলে গজিয়েছে দুরন্ত অশ্বত্থ। বহু দূর থেকেই দেখা যায়। উত্তর দিকে চষবার সময়ে মন্দিরটা চোখে পড়ে। উল্টোবাগে ঘুরলে দেখা যায় পৃথিবীর সীমা। সেখানে ছায়ার মত গাছপালা, শিমুলের বীজ কেটে তুলো যেমন ওড়ে তেমনই উড়ে যাচ্ছে হাল্কা আঁশমেঘ। ঘুরলে আবার মোনা ঠাকুরের মন্দির। বাঁশবন আর আমবাগানের মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। মোনা ঠাকুর নিজেও ওরকমই ওঁচানো। সবার ওপর মাথা তুলতে চায়।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে মাটির গভীর খালগুলো দেখে জগদীশ। বিড় বিড় করে কথা বলে—সুকুল আমার ছেলে নয়, সে কি আমি জানি না? হায় গো, এসব তো বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে। বৌটার ওপর রাগ করতাম। সে পা চেপে ধরত। সুকুলের বাপের নাম সে কখনও বলে নি। কী করব। পেলে তার বুকে এমনি লাঙল চেপে দু ভাগ করে দিতাম না!

গভীর গভীরতর ডুবে যেতে থাকে লাঙল। অবিশ্বাস্য চাষ দেখে আধবুড়ো চাষী চেঁচিয়ে বলে—মাটিকে যে জল করে ফেলা হল! আরে বাঃ! বসুন্ধরা গলে যায় যে! বাঃ বাঃ!

চাষের বাহার সে বোঝে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

মাটির গভীর খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। জগদীশ চেয়ে থাকে। নোনা ঘাম নেমে আসে ভ্রূ বেয়ে, চোখের কোণ বেয়ে। থুতনী বেয়ে। বিড় বিড় করে বলে সে—বাপ কে? অ্যাঁ! কে বাপ তবে আমার সুকুলের? এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুল আমার, বাপ ভিন্ন! অ্যাঁ! আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুলের জাত কী বল তো ঠাকুর! পারবে না। কে জানে! কত খুঁজেছি আড়ালে-আবডালে! যে-ই হোক। ছেলে আমার। খবর্দার কোন শালা যদি ফের কথা তোলে! সুকুল বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। বড় ভয়। যদি জানতে পারে? কী লজ্জা! খবর্দার তোমরা সব, খবর্দার, কথা ওর কানে তোলে যদি কেউ চোয়াল খসিয়ে দেব, জিভ্ উপড়ে দেব সকলের। সার্কাসে আমি পাঁচ মণ লোহা তুলতাম, মনে থাকে যেন!

*　　　　*　　　　*

লেবুকাঁটা দিয়ে চমৎকার একখানা টিপ পরে তারা। সস্তা কুমকুম বড্ড জেবড়ে যায়। লেবুকাঁটা দিয়ে পরলে বড় টিপটার চারধারে ফুটকিগুলো ভারী বাহার দেয়। ঢাকনা-খোলা আয়নাটা একটু দূরে ধরল তারা। আয়নার

ছায়ায় ঢেউ খেলছে। খেলুক। তবু বোঝা যায়, এ মেয়ের এখন যৌবনকাল। পোকামাকড় ভীড় করবার সময়। মুখ টিপে সে হাসে। পরমুহূর্তেই এক দুঃখ খেলা করে যায় বুকে। পাউডার নেই, ঠোঁটের রঙ না, কিছু না। প্রদীপের শীষে কাজললতা উল্টে কালি ফেলে একটু কাজল চোখে দেওয়া, তাও চুরি করে দিতে হয়। বাবা দেখলে ঠাণ্ডা গলায় বলে—কালি কি সাজ! চোখে লোভ আসে। উত্তেজক।

ঢাকনায় লেখা—সুখে থাক! মরি মরি! কি বা লেখার ছিরি! সুখে থাক বললেই সুখে থাকে লোক? তারার সুখ নেই। রঙীন শাড়ি, ভাল আয়না, সাজগোজ, সিনেমা থিয়েটার, রেডিওর গান, পুরুষ সঙ্গী—কত কী চায় মেয়েরা।

পশ্চিমের জানালায় রোদ সরে এল। নিমগাছের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে মেঝেয়। ঐ ছায়াটা হুশ করে অন্ধকার হয়ে যায়। শীতের বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়।

সুকুলের বাবা আজ চাষে গেছে। এই তার ফেরার সময়। নাবাল মাঠটা দিয়ে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে আসে বিশাল মূর্তি, মাঠের মাঝখানটিতে একবার থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে কালীমায়ের মন্দিরের দিকে একবার হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়। মন্দিরে আসে না। তারার বাবা সুকুলের কোষ্ঠীতে বাপের নামের জায়গাটা খালি রেখেছিল। সেই থেকে রাগ।

কামিনী গাছটার ঝুপসী ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে জগদীশকে প্রায়ই দেখে নেয় তারা। জগদীশ তা জানে। এক-আধদিন দেখাও হয়ে যায় এধারে ওধারে। জগদীশ গা করে না। তারা কি সুন্দর নয়? নাই হল, সুন্দরী ছাড়া কারও দিকে তাকাতে নেই? তারার কিছুই কি দেখার নেই জগদীশের? পাথর! পাথর! ছেলের জন্য এত ভালবাসা কোথা থেকে আসে? ঐ বুকটা থেকেই তো! একই বুক একজনের জন্য গলে ঘী, অন্যজনের বেলায় পাথর! ভারী আশ্চর্য!

শোন সবাই, তারা ঠিক করে রেখেছে একদিন গলায় দড়ি দেবে। সেদিন খুব খাবে তারা। মাছের মুড়ো, পাঁঠার ঠ্যাং, পিঠে পায়েস, চালতার অম্বল। সাজবে খুব। যে বাসন্তী রঙের চকরা বকরা শাড়িটা দিদি লুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেইটে পরবে সেদিন। খোঁপায় ফুল গুঁজবে। চন্দনের ফোঁটা পরবে মুখে। বিয়ের কনেটি সেজে অনেকক্ষণ আয়নায় দেখবে মুখ। সেদিন

খুব জ্যোৎস্না ফুটবে। ঋতুটি হবে বসন্ত। দক্ষিণের পেয়ারা গাছটার ডালে ঝুলন ঝোলাবে সে। একা একা রাধা। কৃষ্ণবিরহিনী। সেদিন বিরহই তার মিতা। মরার সময়ে লোকে চিঠি লিখে রেখে যায়, বলে যায়, সে নিজেই মরছে। তারা লিখবে না কিছু। হঠাৎ মরে যাবে। এবার তোমরা খুঁজে বের কর—কেন তারা মরেছে! জগদীশ, সুকুলের বাপ কে—এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান! তোমাকে আর একটি হয়রানী দিয়ে যাব জন্মের শোধ! তারা কেন মরল! খুঁজে খুঁজে বের কর সারা জীবন ধরে। বেশ হবে! জন্মের শোধ।

কামানোর পর সাপদুটো ঝিমিয়ে গেছে। কাল ওদের দুটো ব্যাঙ দিয়েছিল জগদীশ। গিলেছে! দুটোরই পেট ফুলে আছে! ঢিপির মত একটা জায়গায়। নিম-খোরাকি! একবার খেলে বহুদিন আর কিছু খায় না। ঝিম মেরে পড়ে থাকে! নয়ন কাচের ভিতর দিয়ে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখে! কিন্তু না, ওদের পরস্পরের শরীরের প্রতি বড় নিস্পৃহতা। এ বড় অদ্ভুত। এরকম একটা বাক্সে নয়ন আর শ্যামা থাকলে?

নয়ন একটু হাসে।

এ জীবনে নয়ন আর কোনদিন ঘুমোবে কি? আশ্চর্য, ঘুমের জন্য তার কোন চিন্তা ছিল না কোনদিন। হঠাৎ আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা তার মনে হয় কেন? এক দেড় প্যাকেট সিগারেট, দু এক ঢোক বাংলা, আর চিন্তা—এই নিয়েই তো দিব্যি রাত কেটে যেত! আজ কেন ঘুমের চিন্তা? কে তাকে ঘুম পাড়াবে? শ্যামা? শ্যামা! চোখ জ্বলে যায় তার।

দুটো ঝাঁপি দড়িতে ঝোলানো। ওপরেরটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে নয়ন। ভিতর থেকে একটা শ্বাসের শব্দ আসে। এই ঝাঁপি দুটোয় দুজন গোখরো আছেন। ঠাণ্ডা মেজাজ। চট করে কামড়ান না। কামানো, নিরাপদ। ঢাকনা খুললে যখন তারা মাথা তুলবে তখন পারবে কি নয়ন সাহস রাখতে? তেমন শক্ত নয়। জগদীশকে দেখেছে মুখের সামনে হাত নেড়ে সরিয়ে নেয়। মাথাটা তখন একটু নীচে ঝুঁকে পড়ে। জগদীশের বাঁ হাত তখন টপ্ করে পিছন দিক থেকে ধরে মাথাটা। অনেক সময়ে লেজ ধরে

ঝাঁকুনী দিয়ে তুলে ফেলে। নীচু মাথা আর তুলতে পারে না। শক্ত নয়। পারবে নয়ন।

ভেবে দেখলে শ্যামাকে তার কিছুই দেখানোর নেই। কত কিছু দেখাতে সাধ যায়! কি ভালবাস শ্যামা? মানুষ খুন? সুন্দর পোশাক? বিনীত ব্যবহার? নাকি গান শুনতে চাও? উপহার ভালবাস? অপহৃত হতে চাও? কি শ্যামা? তোমার জন্য আমি ফুটবল খেলোয়াড়ও হতে পারি। কিংবা গায়ক। অভিনেতা। যা চাও তাই হব।

ঝাঁপিটার গায়ে আর একবার আল্‌তো হাতে চাপড় দেয় সে। ভিতরে এবার দুটো দ্রুত তীক্ষ্ণ শ্বাসের শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোন শ্যামা, কিরকম শব্দ! ঝাঁপি খুললেই কপিশ বিদ্যুৎ চমকে উঠে দাঁড়াবে। বিদ্রোহী। মুক্তিকামী। কী ভয়ঙ্কর! সম্মোহনের হাত বাড়িয়ে আমি ধরে নেব তাকে। কত খেলা দেখাব। দেখ।

সুকুল জামতলায় খেলছে। অনেক সঙ্গী জুটেছে তার। জগদীশ একঘরে, কিন্তু সুকুল নয়। গাদীর কোট পড়েছে মাঠে। সুকুল পাকা ঘুঁটি। চেঁচিয়ে বলছে—আমার কোটে আসিস না, আমি পাকা। দান কেটে যাবে।

খেলা খুব জমে গেছে। সুকুল এখন আসবে না!

ওপরের ঝাঁপিটা সাবধানে দড়ির দোলনা থেকে তুলে আনে নয়ন! বেশ ভারী। সাপ যে এত ভারী হয় তা জানত না। বয়ে নিতে কষ্ট হবে। হোক!

বিছানার পাতলা চাদরটা দিয়ে ঝাঁপিটাকে বাঁধে সে। একটা ঝোলার মত করে নেয়। ঝাঁপির ভিতর অবিরাম পাক খোলা আর শ্বাসের শব্দ হয়। নয়ন দাঁত টিপে হাসে। না সাপ, না শ্যামা, কাউকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কী করে তাদের ধরতে হয় তা শিখে যাবে নয়ন।

ঝোলা হাতে নয়ন নিঃসাড়ে মেহেদীর বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গুলে জায়গায় ঢুকে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাবে না। গাছের আড়ালে-আবডালে গেলেও সে ঠিকই পৌঁছবে। জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ শরীর আছড়ে সাপটা এখন নিশ্চুপ। বোঝাটা হাত বদল করে নয়ন বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুকসমান কসাড় জঙ্গল ভেদ করে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের পিছনটায় উঠে আসে। মোনা ঠাকুরের বাগান। এটা ঘুরে সে আমবাগানে গিয়ে পড়বে। বাগানের বেড়া ঘেঁষে সে হাঁটে।

মন্দিরটার ডগায় অশ্বত্থচারাটি চোখ তুলে দেখে নয়ন! একটু হোঁচট

খায়! গরুর দড়ি বাঁধার খুঁটি কে যেন উপড়ে নেয়নি! বোঝাটা আবার হাতবদল করে নেয় সে!

নাবাল মাঠটায় আলো ফিকে। পশ্চিমে একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সূর্যটা ঘোলাটে। জগদীশ এখুনি ফিরবে। সে ফিরবে মাঠ দিয়ে, ততক্ষণে আমবাগানে ঢুকে যাবে নয়ন। দেখা হবে না। নয়ন একটা শিস্ দিল। অবিকল দোয়েলের মত। বড় মিষ্টি ডাক পাখিটার। পরমুহূর্তে শ্বাস আটকে আটকে, পেটে খাঁজ ফেলে, কুঁজো হয়ে সে একবার দু'বার কোকিল ডাকল। তার বড় প্রিয় ডাক।

মোনা ঠাকুরের বাগানের শেষে একটা ঝুপসী কামিনী গাছ ঝুঁকে তার ছায়া ফেলেছে নীচের নাবাল মাঠটিতে। ছায়াটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

ঐ মাঠ পেরিয়ে সেই আশ্চর্য চাষাটি আসবে। কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে রোজই তাকে দেখে তারা। তারা যে দেখে তা কি ও জানে না? জানে। জেনেও পাথর। পুরুষ নও নাকি? শরীরে তো মাংসের বাহার, মন কোথা? বাসনা কোথা? পুরুষ হবে পুরুষের মত, গনগনে আঁচ থাকবে তার, থাকবে কামনা বাসনা। তা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে মুক্তপুরুষ। ছেলে থাকলে আর জমি থাকলেই কি হল? মেয়েমানুষ চাই না? বাপু, তুমি হচ্ছ হিজ্‌ড়ে।

একটু আগেই আজ এসে পড়েছে তারা। বেলা আছে। পশ্চিমে একটু ঘোলাটে ভাব বলে বেলা আন্দাজ পায়নি। কামিনী ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। ডাঁস, মশা আর আলোর পোকা উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে পিন্ পিন্ করে মশা মাথার ওপরে। কুয়ো থেকে কে জল তুলছে। ভরা বালতি থেকে ছলাৎ করে জল উপচে জলে পড়ল। পিছনে গাছের আড়াল আছে। তবু একটু সেঁটে দাঁড়ায় সে। বুকটা একটু কাঁপে। কিশোরীর হৃদয় কাঁপবেই। মুখে একটু শোমভাব। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে। এই উত্তেজনাটুকু তার ভালই লাগে। নাবালের মাঠ দিয়ে মাটিমাখা প্রকাণ্ড মানুষটা রোজ যায়। হাত দশেক তফাত থাকে তারার শরীর থেকে। সেই দশহাত শূন্যতা জুড়ে কত ইচ্ছার ঢেউ তারা বইয়ে দেয় রোজ। সে কখনও ফিরেও দেখে না।

দোয়েলের একটা শিস্। তারা চমকায়! এত জোর ডাকল, কাছেই!

পরমুহূর্তে তার কানের পর্দা ফাটিয়ে একটা কোকিল কাঁদে। ডাক নয়, যেন কান্না। বড্ড বুকভাঙা ডাক। মিতা বুঝি উড়ে গেছে কোথা!

ঝোপের ভিতর থেকে আস্তে মুখ বাড়ায় তারা।

লাফ দিয়ে একটা খন্দ পেরিয়ে হলুদ জামা পরা ছোকরাটা সামনে এল! লুকোবার সময় পেল না তারা! মুখটা টেনে নিল আড়ালে, কিন্তু ও দেখছে ঠিক। দাঁড়িয়ে গেল!

বোঝাটা হাতবদল করে ঝোপের ওপাশে একটু দাঁড়াল! তারার বুক টিপ টিপ করে!

একটা শ্বাস ফেলল ছেলেটা। তারপর চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল! বলল—দেখে ফেলেছি!

তারা চুপ!

—কী হচ্ছে এখানে?

—কিছু না! বাগানে দাঁড়িয়ে আছি! তারা অস্ফুট স্বরে বলে?

ছোকরাটা হাসে! বিচ্ছিরি হাসি ওর! বোঝাটা মাটিতে রেখে হাল্কা পায়ে বেড়ার কাছে আসে! তারা শ্বাস বন্ধ করে থাকে!

—বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা, না আর কিছু?

—আর কী!

আচমকা ছেলেটা লাফ দিয়ে বেড়াটা পার হয়ে আসে! চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাল না তারা। কী সাহস ওর।

ছেলেটার পায়ের শব্দ হয় না! বাতাসের ওপর চলে-ফেরে যেন! ঝোপটা ঘুরে মুখোমুখি চলে এল! মুখখানা দেখে আপনা থেকেই একটা ভয়ের চীৎকার গলায় উঠে আসছিল! সেটা সামলাল তারা! পেটের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল।

ছোকরাটার পিঙলে চুল বাতাসে উড়ো-খুড়ো হয়ে আছে। চোখের নীচে বসা কালি, কাটা ফাটা ঠোঁট, ভাঙা চোয়ালে রগ ফুটে আছে। চোখ দুটো লালচে, জ্বলজ্বলে। ওপরের পাতাটা আধবোজা! হঠাৎ বুক চমকে ওঠে দেখলে।

তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—কী চান আপনি?

—সুকুল তোমাকে মা ডাকে কেন?

তারা ঢোঁক গিলল। কারও জানার কথা নয়। কেবল সুকুল জানে আর সে নিজে। আড়ালে সুকুলকে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে সে।

বোকা ছেলেটা, পেটে কথা রাখতে পারে নি।

তারা বলল—কৈ না তো!

ছোকরাটা ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলে—তোমরা মেয়েরা মিথ্যেবাদী। তুমি সুকুলকে মা ডাকতে শিখিয়েছ কেন?

—শেখাই নি, ও নিজেই ডাকে। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে।

—মিথ্যেবাদী। চাপা স্বরে বলে ছোকরাটা।

—না।

বাবা শুনলে হেঁটোকাঁটা ওপরকাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবে। তারা তাই কেবল বাতাস গিলল। ছেলেটার পিঙলে চুল ফণা ধরে আছে। মুখে না খেতে পাওয়া ভাব। শরীরটার তামাটে রঙ থেকে রাগের তাপ আসছে।

—সেজে-গুজে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছে? জগদীশ?

তারা মাথা নাড়ে। কানের পুঁতির ঝুমকো দুটো গালে এসে ঝাপটা মারে। সে মাথা নেড়ে জানায়—না।

ছোকরাটা একটু হাসে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে—আমি জানি।

—কী জানেন?

—সব। যদি মোনা ঠাকুরকে বলে দিই তবে জগদীশ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

—যা জানেন তা ঠিক নয়।

—তোমরা মিথ্যেবাদী। মোনা ঠাকুর যখন বাণ মারে তখন কী হয় জান তো? মুখে রক্ত তুলে, দাপিয়ে মরে যায় তরতাজা মানুষ। জান?

তারা মুন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে।

—জগদীশেরও তাই হবে। ছোকরাটা হাল্কা স্বরে বলে।

—না।

—কী না? বলে এগিয়ে আসে ছোকরাটা।

বড়দি পালিয়ে গিয়েছিল একটা চামচিকের সঙ্গে। মোনা ঠাকুর হৈ-চৈ করে নি, পুলিশে খবর দেয় নি, খোঁজে নি। বিয়ের দু মাসের মাথায় মুখে রক্ত উঠে সেই চামচিকেটা মরেছিল। সবাই বলে, মোনা ঠাকুর বাণ মেরেছে। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা ঠিক বাবা নয় তারার কাছে। অন্য সকলের কাছে যেমন ‘মোনা ঠাকুর’ তার কাছেও তেমনি। রহস্যময় এক শক্তির অধিকারী ভয়ঙ্কর পুরোহিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত তার সম্মোহন আকাশে বাতাসে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অদৃশ্য চক্ষু লক্ষ্য রাখছে সব দিকে। তারা

নিথর হয়ে চেয়ে থাকে। বুকটা জ্বলে যায়। কোনদিকে পথ খোলা নেই।

ছোকরাটার শ্বাস মুখে পড়তেই চকিতে চট্‌কা ভেঙে মুখ তোলে তারা। কত কাছে এসে গেছে দেখ! মাগো! তারা পিছোতে যাবে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল।

—পালাচ্ছ?

—এটা কী? ছাড়ুন। তারা ছটপট করে।

—আমি মোনা ঠাকুরকে বলে দেব।

—না।

ছোকরাটা হাসে। তারার হাতখানা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকে বলে—তোমার গা পরিষ্কার, কোন গোটা নেই, মোলায়েম!

ঝট্‌কা দেয় তারা। কিন্তু হাত খসে না। সাঁড়াশীর মত ধরে রেখেছে।

ছোকরাটা আপন মনে বলে—প্রচুর ক্লোরোফিল তোমার শরীরে। তাজা ভিটামিন, আর ক্যালসিয়াম। দুরন্ত লিভার, আর হার্ট। তোমার কোন অসুখ নেই।

—ছাড়ুন। আমি চেঁচাব।

—না, চেঁচাবে না। খুন করে ফেলব। বলতেই তার চোখ ঝলসে ওঠে। স্তিমিত গলায় আবার বলে—তোমাকেও। জগদীশকেও! মোনা ঠাকুরের বাণে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু আমার বাণে হয়। আমি মানুষ মেরেছি তারা।

তারার চোখে পলক পড়ে না। দুরন্ত মুহূর্তগুলি কেটে যাচ্ছে। শরীরে একটা রক্তের হল্‌কা বয়ে যাচ্ছে।

ছোকরাটা হাতখানার গন্ধ আর একবার শুঁকল। তারপর বলল—তোমাকে আজ আমার একটা গোপন কথা বলে দিলাম। মানুষ মারার কথা। আজ অবধি আর কাউকে বলি নি।

পশ্চিম দিগন্তে একটা মলিন সূর্য ঝুলে আছে। ডুবে যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। পৃথিবীতে সময় থেমে গেছে হঠাৎ। ছোকরাটা মুখ নামিয়ে আনে কাছে, চাপা গলায় বলে—যাকে একবার গোপন কথা বলে দেওয়া যায় তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে বিশ্বাস করি না আর। বুঝেছ?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোকরাটা। কাঁধে ঝাঁকি দেয়। কাঁপনটা নিজের শরীরেও টের পেল তারা।

—আমি আবার আসব। হঠাৎ আসব। তোমাকে পাহারা দিতে।

আমার গোপন কথাটা কাউকে বলছ কিনা দেখতে আসব। বার বার। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি একবার যার পিছু নিই তার শান্তি থাকে না। বলে সে হাসে।

তারা অনেক কষ্টে অস্ফুট গলায় বলে—কী সব বলছেন!

সে কথায় কান না দিয়ে ছেলেটা পৃথিবীর রাজার মত গলায় বলে—আবার যখন আসব তখন তোমার কাছে একটা জিনিস চাই।

—কী? ভয়ার্ত তারা জিজ্ঞেস করে।

—ক্লোরোফিল, কিংবা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন কিছু একটা। ঠিক জানি না। অনেকদিন আগে আমি ডাক্তারী পড়তাম, সেকেণ্ড ইয়ারে ছেড়ে দিই। সব ভুলে গেছি। কিছু একটা চাই যা আমাকে ঘুম পাড়াবে। বুঝেছ?

তারা কিছু বোঝে নি। তবু ছাড়া পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল।

—আজ আর সময় নেই। বলে হঠাৎ নিস্পৃহ ভাবে তারার হাতটা ছেড়ে দিল নয়ন। বলল—জগদীশ আমাকে চড় মেরেছিল একদিন, বুঝলে। আমাকে চড় মেরেছিল। যে আমাকে মারে তার ছাড় নেই! আমি ফিরব! বুঝলে! ফিরব।

ছোকরাটা ঘুরে চটপটে পায়ে আবার বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। ঝোলাটা তুলে নিল হাতে। একবারও ফিরে না তাকিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিলিয়ে গেল।

তারা নিঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার নরম হাতখানায় পাঁচ আঙুল বসে যাওয়ার দাগ। ব্যথা করছে। চোখ ভরে টলটলে জল এল তার। তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দরগার পিছনের ঢিবিটা পেরোলে একটা বাঁশঝাড়। সেটা ডাইনে রেখে দু-কদম হাঁটলেই নাবাল মাঠটা দেখা যায়। বাঁয় উঁচুতে মোনা ঠাকুরের মন্দির। মাঠের শেষে রাস্তাটা ঘুরে গেছে।

দূর থেকেই দেখা যায়, রাস্তার বাঁকটাতে সুকুল দাঁড়িয়ে। এত বড় মাঠটা সামনে বলে সুকুলটাকে যে কী ছোট্ট আর একা দেখায়। শেষবেলার আলোয় এখন কুয়াশার ভাব। মাটি থেকে ধুলোটে অস্বচ্ছতা উঠে আসে। বড় আবছা চারদিক। বড় মায়াময়। এ সময়টায় আলো ক্ষয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর একটা স্বপ্নের সর পড়ে। সত্যি নয় কিছু। আলো ক্ষয় হয় এ সময়ে।

দূর থেকে সুকুলকে মনে হয় মাঠের ওপর একটা দাগ মাত্র। বুকটা ফাঁকা লাগে জগদীশের।

মাঠের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জগদীশ মন্দিরের দিকে হাত-জোড় করে একটা প্রণাম ছুঁড়ে দিয়ে যায়। আজ দূর থেকে সুকুলকে দেখে বুকটা কেমন করল। মাঠখানা বুকে নিয়ে ছোট্ট সুকুল দাঁড়িয়ে। একা। বাবার জন্য চেয়ে আছে। মিথ্যে। বাবা কোথায় সুকুলের? তবে কি সবই এরকম? সাঁঝবেলায় সন্ধ্যের ঝুঁঝকো আঁধার যেমন স্বপ্নের সর তেমনি? বুকটা কেমন করল। জগদীশ আজ মাঠের মাঝখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল—কাছে যাই না মা, দোষ নিও না। তোমার মন্দিরের চারধারে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া। আমার যা হোক তা হোক, সুকুলকে দেখো। দেখ না, অভাগা ছেলেটা পৃথিবীতে কী রকম একা। মাঠ বুকে করে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ওর কেউ না। জানে না তাই। এই মোহ চিরকাল রেখ মা। জগৎসংসারে মোহ ছাড়া মোয়া বাঁধে না।

কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে সাজপরা একখানা মুখ রোজই চেয়ে থাকে। লক্ষ্য করেছে জগদীশ। আজও করল। দেখি না দেখি না করে রোজ পেরিয়ে যায় জায়গাটা যেমন পোড়ো জায়গা রামনাম করতে করতে পেরোয় ভীতু মানুষেরা। জগদীশও পেরোয়। বন্ধনকে তার বড় ভয়। বাঁধা বাউণ্ডুলে ছিল সে। গাউস সাহেবের দলের সঙ্গে উজেন ভাঁটেন বয়ে যেত দেশ-দেশান্তরে। সেই জগদীশ এখন শিকড় ছেড়েছে মাটিতে। ভুঁই, ঘর, ছেলে। তবু কিছুই তার নয়, সে জানে। সুকুল একটু বড় হোক, হাত-পা ঝেড়ে আবার সে বেরিয়ে পড়বে। সংসারে তার এই স্থিতি বড় অদ্ভুত। ভাবলে রাতের ঘুম চটে যায়। চোখে জল আসে। জগদীশ এই স্থিতি চায় না। সংসারে থিতোবার লোক আছে, সে সেই লোক নয়।

পেরিয়েই যেত জগদীশ। কিন্তু বাগড়া দিল কান্নার শব্দটা। তারা কাঁদছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে। সুকুলকে গোপনে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে মেয়েটা। বোঝে জগদীশ সবই।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল জগদীশ। কান্না ব্যাপারটা ভাল না। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

ঝোপের পাশে অবিরল ফোঁপানি। হেঁচকীর মত শব্দ হচ্ছে।

জগদীশ আস্তে করে বলল, ঠাকুর এসব দেখলে বড় রাগ করে। এ ভাল নয়।

ওপাশটা চুপ। ভীতু খসখসে একটা শব্দ হয়। শ্বাস চাপবার চেষ্টা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রশ্ন উড়ে আসে—কেন?

জগদীশ বলে—মন চাইলেই কি সব হয়?

—কেন হয় না? আবার প্রশ্ন উড়ে আসে।

জগদীশ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বলে—হয় না। মোনা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর, তিনিই বলবেন—হয় না।

ওপাশটা একটু চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে—আপনি ব্রাহ্মণ না?

জগদীশ হাসে—বামুন ঠিকই। হালদার বংশ। উপনয়নও হয়েছিল। শরীর খেলাতে গিয়ে সেই যে পৈতে ছেড়েছি, আর নেওয়া হয় নি।

—তবে বাধা কী?

জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বাধা অনেক। নীচু জাতে বিয়ে করেছিলাম বলে ব্রাত্যদোষ। তাছাড়া......

—তাছাড়া কী?

—সুকুলের বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। সতর্ক এবং বেদনার গলায় বলে জগদীশ। স্বরটা খুব নীচে নেমে আসে। তারপর মুখ তুলে বলে—ঐ সন্দেহ নিয়ে যে-ই আমার ঘর করতে আসুক, আমি তাকে সইতে পারব না।

—আমি কিছু ভাবি না।

জগদীশ তবু মাথা নাড়ে—গাঁয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। লোকে ঘোঁট পাকাবে। গোলমাল হবে। মোনা ঠাকুর খুশী হবে না.....

—আপনি বাবাকে ভয় পান?

জগদীশ শ্বাস ছাড়ে, বলে—কে না পায়?

—তবে কী উপায় হবে?

—উপায় দেখছি না। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু ছেড়ে কেটেই থাকতে হয়। অবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভাল।

—যদি কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া যায়?

—উরেব্বাস!

—কেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে নাকি?

—হবে। মাটির গন্ধ না পেলে আমি থাকতে পারব না। মাটির বড় মায়া।

—আপনার আবার মায়া-দয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে আসে।

সুকুল এতক্ষণে বাপকে নিরিখ করেছে। কোণাকুণি ছুটে আসছে এঞ্জিনের মত। জগদীশ বলল—যাই।

—আচ্ছা।

—এ রকম ভাবে থেক না। লোকে দেখলে কী বলবে?

—আমি থাকব। রোজ। আমার ইচ্ছে।

জগদীশ মাঠের শূন্যতায় এগিয়ে গেল। দু-হাত বাড়ানো। শূন্যতাকে ভরে দিয়ে সুকুল আসছে। আসছে।

ভারী সাপটাকে বয়ে আনতে কষ্ট গেছে খুব। পাকা সাপ, থলথলে চর্বি বোধ হয় গায়ে। নয়ন ঝাঁপি খুলে দেখে নি। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়েছে। অমনি ভিতর থেকে প্রবল শ্বাসের শব্দ পেয়েছে। দাঁতে দাঁত টিপে এক ধরনের হাসি হেসেছে সে। ভীতু একটা জ্বালাময় আনন্দ।

সন্ধ্যের বাসটা পেল নয়ন। পায়ের কাছে সারাক্ষণ ঝাঁপিটা সতর্ক পাহারা দিল, যেন পাহারা না দিলে মূল্যবান ঝাঁপিটা কেউ চুরি করে নেবে। মাঝে মাঝে ঝুড়িটায় লাথি মারল। শ্বাসের শব্দ পেল। পাশে বসা একটা মানুষ একবার জিজ্ঞেস করল—কী আছে ওটাতে?

নির্বিকার গলায় নয়ন জবাব দিল—একটা গোখরো সাপ।

—সাপ! লোকটা চমকে উঠে পড়ে, বলে—কী সাংঘাতিক!

মানুষজন তার দিকে কৌতূহলে তাকায়। ঝুড়িটা অনেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

দূর-পাল্লার বাস বলে সিগারেট ধরালে কেউ কিছু বলে না। নয়ন কাউকে গ্রাহ্য না করে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর একমনে সিগারেট টেনে যায়। বাইরে ভিতরে একটা তীব্র ছটফটানি তার। হাত-পা এক ভাবে রাখতে পারে না। এ পাশ ও পাশ হয়। বিড় বিড় করে নিজেকে বলে—সব প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ঘুম আসবে। ঠিক ঘুম আসবে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সদর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোন বাধা নয়। সদর দিয়ে সে কদাচিৎ বাড়িতে ঢোকে। আজও ঢুকলো

না। গলির দরজা টপকে ঢুকল। ঝাঁপিটার জন্য কষ্ট হল খুব। ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যাটা ভিতরে গজরাচ্ছে। কর্কশ দেয়ালের ঘষাটায় কনুইটা ছড়ে গেল অনেকটা। কিছুই গ্রাহ্য করল না সে। ভিতরের দরজা খুলে দিল রাঁধুনী লোকটা। দরজা খুলে তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত ভাবে সরে গেল। গলাখাঁকারী দিয়ে বলল—বাবুর বড় অসুখ।

—কার?

—বড়বাবুর।

—ও। বলে নির্বিকার ভাবে নিজের ঘরে গেল সে। সে থাক বা না-থাক তার বিছানা পরিপাটি পাতা থাকে রোজ। খাওয়ার ঘরে খাবার ঢাকা থাকে। এই নিয়ম করে রেখেছে মা। বেশী রাতে ফিরলেও কোন অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপিটা যত্নে খাটের তলায় রেখে জামাটা খুলে শুয়ে সে সিগারেট ধরাল। কার অসুখ যেন বলছিল লোকটা!

উঠে আবার খাওয়ার ঘরে এল। বারান্দায় জল আর ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে।

—কার অসুখ বললে?

—বড়বাবুর।

—কী হয়েছে?

—কী জানি! অজ্ঞান মত হয়ে আছেন কাল থেকে। মা বলেছে আপনি এলেই খবর দিতে।

দোতলায় সিঁড়ির তলায় একবার দাঁড়াল নয়ন। সিঁড়ির বাতি নেভানো। ওপরটা নিস্তব্ধ। সিঁড়ি ভাঙতে তার ইচ্ছে করছিল না। বাবার জন্য তেমন কিছু উদ্বেগও বোধ করল না সে। কোন দিনই করে না।

সিঁড়িতে গোটা দুই বেড়াল শুয়ে। একটুক্ষণ বেড়ালের ঘুম দেখল সে। বাবা এই রাতে মারা গেলে শ্মশান-ফশানে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। ভেবে সে একটু বিরক্ত হল। মরেফরে যাওয়াটা যে সংসারে কেন আছে! এগুলো উঠে গেলেই ভাল।

আবার ঘরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে জেগে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে বাতিটা জ্বেলে ঝাঁপিটা বের করে।

একটা কপিশ শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। দেখলে গা শির শির করে। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে সাপটা। হাতটা একবার বাড়াল নয়ন,

তার হাতের ছায়া পড়ল সাপটার মুখে। সাহস পেল না সে, হাতটা আবার সরিয়ে আনল।

একটা স্কুটার ছিল নয়নের। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল বলে বাবা কিনে দিয়েছিল। সেই স্কুটারটা নয়ন চালাত ঝড়ের মত। হাল্কা জিনিস, চীৎপুরে একবার রাস্তার গর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ে ওল্টায়। দ্বিতীয়বার একটা ট্রামকে টপকে যেতে গিয়ে ভবানীপুরে একটা স্টেটবাসের পিছনে ভিড়িয়ে দেয় নয়ন। তিনবারের বার বর্ষাকালের জলে-ডোবা লাইব্রেরী রোড়ে সেটা পড়ে যায় আধখোলা ম্যানহোলের ভিতরে। জখমটা গুরুতর হয়েছিল। কালীঘাটের একটা গ্যারেজে দিয়েছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে। আনা হয় নি। স্কুটার আর ভাল লাগে না নয়নের। যদি কখনও কেনে একটা স্পোর্টস্ কারই কিনবে নয়ন। বাবা মরে গেলে কিনতে কোন ঝামেলা হবে না। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এম-জি স্পোর্টস্ কার দেখেও রেখেছে নয়ন।

স্কুটার যখন চালাত তখনকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা আর গগল্স্ আলমারিতে পড়ে আছে। নয়ন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দস্তানা জোড়া বের করে আনল। দস্তানাটা পুরু, দু পাল্লা চামড়ার মাঝখানে তুলোর গজ ভরা। সে দুটো হাতে পরে নিল সে। তারপর সাপের ঝুড়িটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তেমনি নিঝুম পড়ে আছে সাপটা। মাথাটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। কী করে ফণাটা মুহূর্তের মধ্যে অতটা চওড়া করে ফেলে!

নয়ন হাতটা বাড়াল। মাথাটার এক বিঘৎ দূরে হাতটা নিয়ে গেল সে। হাতের ছায়াটা নাড়তে লাগল সাপের মুখের ওপর। তারপর চকিতে আঙ্গুল বাড়িয়ে একটা খোঁচা দিল সে। সাপটা নড়ল না। নড়লে কী হবে তা নয়ন ভাবে না। কাছাকাছি জগদীশ নেই, সে একা। তবু নয়ন আবার আঙ্গুলের খোঁচা দিল। আবার।

চমকে মুখ তোলে সাপ। ছোট্ট মাথাটার দু'পাশে ছড়িয়ে যায় হাতের পাতার মত ফণা। শেকড়ের মত ছোট্ট জিবটা বেরিয়ে আসে। বার বার। ঘন শ্বাসের শব্দ। একটু দোলে। ছোবল দেবে নাকি?

সাপটার উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটা দেখে নয়ন। চোখ ভরে দেখে। যা কিছুটা ভয়ঙ্কর তা-ই তার প্রিয়। দস্তানা পরা হাতটা সন্তর্পণে বাড়ায় সে। কিছু বুঝবার আগেই সাপটা চাবুকের মত মুখটা আছড়ে ফেলে

নয়নের হাতের ওপর। দস্তানা পরা হাত, তাই কিছুই টের পেল না নয়ন। কিন্তু খুব চমকে গেল। সাপ যে কতটা গতিময়, কী মারাত্মক তার চকিত আক্রমণ তা টের পায়, এই গতিটাই নয়নকে ভারী অবাক করে। জগদীশ এর চেয়েও দ্রুতবেগে হাত বাড়ায় এবং হাত সরিয়ে নেয়। নয়নকে শিখতেই হবে।

কিন্তু সাপটা আর ছোবল দেয় না। সে হয়তো নিজের বিষদাঁতহীন অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই মাথাটা নামিয়ে শরীরটাকে জলধারার মত স্বচ্ছন্দে ঝুড়ির কাণার উপর দিয়ে টেনে মেঝের ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলতে থাকে। সাপটা যে কত বড় তা এই প্রথম বুঝতে পারে নয়ন, ফলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

সাপটা নয়নের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথমে আলনার তলা. তারপর আবার ঘুরে খাটের নীচের অন্ধকারে যেতে থাকে। নয়ন একটু স্তব্ধ থাকে। তারপরই দাঁতে দাঁত টিপে নিজের কাঁপা শরীরকে সামলে হাত বাড়িয়ে খাটের তলার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। সাপটা আবার পাকে পাকে শরীর জড়াচ্ছে। সন্তর্পণে নয়ন হাত বাড়ায়। সাপটা মুখ তোলে, শ্বাস ফেলার মত শব্দ করে নয়নকে সতর্ক করে দেয়। নয়ন থেমে যায়। ওর দ্রুতবেগটাকেই নয়নের ভয়।

উদ্যত হাতটা বাড়িয়ে রেখেই নয়ন খর চোখে সাপটাকে দেখে। সাদা বুকটা তুলে, ফণা মেলে সাপটাও দেখে নয়নকে। নয়ন হাসে। তারপর নয়নের হাতটাই সাপটাকে অবিকল সাপের মত ছোবল দেয়। গলার নীচে চেপে ধরে সাপটাকে অবিলম্বে হিঁচড়ে নিয়ে আসে সে। ছট্‌ফট্ করে সাপটা, সমস্ত শরীর আছড়ায়। নয়নের হাতটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ সমস্ত বুক পেট জুড়ে একটা বমির ভাব আসে নয়নের। ঘেন্নায় শরীর রী রী করে। সাপের ঠাণ্ডা শরীরের স্পর্শ তার হাতটাকে হিম করে দেয়। পাগলের মত সে হাত ছুঁড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেয় ওটাকে, তারপর হাঁফাতে থাকে।

সাপটা মেঝেময় ছড়িয়ে কিলবিল করে। তারপর আবার ঝাঁপিটার পাশ দিয়ে খাটের তলায় চলে যেতে থাকে।

নয়ন দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, দস্তানা খুলে গলায় আঙ্গুল দেয়। বেসিনে উপুড় হয়ে হড় হড় করে বমি করে। টক-তেতো স্বাদ, শরীরটা কাঁপতে থাকে।

মুখে চোখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে টের পেল, মাথায় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে তৈরী, এমন হাল্‌কা লাগে।

দেয়াল ধরে ধরে ঘরে এল নয়ন। টেবিল হাতড়ে সোনেরিলের কৌটোটা বের করল। একসঙ্গে তিনটে কি চারটে—না গুণে মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলল। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল।

একটা ঝিমুনির ভাব আসছে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। এক আধবার সাপটার কথা মনে হয় নয়নের। ভাবে উঠে গিয়ে ওটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা উচিত। কিন্তু শ্লেটের ওপর লেখা যেমন মুছে যায় তেমনি নানা হিজিবিজি চিন্তা স্বপ্নের মত চোখের সামনে এসে যায়। সাপটার কথা খেয়াল থাকে না। হাতটা বিছানার বাইরে এলিয়ে পড়ে আছে, দু আঙ্গুলে ধরা সিগারেটটার ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, মাথা ভর্তি স্বপ্ন, চোখ জুড়ে আসছে....

ঘুমিয়েই পড়ত নয়ন। দরজার মৃদু শব্দ শুনে চোখ কষ্টে খোলে সে।

—কে রে?

নতুন চাকরটা ঘরে উঁকি দেয়—দাদাবাবু বড়বাবুর অবস্থা খারাপ। মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

নয়ন প্রথমটায় বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে—কার অবস্থা খারাপ বল্‌ছিস?

—বড়বাবুর, আপনার বাবা মশাইয়ের।

—ও, মাথাটা একটু ঝাঁকায় নয়ন। তারপর উঠে বসে বলে—কী হয়েছে?

—কী জানি, অবস্থা কাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। খুব অসুখ। নয়ন উঠল।

খুবই ক্লান্ত লাগছে তার। সোনেরিল খাওয়ার পর শরীরটা একরকম নেশায় ভরে ওঠে। নড়া চড়া ভাল লাগে না। তবু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বাবার ঘরে এল সে।

খুব মৃদু নীল ঘুম-আলো জ্বলছে ঘরে। প্রকাণ্ড মেহগিনির পালঙ্কের ধারে টেবিল, তাতে ওষুধপত্র রাখা! পালঙ্কের নীচে সাদা বেডপ্যান, জলের বালতি। ঘরে ওষুধের গন্ধ। উঁচু বালিশে মাথা রেখে নয়নের বাবা শুয়ে।

শরীরটা স্থির নয়। ডান পাটা ক্রমাগত নড়ছে, ডান হাতটা কপালের কাছে উঠে যাচ্ছে বার বার।

নয়ন দরজা থেকে তিন-চার পা হেঁটে বাবার বিছানার কাছে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে মা বসে আছে। মা জিজ্ঞেস করল—খেয়েছিল?

গলাটা ভাঙা। বোধ হয় খুব কেঁদেছে মা, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিয়েছে, মার কথার জবাব না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে?

—কী জানি, পরশু রাতে খাওয়ার আগে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এল, কী যেন সব আবোল তাবোল বলল, শুয়ে পড়ল হঠাৎ। ডাক্তাররা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে শিরা থেকে রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে।

নয়ন বলল—জ্ঞান নেই?

—না তো। কোন সাড়া দিচ্ছে না।

নয়ন ভীত চোখে চেয়ে বলে—তবে ডান পাটা নড়ছে কেন?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কে জানে! ক্রমাগত নড়ছে। দিনরাত কামাই নেই। কী যে হবে। তুই খাস নি?

—না।

—খেয়ে নে।

—নিচ্ছি, রাতে তুমি জাগবে নাকি!

—না, নার্স রাখা হয়েছে। এক্ষুণি এসে পড়বে। তুই খেয়ে নে যা। ঘুম থেকে উঠে কোথাও যাস না সকালে, কখন কী হয়।

নয়ন বাবার দিকে একটু চেয়ে রইল। জ্ঞান নেই, সাড়া নেই, তবু দুটো অঙ্গ নড়ছে। ডান পা, ডান হাত, লক্ষণটা একটু চেনে নয়ন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—পিত্তের বমি হয়েছিল?

মা একটু থমকে গিয়ে বলে—হয়েছিল।

—কখন?

—একটু আগে। কেন?

নয়ন মার দিকে একটু চেয়ে রইল। আবছা আলোয় ভাল দেখা যায় না। শিয়রের কাছে খাটের বাজুতে পিছনে হেলে বসে আছে মা। শরীরটা মোটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার ওপর মোটা, ভারী সব গয়না, আঁচলে আধকেজি ওজনের এক থোলো চাবি। এসব নিয়েই একটু পরে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে হবে। পরনে চওড়া পাড়ের শাড়ি, সিঁথের সিঁদুরের

দাগে ঘা.....নয়ন বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে—গুডবাই স্যার, আর দেখা হচ্ছে না স্যার, আর দেখা হচ্ছে না তাহলে!

—যাচ্ছি।

মা জিজ্ঞেস করে—ঐ বমি হলে কী হয়?

—কী আবার হবে?

—তবে জিজ্ঞেস করলি কেন?

—এমনিই।

—তুই তো ডাক্তারী একটু শিখেছিলি, বুঝছিস না অবস্থাটা?

—আমার বোঝাবুঝি দিয়ে কী হবে, বড় ডাক্তার দেখছে যখন!

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে—যা খেয়ে নে।

নয়ন নেমে আসে। রাঁধুনী খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। খাওয়ার টেবিলে আরো একজন বসে খাচ্ছে। কালোমত একটি মেয়ে। খুব সাধারণ চেহারা, রোগা, না তাকালে কিছু এসে যায় না। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে শেষ কয়েকটি গ্রাস খাচ্ছিল।

নয়ন মুখোমুখী বসল। বলল—ব্যস্ত হবেন না, আস্তে খান

মেয়েটা মুখ তুলে অপ্রতিভ গলায় বলে—আমি গেলে আপনার মা শুতে যাবেন। ওঁরও শরীরটা.......

নয়ন একটু হাসে—শুয়ে আর কী হবে? রাত পোয়াবে না। নার্স মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—খান।

মেয়েটা খায়।

রাঁধুনী প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনে নয়নের জন্য। নয়ন একটু নাড়াচাড়া করে। দু'একগ্রাস খায়, মেয়েটা উঠে যাওয়ার আগে একবার সন্তর্পণে নয়নের দিকে তাকাল। নয়ন একটু হাসল। বন্ধুত্বের হাসি।

আঁচিয়ে ঘরে এসে আরো দুটো সোনেরিল গেলে নয়ন। সিগারেট ধরায়। বিছানার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার সাপটার কথা মনে পড়ে। নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখে সে। নিঝুম হয়ে খাটের নীচের আবছায়ায় পড়ে আছে লক্ষ্মীছেলের মত। নড়ে নি।

নয়ন একটা হাই সামলায়। দস্তানা জোড়া খুঁজে হাতে পরে নেয়। তারপর খাটের তলায় হাত বাড়ায়।

বিরক্ত হয়ে ছিটকে ওঠে সাপটা। কিন্তু নির্বিষ, অক্ষম তার আক্রোশ।

মুহুর্মুহু কয়েকবার সে নয়নের হাতে মাথা কোটে। চুম্বনের মত তা নয়নের হাত ছুঁয়ে যায়। নয়ন আর ভয় পায় না। দ্বিধা বোধ করে না। হিংস্রতর তার দুটি হাতে সে গলা টিপে সাপটাকে টেনে এনে মেঝেতে ছেড়ে দেয়।

সাপটা তার ফণা তোলে। নয়নের কোমর সমান সমান বা তার চেয়েও উঁচুতে। নয়ন সেই উদ্যত মুখে ঠাস করে একটা চড় মারে। সাপটা ঢলে পড়ে আবার চিতিয়ে ওঠে। আক্রোশে রাগে হিংস্রতায় তাকে পর পর কয়েকটা চড় দেয় নয়ন। বলে—শুয়োরের বাচ্চা, ঢোক্ ঝাঁপিতে, ঢোক্.... তোর বাবা ঢুকবে.....

বলে মাথাটা চেপে ধরে নয়ন মেঝেতে ঠুকে দেয়। লেজ ধরে তুলে· প্রায় আছাড় মারে। কেন যে এই আক্রোশ তা বুঝতে পারে না সে, কিন্তু তীব্র জ্বালাময় আনন্দ বোধ করে। সাপটা কী বোঝে কে জানে! অবশেষে তাকে ঝাঁপিতে পাকিয়ে পাকিয়ে রাখে নয়ন। তার শ্বাস, জিব, চোখ—কোন কিছুতেই গ্রাহ্য করে না।

ঝাঁপিটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর খাটের তলায় সেটা ঠেলে দিয়ে বিছানায় বসে। সিগারেটটা আড় করে খাটের রেলিঙে রেখে দিয়েছিল। সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাঠ ধরে ফেলেছে। রেলিঙের কাঠ জ্বলে গেছে অনেকখানি, ধোঁয়াচ্ছে। সিগারেটটা তুলে নিয়ে খাটের পোড়া জায়গায় একবার আঙুল ঘষল নয়ন। আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমে আসছে অন্ধকারের মত।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নয়নের চোখে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। সে জগদীশকে দেখতে পায়। একটা প্রকাণ্ড বাগানে জগদীশ ফুল তুলছে। বাঁ হাতে একটা সাজি। ফুল তুলে সাজিতে রাখছে জগদীশ। কিন্তু সাজিতে রাখা ফুল হয়ে যাচ্ছে সাপ। সাজি থেকে অজস্র সাপের ফণা উঁচু হয়ে আছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চলে এল। সোনেরিলের ঘুম।

বিকেলে বেরোবার মুখে শ্যামার বাবা ধুতি পাঞ্জাবীর ওপর শালটা ঘাড়ে নিয়ে, হাতে চমৎকার লাঠিগাছটা একবার নামিয়ে বেরোতে যাচ্ছে সেই সময়ে কাণ্ডটা ঘটল।

বাইরের সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র, সেই সময়ে দেখা গেল একটা লোক সিঁড়ির মুখেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাফশার্ট আর পরনে

খাকী প্যান্ট, পায়ে কেড্‌স্। চোখমুখ ফোলা ফোলা, চোখ লাল, মাথাটা জুতোমারা মাথার মত উলোঝুলো, ধুলোটে। চুর-চুর মাতাল লোকটা শ্যামার কাকা তড়িৎ চৌধুরী। বংশের কুলাঙ্গার। পরিবারে এমন কেউ নেই যে তাকে না সমঝে চলে।

শ্যামার বাবা ভূত দেখার মত চমকে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিল। মাতাল অবস্থায় না থাকলে তড়িৎ চৌধুরীকে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু এই অবস্থায় তার ভিতরকার সব জমে থাকা কথা ওগড়ায়। শ্যামার বাবা বুঝল তার ভাই এখন ওগড়াবে। সিঁড়ি থেকে পা তুলে ভিতরে চলে এল, সদরটা বন্ধ করতে করতে টের পেল, তার হাত কাঁপছে, বুকে বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্। দরজা বন্ধ করতে করতেই শুনল মাতাল হারামজাদা চেঁচিয়ে বলছে—ঐ যে শালা সরিৎ চৌধুরী দরজা দিচ্ছে, ঐ যে শালা বেওয়া বিধবার জমি খাস দখল করেছে যে ব্যাটা....

চেঁচামেচিটা শুনতে পেল শ্যামাও। সোয়েটারটার শেষ কয়েকটা কাঁটা বোনা এখন বাকী। দিনরাত কদিন ধরে বুনছে শ্যামা। ফুলহাতা সোয়েটার, উঁচু গলা, তার ওপর প্যাটার্নটাও গোলমেলে—বড্ড পরিশ্রম গেছে। পিঠ টন্‌টন্ করে, চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা টিপ্ টিপ্ ব্যথা করে। তবু শেষ হয়ে আসছে বলে হাত থামায় নি শ্যামা। আজ রাতে বাবাকে পরিয়ে দেখবে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজের বিছানায় বসে সে বুনতে বুনতে হঠাৎ চীৎকারটা শুনতে পেল। হাত কেঁপে একটা ঘর গেল পড়ে। কাকার গলা। মাসে দু মাসে এক একদিন কাকা এরকম মাতাল হয়ে আসে। বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, রাস্তার লোক পাড়ার লোক জড়ো করে গালমন্দ পাড়ে। সেইসব গালমন্দের কোন মানে হয় না। কাকা লোকটা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে। বাঁধা মাইনে নয়। ফোলিওর ওপর কমিশন পায়। তার বৌ থাকে বাপের বাড়িতে, কাকার বিধবা শাশুড়ি মেয়েকে নিজের বাড়িতে একখানা বারান্দা সমেত ঘর লিখে দিয়েছেন, পাছে সেটা ভাইরা বেহাত করে সেই ভয়ে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গেও বনিবনা নেই, সেই বৌ স্কুলে চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়। কাকা গলা পর্যন্ত মদ গিলে যখন দুঃখবোধ করে তখন দাদার বাড়ির সামনে বা শ্বশুর বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায়; শ্যামার বাবার অপরাধ টালিগঞ্জে যে জমিটায় বাড়ি তুলছে সেটা কাকার শাশুড়ির কাছ থেকে সস্তায় কেনা। খাটাল ছিল, সেটা তুলে দিয়েছে শ্যামার বাবা। কাকার বিশ্বাস জমিটা বাবা না কিনলে

শাশুড়ি সেটা কাকার নামে লিখে দিত। এক সময়ে কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত শ্যামারা, নয়নদের পাড়ায়। সে সময়ে কাকার সঙ্গে নয়নের খুব ভাব ছিল। আজও আছে কিনা কে জানে! শ্যামা পরিষ্কার শুনতে পায় কাকা চীৎকার করে বলছে—আমার বৌকে কানমন্তর দিয়ে ভেন্ন করেছে কোন্ শালা ঐ সরিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা। বুকে হাত দিয়ে বলুক ঐ ব্যাটা আমার বৌকে বলেছে কিনা—বৌমা, মাতালটার ঘর কোরো না তুমি! বলেছে কিনা.....! পাপ করেছে বলেই ওর ছেলে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওর শান্তি আছে? শালা সাধু-তান্ত্রিকের পেছনে পয়সা ঢালে, মায়ের পেটের ভাই আমি পেটে আলসার, হাতে বাত নিয়ে নুলো হয়ে যাচ্ছি, আমাকে একটা পয়সাও ছোঁয়ায় না.......

পড়ে-যাওয়া ঘরটা সাবধানে কাঁটায় ফের তুলল শ্যামা। এখন আর বোনাটা এগোবে না। কাঁটা মুড়ে রেখে ওঠে শ্যামা। বাইরের ঘরে বাবা চেয়ারে বসে ঘামছে, পাশে দাঁড়িয়ে মা। পাখাটা পুরো জোরে ঘুরছে। রক্তচাপটা বিপজ্জনক সীমানাতেই ঘোরা ফেরা করে বাবার। কখন যে সীমাটা ছাড়িয়ে যায় শ্যামার সেই ভয়।

শ্যামা একটু হেসে বলে—বাবা, অমন করছ কেন? কাল তো আমরা মুর্গী খাচ্ছিই।

কাকা যেদিন গালমন্দ করে তার পরদিন সকালে মুর্গী হাতে এসে বাবার পায়ে পড়ে। তারপর কেটেকুটে বাড়ির পাশের গলিটায় স্টোভ জ্বেলে নিজেই রান্না করে। নুন ছাড়া খানিকটা তুলে রাখে বাবার জন্য! মা খায় না, বাকীটা কাকা আর শ্যামা খায়। এটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কাকা গাল দিলে পরদিন মুর্গী হবেই।

—আর মুর্গী! বাবা, অসহায় ভাবে মুখখানা তুলে বলে। শ্বাস ছেড়ে বলে—কী পাপে যে ওর শাশুড়ির জমিটা কিনেছিলাম!

মা ঝাঁঝ দিয়ে বলে—কেন কিনে দোষটা কী করেছ শুনি! ঠাকুরপোর শাশুড়ি জমিটা তো বেচতই!

বাবা লালচে মুখখানা তুলে বলে—বেচত তো বেচত। আমি নিমিত্তের ভাগী না হলেই হত। ভেবে দেখ, আমার বাড়ি করার তো কোন অর্থ নেই। আমরা বুড়োবুড়ি চোখ বুজলে ও বাড়িতে থাকবে কে?

মা হঠাৎ চুপ করে বাবার দিকে সোজা একটু চেয়ে থাকে, তারপর জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে চোখ, খ্যাপাটে গলায় বলে—বাড়িতে থাকবে কে!

কেন আমার টোকন ফিরবে না ভেবেছ? তোমার ধারণা কি যে আমার টোকন নেই? অ্যাঁ!

বাবা ইতস্তত করে বলে—সে কথা বলি নি। আঃ তুমি বড্ড কথা ঘোরাও, বলছিলাম কি—

—তোমার কথা আমি সব বুঝি।

শ্যামা নিঃশব্দে গিয়ে সদরের ছিটকিনিটা খুলল। মা বাবা ঝগড়া করছে, তাই লক্ষ্য করল না।

রাস্তায় বিকেলের ভরভরন্ত আলো। কাকা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তার চারধারে লোক জমেছে। ওধারের পার্কে খেলা হচ্ছিল, খেলা ভেঙে এসেছে কয়েকটা ছেলে, জুটেছে কিছু ভবঘুরে, কিছু ঝি-চাকর শ্রেণীর লোক। কাকা শ্রোতা পেয়ে ডিঙ মেরে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলছে—শালা আমার বৌকে যেমন ভেন্ন করেছে তেমনি ওর বৌ-মেয়েও ভেন্ন হবে। আমার শাশুড়িকে ভজিয়ে যে জমি দখল করে বাড়ি তুলছে সেখানে ইঁদুর বাদুড় ঘুরবে, শকুন পড়বে......

কাকা যখন এরকম অবস্থায় এসে চেঁচায় তখন শ্যামাদের বাড়ির কেউই বাইরে বেরোয় না। তাদের ভয় করে। তবু বাবার প্রেসারের কথা ভেবে ক্ষণেকের জন্য শ্যামা ভয় ভুলে গেল। বারান্দার রেলিঙ থেকে ঝুঁকে ডাকল—কাকা!

কাকা তখন স্বরচিত একটা ছড়ার মতো অনর্গল বলে যাচ্ছে—এই আমি তড়িৎ চৌধুরী, ঐ শালার মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমার শালা গো-ভাগাড়ে ঠাঁই। আই হ্যাভ এ পুত্তর বেলী, মনের দুঃখে মদ গিলি। মশাইরা.....বলতে বলতে শ্যামার ডাক শুনে তড়িৎ চৌধুরী ব্রেক কষে তাকাল। তাকিয়েই রইল শ্যামার দিকে, মুখখানা একটু হাঁ করে। তারপর বলল—কী বলছিস?

—ভিতরে এস।

—না।

—না কেন? যা বলার বাবাকে মুখোমুখী বল। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

—আলবৎ চেঁচাব। তোর বাবাকে বেরিয়ে আসতে বল। বলে তড়িৎ চৌধুরী শ্যামার দিকে পিছন ফিরে আবার চেঁচাতে শুরু করে—মশাইরা শুনুন....ঐ যে আমার ভাইঝি শ্যামা......ও নয়ন নামে একটা ছেলেকে ভালবাসে.....ডীপ লাভ্, ভেরী ডীপ লাভ....কিন্তু চামার সরিৎ চৌধুরী তবু

বিয়ে দেবে না। কারণ কি জানেন? ছেলেটা তেলী....হা হা....তেলী! তেলী আবার কী মশাইরা, অ্যাঁ! মানুষ মানুষ, তার আবার তেলী বামুন কিছু আছে নাকি আজকাল? মেয়েটা ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে একদিন মরবে, ছেলেটা আত্মহত্যা করবে দেখবেন। ঐ যে আমার ভাইঝি, ঐ শ্যামা, ওটার বিয়ে হবে না.....

রাস্তার লোকেরা শ্যামার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে শ্যামা সেটা বুঝতে পারে। লজ্জায় অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে তার মুখ। দেয়ালের আড়ালে সরে আসে শ্যামা। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে আসে ঘরে। থর থর করে তার শরীর কাঁপে।

আধঘণ্টাটাক চেঁচিয়ে কাকা চলে গেল। নিঃঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। রাতে তারা কেউ ভাল করে খেতে পারল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বাবা জিজ্ঞেস করে—তড়িৎ নয়নের কথা কী বলছিল রে?

শ্যামা মাথা নত করে বলে—কী জানি!

বাবা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে—নয়ন ওকে মদ টদ খাওয়াচ্ছে হয়তো। শ্যামা, খুব সাবধানে থাকিস। আমি শীগ্‌গিরই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

মা ঝংকার দেয়, পাত্র কোথায় যে বিয়ে দেবে?

—আমি সেই ডাক্তার ছেলেটার কথা ভাবছিলাম। বাবা বলে—ছেলেটা বড় ভাল ছিল।

আশায় আনন্দে হঠাৎ ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে শ্যামা।

মা মুখখানা পাথরের মত করে বলে—সন্নিসি-টন্নিসির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

শ্যামার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়।

বাবা মিনমিন করে বলে—নয়ন যদি তড়িৎকে হাত করে থাকে তবে বড় ভয়ের কথা। তড়িৎ মদ খেলে তো যা তা বলে, শ্যামার নামেও বলবে এর পর থেকে। তাই ভাবছি—

—তাই বলে যার তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দিতে হবে নাকি!

—যে সে তো নয়। বিলেতফেরত বড় ডাক্তার, মতি ফিরলে একদিন লাখ টাকা কামাবে—

—কামাক। তবু বলব, ও ছেলে অপয়া। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ছিল সে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, সেটা ভুলো না। তার ওপর

ভাবের পাগল লোক, ওদের কি বিশ্বাস আছে?

—তবে তুমি কী করতে বল?

মা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—কী বলব? আমার কি মাথার ঠিক আছে! এ সময়ে টোকনটা কাছে থাকলে আমি এত ভাবতাম না। বলে মা চোখে একটু আঁচল চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর বলে—যার তার হাতেই যদি মেয়ে দেব তো বরং নয়নের হাতেই দাও না কেন!

—কী বলছ এ সব?

—ঠিকই বলছি। অনেক ভেবে দেখেছি। জাতে ছোট তাতে আর আজকাল তো কিছু আটকায় না। মেয়ে নিজে থেকে ছোট জাতে রেজিস্ট্রী করে এলে কী করতে? ফেলে দিতে? তাই বলছি, নয়ন তো উকিলবাবুর এক ছেলে, বিস্তর টাকা পয়সা। ছেলেটা শ্যামার জন্যই কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, নইলে সেও তো ছাত্র ভালই ছিল, ডাক্তারী সেও পড়ত। বিয়ে না দিলে সে ছেলে হাঙ্গামা করবে না? হয়তো বোম কি ছোরা মারবে, কি আরও কত কাণ্ড করতে পারে—তাই বলছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে চল আমরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি টোকনকে খুঁজতে—

শ্যামা পাত ছেড়ে উঠে যায়।

মায়ের কাছে টোকনই সব, শ্যামা কেউ না—এই সত্যটা ভাবতে ভাবতে শ্যামা রাতে বিছানায় অন্ধকার মশারির বাইরে মশার শব্দ শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ জেগে রইল। খুব দূরের একজন মানুষ শ্যামার স্মৃতিতে ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। সেই মানুষটির জন্য এক উন্মুখ পিপাসা আজও আছে। থাকবে কি?

শ্যামা পাশ ফিরে শোয়। ফাঁকা বিছানার একটা ধারে একদিন একজন মানুষ জায়গা নেবে। কে সে? নয়ন? নয়নের কথা ভাবতেই শ্যামার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যায় অনিচ্ছায়। তবু যদি নয়নই হয়? হায় ঈশ্বর! শ্যামার ভিতরে এক প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ আর অনিচ্ছা নয়নের প্রতি ফণা তুলে আছে। মায়ের কথাটা ভাবে শ্যামা। অভিমানে চোখে জল চলে আসে।

ভোর রাতে শ্যামা শুনতে পায়, বাইরে একটা ময়না পাখি ডাকছে। চমৎকার কথা বলে পাখিটা। প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ' বলে ডাকল, তারপর বলল 'ওঠ, ওঠ, চোর এসেছে,' আধঘুমের মধ্যে আলস্যভরে শুনছিল শ্যামা। চমৎকার ডাক শিখেছে পাখিটা। তারপরই ভয়ঙ্কর চমকে

ওঠে সে। শুনতে পায়। পাখিটা তার জানালার কাছ ঘেঁষে ডাকছে—শ্যামা, শ্যা—মা তোমার চিঠি, তোমার চিঠি......' তারপর পাখিটা চুপ করে যায়।

নয়নপাখি!

শ্যামা উঠল না, কিন্তু সম্পূর্ণ জেগে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় শ্যামা নয়নের চিঠিটা পেল শিয়রের জানালা খুলে। জানালার বাইরের খাঁজে সাদা খামের চিঠিটা পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামা চিঠিটা হাতে নিল। নয়ন যতক্ষণ বেঁচে আছে, মুক্তি নেই।

চিঠিতে লেখা—চৌরাস্তায় একবার এস। না এলে সারাদিন বসে থাকব। মনে রেখ। সারাদিন।

শ্যামা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

সময় নিল শ্যামা। অনেকক্ষণ। ভাবল খানিক। তারপর বেলা বাড়লে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরে, চুলটা আঁচড়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

চৌরাস্তায় গাছতলার পশ্চিমার চায়ের দোকানটার পাশে নয়ন দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের ভাঁড়। শ্যামাকে দেখে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে হাসল দূর থেকেই।

ওর ঝাকড়-মাকড় চুলে একটা সবুজ পাতা খসে পড়েছে। আটকে আছে পাতাটা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে নয়নকে। তীব্র, তীক্ষ্ণ, জ্বালাধরা চেহারা। সুন্দর নয়, কিন্তু ওর দিকে দু'বার তাকাতে হয়। চলন্ত রাস্তা ওর পিছনে, মানুষজন ব্যস্ত ভাবে যাচ্ছে, একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল, বাস দাঁড়াল। সেই চলন্ত দৃশ্যকে পিছনে রেখে নয়ন দাঁড়িয়ে। চুলে সবুজ একটা পাতা। গা-টা শির শির করে শ্যামার। ভয়? হবেও বা।

—কী চাও নয়ন?

নয়ন মাটিতে রাখা একটা ঝোলা বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল—ওদিকে একটা কবরখানা আছে না?

—মসজিদ।

—মসজিদই হবে। সেখানে মাঠটা নির্জন। চল।

—কেন?

—কথা আছে।

—কথা শেষ হয়ে গেছে নয়ন।

নয়ন অকপট হাসি হাসে। বলে—দূর, কথা কি শেষ হয়? শোনো শ্যামা, আমার খুব একটা সময় নেই। বাবা বোধ হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। মারা গেলে অনেক ঝামেলা। আমাকে দেরী করিও না। বলে নিই। চল।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়ন হাঁটতে থাকে।

শ্যামা তার পিছনে।

মাঠটা আজও ফাঁকা। রোদ পড়ে আছে।

—তোমার বাবার কী হয়েছে নয়ন?

—সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস। আশা নেই।

—তাহলে তুমি এখানে কেন? এখন তো তোমার বাড়িতে থাকাই উচিত।

—উচিত! ঠিকই তো। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস বয়ে এনেছি অতদূর থেকে, না দেখিয়ে যাই কী করে? তা ছাড়া, লাভ কী? বাবার জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলেও আমাকে তার কিছু বলার ছিল না বা আমার কিছু শোনার ছিল না। আমরা এক বাড়িতে থাকতাম, এইমাত্র।

—তবু তুমি যাও। তোমার মায়েরও তো একজন সহায় চাই এ সময়ে!

—তুমি আমাকে যা হোক বলে তাড়াতে চাইছ শ্যামা। আমি তো বলছি, কাজ হলে যাব। আমার বাবার জন্য দুঃখ পেও না শ্যামা, আমি পাই না। যারা মরবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকে তারা কাউকে মরতে দেখলেও স্থির থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায়।

শ্যামা শ্বাস ফেলে বলে—এ তো যে কেউ নয়। তোমার বাবা।

নয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে—তুমি বড় সেকেলে শ্যামা। বাবা বাবা বাবা! বাবা তো কী? বাবা তো একটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণের অভিধা মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। তাই কেউ বাবা তুলে গাল দিলে আমার কোন রি-অ্যাকশন হয় না।

নয়ন নীচু হয়ে চাদরের গিঁট খুলল। ঝাঁপিটা বের করে ঘাসের উপর রাখল সযত্নে। শ্যামার দিকে চেয়ে হাসল।

শ্যামা ঝাঁপিটা দেখে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নয়ন পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বের করে দু হাতে পরে নিল।

—ওটাতে কী আছে নয়ন?

নয়ন খুব খুশীর হাসি হাসল—সাপ। একটা গোখরো সাপ শ্যামা বলেই চকিতে ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে নিল।

কপিশ একটা শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। গায়ের ঝকঝকে আঁশে রোদ চলকে ওঠে।

শ্যামা দু পা পিছিয়ে আসে—নয়ন। বলে আর্তস্বরে ডাকে।

—ভয় নেই শ্যামা।

শ্যামা এক অদ্ভুত চোখে নয়নের দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে সাপটার দিকে।

—তুমি পাগল।

সাপটা একটু অনড় রইল। তারপর আস্তে তার পিচ্ছিল শরীর পাক ছাড়তে থাকে। ঝাঁপির কাণার ওপর দিয়ে মুখ বের করে। তারপর হড় হড় করে নেমে আসতে থাকে ঘাসে, মাটিতে। আসছে তো আসছেই, শরীরের যেন তার শেষ নেই।

শ্যামা একটা চাপা চীৎকার করে প্রথমটায় মুখ ঢাকল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পারল না। অভ্যেস নেই তার ওপর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে।

নয়ন দৌড়ে এসে তার বাঁ হাত চেপে ধরে বলে—দোহাই, ভয় পেও না। আমি তো আছি। দেখ—

বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়ন দৌড়ে ফিরে গেল। সাপটা ততক্ষণে সর সর করে দেয়ালের ইঁটের খাঁজের দিকে অনেকটা চলে গেছে। নয়ন দৌড়ে গিয়ে দস্তানা পরা আনাড়ী হাতে সাপটার ঘাড় চেপে তুলে আনল। লকলকে সাপটা মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে ছোবল দিতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য পারল না। নয়ন ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

শ্যামার দিকে চেয়ে নয়ন হাসে—বিষদাঁত নেই।

শ্যামা বিশাল চোখে চেয়ে থাকে।

আর সেই চোখ দু'খানা মুগ্ধ হয়ে দেখে নয়ন। ঠিক এরকমটাই সে চেয়ে এসেছে এতকাল। এরকম বিস্ময় মাখানো মুগ্ধ চোখে শ্যামা তাকে চেয়ে দেখবে।

ঝাঁপির ভিতরে মুখটা ঢোকাতেই সাপটা আপনা থেকেই অভ্যস্ত পাকে জড়িয়ে নিঃঝুম হয়ে যায়। ঝাঁপিটার ঢাকানা বন্ধ করে দিল নয়ন।

—কাল সারা রাত ধরে ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিশ করেছি। শিখে যাব

শ্যামা।

শ্যামা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করে—কী শিখে যাবে?

—ধরা। কিছু না। জগদীশ খুব চাল নিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা একদম সোজা।

—জগদীশ কে?

—একজন। সাপ ধরে। ওস্তাদ লোক, কিন্তু শেখাতে চায় না।

—তুমি সাপ ধরতে শিখছ? কেন?

—তোমার জন্য।

শ্যামা বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলে—আমার জন্য?

—তোমার জন্যই। তোমাকে চমকে দেব বলে। দিই নি?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলল—দিয়েছ। অনেকদিন আমি এমন চমকাই নি।

শিশুর মত খুশীতে হাসে নয়ন। ওর রগ-ওঠা, চোখ-বসা মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তার মাথার চুলে এখনও সবুজ পাতাটা লেগে আছে। সে আস্তে করে বলে—শ্যামা, আমি সব পারি। সব।

—নয়ন, তুমি বাড়ি যাও।

—কেন?

—তোমার বাবার কাছে যাও।

নয়ন একটু চমকে বলে—ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। যাচ্ছি শ্যামা।

বলে তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে ঝাঁপি বাঁধে নয়ন। বাঁধতে বাঁধতেই মুখটা তুলে বলে—শ্যামা, তুমি ঠিক যেমন চাও আমি ঠিক তেমনটি হব। দেখে নিও। আমাকে সময় দাও শুধু।

শ্যামার একটু মায়া হয়। আবার ভয়ও। সেই পুরোনো কথা নয়ন আজও বলে যাচ্ছে।

—সাপটাকে কোথাও ছেড়ে দিও নয়ন।

নয়ন একটু হাসে—কেন শ্যামা? আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?

—পাচ্ছি।

—ওটার বিষদাঁত নেই।

—গজাবে।

নয়ন একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবে, তারপর বলে—তখন দেখা যাবে।

শ্যামা আস্তে করে বলে—নয়ন, এরকম পাগলামী করছ কেন? আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য. এতটা করার কোন মানে হয় না।

নয়ন হি-হি করে হাসে—এবার যদি আমাকে বিয়ে না কর শ্যামা, তবে একদিন তোমার ঘরে এটা চুপ করে ছেড়ে দিয়ে আসব।

—তা হয় না নয়ন।

—কী হয় না?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি না।

—সে কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তোমাকে বাসতেই হবে।

—কাঙালপনা করতে তোমার ঘেন্না হয় না?

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা মনস্থির করে বলে—নয়ন, আমি আর একজনকে ভালবাসি।

নয়ন চমকে যায়। চেয়ে থাকে। শ্যামা অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়।

নয়ন অবাক গলায় বলে—শ্যামা, এরকম কথা আগে কখনও বল নি। তোমার অনেক ফ্যান, বহু ছেলে ঘুরেছে তোমার পিছনে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে।

—নয়ন, আমি সত্যি বলছি।

—লোকটা কে?

—তুমি চিনবে না, সে দূরের লোক।

—তবু শুনি। কী করে সে?

—ডাক্তার।

—ডাক্তার? নয়ন শুকনো জিব ঠোঁট দিয়ে চাটে। তারপর আকুল গলায় বলে—কয়েকটা বছর সময় আমাকে দাও শ্যামা, আমি ডাক্তারী পাস করব। একবারে পাশ করব। দিনরাত পড়ব।

—আমি ডাক্তারটাকে ভালবাসি না। মানুষটাকে।

—সে কেমন মানুষ বল। আমি হুবহু তার মত হব।

শ্যামা ম্লান একটু হাসে। বলে—বাড়ি যাও নয়ন। বাবার কাছে যাও। সাপের ঝাঁপিটা হাতে নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামা। তারপর হাঁটতে থাকে।

নয়ন পিছু নেয় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতের ঝাঁপিটার ভিতরে মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ হয়।

উকিলবাবুর জ্ঞান আর ফেরে নি।

সাপের ঝুঁড়ি ঝোলায় নিয়ে যখন ফিরল নয়ন তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে! ফুল এবং মালা হাতে কয়েকজনকে দেখা গেল। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ। কেবল ওপরতলায় মা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে একরকম কান্নার শব্দ বের করছে মাঝে মাঝে।

নয়ন শান্ত ভাবে তার ঘরে চলে গেল। সাপের ঝুঁড়িটা সাবধানে রাখল খাটের নীচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল একটুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে তার বাবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। হাল ছেড়ে সে শ্যামার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, তাও পরিষ্কার মনে পড়ল না। শ্যামার বদলে নার্স মেয়েটির মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। একটু হাসে নয়ন। ঘুমহীন চোখজোড়া জ্বালা করে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে চোখে। চোখ বোজে। তারপর ক্লান্তিকর ঘুমের কথা ভাবে কাঙাল নয়ন। সে কবে একটু ঘুমোবে সোনেরিল না খেয়ে?

চাকরবাকররা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। ডাকতে সাহস পায় না কেউ। নয়ন আধবোজা চোখে দরজার পর্দায় কয়েকটা ছায়ার আনাগোনা দেখল। তারপর উঠল ধীরে সুস্থে। একবার ওপরে যাওয়া দরকার। শ্মশানেও যেতে হবে। এ সময়টায় সে কলকাতায় না থাকলেই ভাল হত।

ঠাকুরটা ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। খবরটা নয়নকে দেওয়ার জন্য চোখমুখ উদ্গ্রীব। সব মানুষেরই এই একটা দুর্বলতা থাকে, খবরটা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সবার আগে যে খবরটা পৌঁছে দিয়ে সে একধরনের তৃপ্তি বোধ করে। যেন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেছে। ঠাকুরটার মুখে চোখেও সেইরকম উত্তেজিত ভাব। নয়ন বেরোতেই সে কাছে এসে বলে—বাবু, বড়বাবু নেই—

নয়ন একটু বিস্ময়ের ভাণ করে বলে—নেই? কোথায় বেরিয়েছে? এত বেলায়?

চাকরটা খাওয়ার টেবিলে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। আসলে ন্যাতা বোলানোটা কাজ নয়, নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ঐখানে, নয়ন বেরোলে খবরটা দেবে, কিন্তু নয়নের কথা শুনে চালাক চাকরটা ফিক করে একটু হেসে সামলে গেল, বলল—বেরোন নি। মারা গেলেন একটু আগে।

নয়ন গম্ভীর চোখে চাকরটাকে একটু দেখল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল চাকরটা।

নয়ন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল—আমার ঘরে এর মধ্যে কেউ যেন ঝাঁট ফাঁট দিতে না যায়, দেখিস। ঘরে আমি একটা গোখরো সাপ পুষেছি। কেউ যদি ঢোকে টের পাই তবে জুতিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেব।

ঠাকুরটা সভয়ে ঘাড় নাড়ে।

নয়ন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। অনেক লোক জমেছে ওপরতলায়। বার লাইব্রেরী থেকে তার বাবার বন্ধুরা এসেছে, মক্কেল এসেছে, আর আত্মীয়-স্বজন। ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধে টেঁকা যায় না। নয়নকে দেখে মা আর একবার শ্বাসকষ্ট চেপে কাঁদবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন কোন শব্দ হয় না। দু একজন বুড়ো বয়স্ক আত্মীয় নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে অনিচ্ছার সঙ্গে। তারা নয়নকে চেনে। দু একটা কথা বলে তারা চুপ করে যায়, বৃথা জেনে।

কিন্তু নয়নের মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটে ছিল ঠিকই, সে তার ক্লান্তির জন্য। ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখের কোলে কালি, ভাঙা মুখে শিরা-উপশিরা, পিঙ্গল এলোমেলো ধুলোটে চুল। নার্স মেয়েটা খাটে শোয়ানো দেহটার মাথা এবং বুক জুড়ে বার লাইব্রেরী থেকে পাঠানো একটা প্রকাণ্ড লরেল মালা সাজিয়ে রেখে নয়নের কাছে এগিয়ে এল। বলল—আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

নয়ন একটু হাসতে গিয়ে হাসল না। বলল—মাথাটা বড্ড ধরেছে। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ঐরকম কিছু আছে?

—না। আমি ওসব রাখি না।

—তবে কী আছে?

মেয়েটা একটু ইতস্ততঃ করে বলে—কী চাই বলুন, কাউকে ডেকে আনিয়ে দিই।

নয়ন একঘর লোকের চোখের সামনেই মেয়েটির দিকে স্থির তাকিয়ে

থেকে বলল—অ্যাসপিরিন না থাক, ক্লোরোফিল বা ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন, কিছু নেই? নাথিং?

মেয়েটা বোবার মত ঘাড় নাড়ে।

নয়ন দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শ্মশান পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন নির্ভাবনায় বলে—কেন কষ্ট হবে জানেন? শ্মশানে যাওয়ার সময়ে কেউ আজ কথা বলবে না। একটা ট্রাজিক ব্যাপার তো। কিন্তু অতদূর রাস্তা চুপ করে মুখ বুজে যাওয়া ভারী কষ্টের। আমি এখন অনেক কথা বলতে চাই।

মেয়েটার চোখে মুখে ক্রমশঃ একটা ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। নয়ন তা লক্ষ্য করে। আস্তে করে বলে—আপনি যাবেন না শ্মশানে?

—আমি! আমি কেন যাব?

—গেলে দোষ কী? আমি বরং একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করি। ডেডবডি নিয়ে শ্মশানবন্ধুরা যাবে। আমরা ঘুর পথে অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাব। শ্মশানে যাচ্ছি বলে মনেও হবে না, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। চলুন না।

—না। মেয়েটা মাথা নাড়ল। তারপর খাটের কাছে ফিরে গেল আবার।

ফ্ল্যাশলাইট লাগানো ক্যামেরা হাতে দুজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নয়ন বারান্দায় বেরিয়ে এল। মরেই গেছে লোকটা, তবু তার ছবি কেন যে তুলে রাখে মানুষ! মরা মানুষের ছবিতে মানুষটা চিরকাল মৃতই থেকে যাবে।

বারান্দায় বাতাস আর রোদ খেলা করছে। রেলিঙে দুটো চড়াই। 'কিচিক কিচিক' শব্দ করে লাফিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসছে। খেলছে। অন্যমনেই নয়ন আপনা থেকেই শব্দটা গলায় তুলে আনল। ডাকতে লাগল '—কিচিক্—চি-র্-র্-র্—কিচিক্—'

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। নয়ন স্নান করে নি। আদিগঙ্গার এক হাঁটু কাদায় নেমে এক কোষ ময়লা জল তুলে মাথায়

চাপিয়েছিল। ফেরার সময়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর গোটা কয় সিঙ্গাড়া খেল। তাতেই বুক জুড়ে অম্বল উঠল ঠেলে। শরীরটায় একটা জ্বালাভাব। সারাটা দিনের রোদ, চিতার আঁচ, ধোঁয়া—সব মিলিয়ে চড়চড় করছে গায়ের চামড়া।

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নয়ন। কোরা কাপড় পরে খাওয়ার ঘরে এসে দেখে নার্স মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, চুল আঁচড়ানো, পায়ে চটি।

—চলে যাচ্ছেন? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি সামান্য একটু হাসে, বলে—যাচ্ছি। তবে আপনার মায়েরও নার্সিং দরকার, তাই কাল সকালে আবার আসব।

নয়ন হাই তুলে বলে—রাতে নার্সিংয়ের দরকার হয় না বুঝি?

—হবে না কেন? রাতের শিফ্‌টের নার্স এসে গেছে। বলে মেয়েটি হাসল, তারপর নয়নকে ভীষণ চমকে দিয়ে বলল—এই নার্সটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

নয়ন একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এতটা আশা করে নি। একটু থমকে গিয়ে বলে—আচ্ছা!

মেয়েটা চলে যায়।

ঘরে এসে নয়ন কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে পড়ে থাকে।

তার বাবা কত টাকা রেখে গেছে তার হিসেব নয়ন রাখে না। তবে, অনেক টাকা, অনেক। নয়নের বাকী জীবনটা কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার বাবা ছিলেন উকিল মানুষ। আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ লোক। ব্যাঙ্কের লকার, মায়ের গয়না, লুকোন টাকা—সব কিছুর হিসেব নয়ন বোধ হয় কোনদিনই বের করতে পারবে না। কলকাতায় আরো একটা বাড়ি আছে তাদের, হাজারখানেক টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাবা মাঝে মাঝে শাসিয়ে বলত বটে, সব সম্পত্তি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিক সেটা করার মত যথেষ্ট মানসিক জোর তার ছিল না। নয়ন জানে, তার বাবা তাকেই সব দিয়ে গেছে। তার এক দাদা আছে। দীর্ঘকাল আগে সে দাদা আপন পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে, বাবা তাই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। সেই দাদা বাইরে ভাল চাকরি করে। তাকেও শেষ পর্যন্ত বাবা কিছু দিয়ে গেছে কিনা কে জানে। সেই দাদা হয়তো কিছু দাবী-দাওয়া করতে পারে। করুক, নয়নের তাতে

কিছু যায় আসে না, সে যে নিজে বেশ কিছু টাকা পয়সা হাতে পাবে, এই খবরটাই যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে সোনেরিলের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায় নয়ন। তারপর স্বপ্ন দেখে। মোনা ঠাকুরের কালীমূর্তি জ্যান্ত হয়ে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে। জগদীশকেও দেখা যায়, মাফ্‌লারের বদলে গলায় এক গাদা সাপ জড়িয়ে খুব কাশছে। এমনি পাগলাটে খ্যাপাটে সব স্বপ্ন।

সোনেরিলের ঘুম নয়নের বেশীক্ষণ থাকে না। ওষুধটা তাকে আজকাল আর তেমন ধরছে না। রোজ খায় বলেই বোধ হয়। মাঝরাতে নয়নের ঘুম ভাঙল। ঘরের বাতিটা জ্বলছে, পায়ের দিককার জানালা খোলা। ভীষণ ঠাণ্ডা আসছে। বিছানার চাদর তুলে নয়ন মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খেল। রাতটাই অসহ্য, কিছু করার থাকে না।

জানালাটা বন্ধ করে নয়ন সাপের ঝুড়িটা বের করে। দু'হাতে চামড়ার দস্তানা পরে ঢাকনাটা খোলে। সাপটা ঘুমোচ্ছে। দেখে নয়ন হিংসে বোধ করে। সাপটাকে খোঁচাতে আঙুল উঁচিয়েছিল নয়ন। তারপর আবার সাবধানে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ঝুড়িটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল! কিছুক্ষণ পায়চারী করল। তারপর একঘেয়ে এই জেগে থাকা থেকে মুক্তি পেতে সোনেরিলের কৌটোটা টেবিলের ওপর খুঁজতে লাগল। আর হঠাৎ তখনই মনে পড়ল, নার্স মেয়েটি বলে গিয়েছিল, রাতের শিফ্‌টের নার্স দেখতে সুন্দর। মনে পড়তেই নয়ন আপনমনে একটু হাসে।

সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতই নিঃশব্দে উঠে আসে নয়ন। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মিহি মেয়ে গলার প্রশ্ন আসে—কে?

—দরজাটা খুলুন।

পায়ের শব্দ ভিতরে দরজার কাছে আসে। নয়ন উত্তেজনা বোধ করে।

—আপনি কে? প্রশ্ন আসে।

—আমি নয়ন।

—নয়ন কে, আমি চিনি না।

—এ বাড়ির ছেলে। আমার মাকে দেখতে এসেছি।

—ও!

পরমুহূর্তেই ছিটকিনির শব্দ। দরজা খুলে যায়।

সুন্দর! না, মোটেই না। ভারী হতাশ হয় নয়ন। বড্ড রোগা মেয়েটি। গায়ের রং ফ্যাকাসে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েলী রোগে ভোগে। ম্যাল নিউট্রিশন। ক্যালোরি খায় না। প্রোটীন নেই। ভিটামিন সি-এর অভাব। তবু মেয়ে।

মেয়েটি দরজা ছেড়ে দিয়ে বলে—উনি ঘুমোচ্ছেন।

—কে? নয়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—আপনার মা। আপনি তো মাকে দেখতেই এসেছেন!

—ওঃ, হ্যাঁ। থাক, ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।

—চিন্তা নেই। উনি সামলে উঠেছেন।

নয়ন হাসল। বলল—আসলে আমার বাবা আর মার মধ্যে রিলেশনটা তেমন ভাল ছিল না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না।

মেয়েটা কথা বলল না। অপ্রস্তুত ভাবে চুপ করে রইল।

নয়ন জিজ্ঞেস করে—আপনি কী করছেন?

—তেমন কিছু না। অ্যালার্ট থাকছি, যদি কিছু দরকাব হয়।

—বোরিং লাগছে না?

—আমার অভ্যাস আছে।

—তা তো আছেই। তবু বড় একঘেয়ে! আমারও ভীষণ ইনসোম্‌নিয়া। একা জেগে থাকতে যে কী কষ্ট!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন বলে—চা খাবেন?

—চা?

—চা। আমি নিজে করব, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে খাব। আসুন না নীচের খাওয়ার ঘরে।

মেয়েটা ইতস্ততঃ করে!

নয়ন মৃদুস্বরে বলে—মা নিশ্চয়ই ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোচ্ছে?

—না। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

—তবে জাগবে না। নিশ্চিন্তে আসুন।

নয়ন পিছু ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটপট সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানোই থাকে খাওয়ার ঘরে নয়নের জন্য ঘুমহীন রাতে সে উঠে কখন কখন চা করে খায়। দু কাপ জল চাপিয়ে নয়ন খাওয়ার

টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মেয়েটি এল। মায়ের ঘরের অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় নি। এখন দেখল নয়ন, মেয়েটির মুখশ্রী খুব খারাপ নয়। দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাক ভোঁতা, তবে চোখ দু'খানা ভালই। সিঁথিটায় সিঁদুর থাকতে পারে, নয়ন সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়েটি অবাক চোখে নয়নকে দেখছে। হয়তো ভয়ও পাচ্ছে! যে লোকটার বাবা আজ সকালে মারা গেছে তার এমন সহজ ভাব দেখেই হয়তো বিস্ময়।

নয়ন চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসে, বলে—বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনও ভাল ছিল না। উই ওয়্যার মিউচুয়াল এনিমিজ্।

মেয়েটা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে ঠিক্ করতে পারে না।

নয়ন বলে—কিন্তু তবু বাবার কয়েক লাখ টাকা আমিই পাব।

মেয়েটা ভ্রূ তুলে সামান্য কৌতূহলের গলায় বলে—কয় লাখ?

নয়ন ঠোঁট ওল্টায়—কে জানে! বিশ-ত্রিশ লাখ হতে পারে। দশ-বারো লাখও হতে পারে। বাবার অঢেল ব্ল্যাক মানি ছিল।

—টাকাটা পেয়ে কী করবেন? নয়ন চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখী বসতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

—কী করব! কী আবার, ওড়াব।

—ওড়াবেন মানে? ওড়াবেন কেন?

—অত টাকা নিয়ে আর কী করা যায়। চাকরি করব না, ব্যবসা করব না, কিচ্ছু করার দরকারও হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার বেকার সমস্যা নেই। আমার সমস্যা সময় নিয়ে। আয়ুর লম্বা সময় জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে হলে টাকা ওড়ানো ছাড়া কী করা যাবে!

মেয়েটা ঠিক বুঝল না, একটু সময় নিয়ে বলল—জেগে থেকে কেন বলছেন?

—আমার ইনসোম্‌নিয়া। বড্ড কষ্ট। ঘুম হয় না। সেই নির্ঘুম সময়টায় আমি চলে যাব রাতের ক্লাবে—যেখানে সারা রাত নাচ গান হয়। একটা গাড়ি কিনে সারা রাত ধরে চালাব রাস্তায় রাস্তায়। মাইনে করা লোক রাখব যারা সারা রাত আমার সঙ্গে জেগে থেকে তাস দাবা খেলবে, গল্প করবে। একটা প্রোজেক্টার মেশিন কিনে সারারাত ফিল্‌ম্ ঘুরিয়ে ছবি দেখব। সোনেরিলে আজকাল আর ঘুম তেমন হয় না। সব ওষুধেরই ইম্যিউনিটি আছে। ভয় হয়, এর পর আর ঘুমের ওষুধে কাজই হবে না।

সারাটা জীবন জেগে থাকতে হবে।

মেয়েটা ডান গালে একটা আঙুল ছুইয়ে বসে তাকিয়ে আছে। খুব অবাকদৃষ্টি। একটুও ঠাট্টার ভাব নেই মুখে। সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল—অনেক সময় সেরেও যায়।

—কি রকম? নয়ন কৃত্রিম আগ্রহ দেখায়।

—একটা মেয়েকে চিনতাম যে ঘুমোত না বলে তার স্বামী তাকে সেতার কিনে দেয়। সারা রাত ধরে মেয়েটা আলাদা একটা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাত। প্রথমে টুংটাং করতে করতে আস্তে আস্তে সে সুর বুঝতে শেখে। সেতারের প্রাণটাও সে একদিন ধরতে পারে। সারারাত ধরে সে সেতারে ডুবে থাকতে শিখল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সে সেতারের শব্দ পার হয়ে সুরের নিস্তব্ধ জগতে পৌঁছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে সেতার থামিয়ে চুপ করে ঝুম্ হয়ে বসে থাকত। সে আমাকে বলছিল, ঐ ভাবে বসে থেকে সে এক নিস্তব্ধতার সুর শুনতে পেত। শুনতে শুনতে একদিন সে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নয়ন হাসল—এ তো গল্প।

—গল্প নয়। তবে গল্পের মতই। মেয়েটা সেরে গেছে।

—সত্যি?

—সত্যি।

টেবিলের ওপরের মসৃণ খয়েরী সানমাইকায় ধীর গতিতে নয়নের হাতটা এগিয়ে যায়। নয়ন লোল হেসে বলে—আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে আমার একটা শর্ত হবে।

—কী শর্ত?

—সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলায় সে যত খুশী ঘুমিয়ে নিক, কিন্তু রাতে, রোজ রাতে আমাদের বাসর জাগা। কেউ বোধ হয় রাজী হবে না! না?

—হতে পারে।

—কে হবে! আমি জানি, মেয়েরা রাত বারোটার বেশী জাগতে ভালবাসে না। তারা বড় ঘুমকাতুরে।

বলতে বলতে নয়ন হাত বাড়ায়। মেয়েটা একটা হাতে মাথার ভর রেখে হেলে বসেছে। নয়ন ভঙ্গীটা দেখল। চওড়া টেবিল প্রায় অতিক্রম করেছে তার হাত। সে হাতখানা তোলে ফণার মত।

—আপনি পারেন না?

—কী? মেয়েটা চমকে উঠে বলে।

ঝপ করে ছোবল দেয় নয়নের হাত। উত্তপ্ত ব্যাকুল হাতে মুঠো করে ধরে একরাশ বকুলের মত নরম করতল। পিষে ফেলে নির্যাস নিংড়ে নিতে নিতে বিকৃত ভয়াল গলায় বলে—আমার সঙ্গে জেগে থাকতে। রোজ। পারেন না?

লক্ষপতির সঙ্গে জেগে থাকতে কোন্ মেয়ে রাজী নয়? এ মেয়েটিও হয়তো রাজী হত। কিন্তু নয়নেরই দোষ। সে যা চায় তার জন্য সময় দেয় না। মেয়েটা 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চাপা গলায় চীৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁফায়। চেয়ার টেবিলের ঘোর শব্দ ওঠে নিশুত রাতে। চাকর বাকর জেগে যাবে। তাই নয়ন আর চেষ্টা করে না। মেয়েটা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

নয়ন ঘরে গিয়ে সাপের ঝুড়িটা টেনে আনে। ঝাঁপি খুলে দস্তানা পরা হাত এগিয়ে টেনে তোলে সাপটাকে। মুখোমুখী ভয়ঙ্কর দুজন দুজনের দিকে তাকায়। তারপর শুরু হল আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ। রাত ভোর হয়ে আসে।

দিনের বেলায় আবার চমৎকার বোধ করে নয়ন। ঘুমের জন্য তার একটুও দুঃখ হয় না। শরীরটা হাল্কা লাগে। চায়ের সঙ্গে গোটা দুই অ্যাসপিরিন গিলবার পনেরো মিনিট পর আধকপালে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেল।

খবরের কাগজ অনেকদিন দেখা হয় নি। আজ খাওয়ার টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল। বরাবর সে খেলার পাতাটা আগে দেখে। খুলে দেখল, দলীয় ট্রফির একটা আঞ্চলিক খেলা চলছে ইডেনে। আজ দ্বিতীয় দিন।

কিছু না ভেবেই নয়ন পোশাক পাল্টাল। জলপাই রঙের প্যান্ট, লাল জামা, গলায় রঙীন সিল্কের মাফলার, চওড়া বেল্ট, চোখে রোদচশমা। বেরিয়ে সে মোড়ের দাকান থেকে সিগারেট কিনল। দোকানের আয়নায় নিজের ধারাল চেহারাটা দেখল একটু। দেখতে দেখতে শিস্ দিল। দু'হাতে চুলগুলো চেপে ঠিক করে নিচ্ছিল, সে সময়ে লক্ষ্য করল দোকানদার মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মহাদেব বলল—বাবু, কাল তো বড়বাবু মারা গেলেন।

—হ্যাঁ মহাদেব। আফ্‌শোষের ব্যাপার। নয়ন গলায় যথেষ্ট দুঃখ ফোটাতে চেষ্টা করে।

—তো ইটা আপনার কী পোশাক হল? ই সময়ে কেউ প্যান্ট শার্ট পরে? নোত্তুন কাপড় পরে তো!

ঝাঁৎ করে ভুলটা ধরতে পারে নয়ন। কখন যে বে-খেয়ালে কোরা কাপড়টা ছেড়ে অভ্যাসবশতঃ রোজকার মত প্যান্ট শার্ট পরেছে তা বুঝতেই পারে নি। ভুল হয়ে গেছে বড়। পাড়ার চেনা লোকেরা অবশ্যই দেখেছে নয়নকে এই পোশাকে! নয়ন জিভ কাটল।

ভুলটা শোধরাতে নয়ন তাড়াতাড়ি পাড়ার রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আসে। অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে। ট্যাক্সি ধরে বড় রাস্তায়। শোকের পোশাকটা ভুল করে ছেড়ে ফেলেছে ঠিকই। তবু ট্যাক্সিতে বসে ভুলটার জন্য আবার ভালই বোধ করতে থাকে সে। একজনের মৃত্যুর ঘটনা আর একজনের পোশাকে বিজ্ঞাপনের মত ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। নয়নের মুখে তো লেখা নেই যে গতকাল তার বাবা মারা গেছে! স্বাভাবিক পোশাকে সে বরং বেশ সহজ বোধ করতে থাকে।

মাঠে সে সাইট স্ক্রীণের পাশে গ্যালারিতে উঠে বসে। বেশ ভীড়। ভীড়ে কেউ কারও চেনা নয়। নয়ন অলস ভঙ্গীতে বসে খেলা দেখে।

ইষ্ট্ জোন্-এর সাত নম্বর খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করবে বলে কেউ ভাবে নি। —কিন্তু সারাটা সকাল ঠুকে ঠুকে খেলে ছেলেটা নব্বুইয়ে যখন পৌঁছে গেল তখনই প্রথম খেলাটায় কিছু উত্তেজনা বোধ করে নয়ন। একটু ঝুঁকে বসে। ছেলেটা একটা ওভার মেডেন দিল। তারপর পর পর দুটো চার মেরে এবং একটা রান্ নিয়ে পৌঁছোল নিরানব্বইয়ে। সারা মাঠে উত্তেজনা, চীৎকার। শক্ত পাল্লার সাউথ জোনের সঙ্গে এমন হাড্ডাহাড্ডি ব্যাটিং কেউ আশা করে নি। নয়ন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল—রান্—ওঃ একটা রান্—

—বসে পড়ুন—পেছন থেকে কে চেঁচাল। তারপর জামা ধরে টানল নয়নের। নয়ন শুধু গায়ে পড়া আবশোলা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে পিছনে হাত নিয়ে অচেনা হাতটা ঝেড়ে ফেলল।

লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। পাঁচটা বল পাঁচটা বোমার মত। সাত নম্বর ব্যাটস্‌ম্যান মাঠের চীৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে। স্কোরবোর্ডটা দেখে

নিয়ে পর পর পাঁচটা বল ঠেকিয়ে দিল আড়ষ্ঠ ভঙ্গীতে। খেলছে না। পারছে না।

—ওঃ, একটা রান! নয়ন চেঁচায়। তার দেখাদেখি আশপাশের হাজার জন গ্যালারীতে উঠে দাঁড়াতে থাকে! 'বসে পড়ুন' চীৎকার করতে করতে বসা লোকেরা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাঠের মাঝখানে একটা রানের জন্য প্রার্থনারত ছেলেটা ছয় নম্বর বলটা খেলতে পারল না। বোল্ড।

—খানকীর বাচ্চা! শালা! পাগলের মত চেঁচাল নয়ন মাথার চুল চেপে ধরে! তারপর আবার চেঁচাল—'ইয়ে' করগে বাঞ্চোৎ—

বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে এক বাবা সামনের বেঞ্চে বসে। ভদ্রলোক নয়নের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। নয়ন সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চোখে তার নিজের চোখ ফেরত দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার টিফিনের বাক্স খোলে।

লাঞ্চ্।

নয়ন গ্যালারী থেকে অনেকটা নিচুতে চ্যানেলে লাফ দিয়ে নামে। আধকপালে মাথাধরাটা আবার শুরু হয়েছে! সারাক্ষণ মুখে রোদ, মাথায় উত্তেজনা, নাকে ধুলো। মাথা ধরতেই পারে।

গ্যালারীর নীচে ছায়া। বাঁশের বেড়া দেওয়া খাবারের দোকানে ভীড়। এক কাপ চায়ের জন্য নয়ন একটু ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু শান্ত ভাবে, ঠেলাঠেলি না করে কোথাও চা পাওয়ার উপায় নেই। ক্ষিদে-তেষ্টায় পাগল হয়ে মানুষরা হামলে পড়ছে।

কিন্তু নয়নের একটু চা বড় দরকার।

বাঁশের চৌখুপী ঘেরা দোকানটার কাছে গেল নয়ন। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়িয়ে। হাজারটা হাত দোকানীর দিকে বাড়ানো। 'এই আমারটা—আমার এক কাপ চা, দুটো কাটলেট' এই সব চীৎকারে একটা দাঙ্গার মত ভাব। মানুষেরা ক্ষেপে আছে। তপ্ত, শুষ্ক মানুষ। এক্ষুণি ফাটবে। বাইরের দোকানের চেয়ে দ্বিগুণ দামের খাবার। আর চা—পয়সা বাড়িয়েও পাওয়া যাচ্ছে না! তিনটে পশ্চিমা দোকানদার নাজেহাল হচ্ছে। দিশেহাবার মত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নয়ন শান্ত ভাবে কনুই দিয়ে একটা মোটা মাড়োয়ারীকে সরিয়ে বাঁশের বেড়ায় ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁচু কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বলল—এক ভাঁড় চা—

কথাটা কোথাও পৌঁছোল না, যে লোকটা প্রকাণ্ড কেটলী থেকে চা ঢালছে সে নয়নের কাছ থেকে দু বিঘৎ দূরে মাত্র। নয়ন আবার আগের মত চেঁচিয়ে বলল—চা—

লোকটা শুনল না। পিছন থেকে মাড়োয়ারীটা নয়নকে সরানোর চেষ্টা করছে শরীরটা ঠেলে সামনে এগিয়ে দিয়ে। নয়নের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে চারদিকের চীৎকারে।

নয়ন তৃতীয়বার বলল—চা—আ—আ—

তার বাড়ানো হাত শূন্যে রইল। মাথা ধরাটা ফিরে আসছে। বাড়ছে। মাথার ভিতরে চমকে উঠেছে রগ।

অনেক দিন আগে শিয়ালদায় বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছাত্র ধরা পড়েছিল। সেই থেকে একটা ছাত্র হাঙ্গামার সূত্রপাত। নয়ন তখন হিন্দু স্কুলে শেষ ক্লাসে পড়ে। হাঙ্গামা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। শিয়ালদার কাছে ছাত্ররা রাস্তা আটকে ট্রামে বাসে আগুন দিচ্ছে তখন। পুলিশ ছিল না। নয়ন তখন একদল ছাত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল। এগারটা ট্রাম সারি সারি দাঁড়িয়ে। তার শেষ দুটোতে আগুন দিয়েছিল নয়ন। একাই লাফিয়ে উঠেছিল ট্রামে, যাত্রীদের শাসিয়ে নেমে যেতে বলেছিল। এক ভীড় লোক মেড়ার মত সুড় সুড় করে নেমে গেল। আর নয়ন ব্লেড দিয়ে সীটের খোসা ছাড়িয়ে ছোবড়া বের করে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেনেটোলা লেনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—শিয়ালদার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাচ্ছে এগারোটা ট্রামগাড়ি।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ দেখতে পেল নয়ন।

আর একবার একটা ফিলমের রিলিজের দিন ভারতীতে হাউসফুল। লবীতে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিট না পেয়ে। যদি কেউ বাড়তি টিকিট বিক্রী করে এই আশায়। সেই সময়ে একটি চশমাপরা ভালমানুষ মেয়ে টিকিট ফেরত দিতে এলে একরাশ লোক মেয়েটাকে ছেঁকে ধরে। প্রায় ত্রিশজনের ভীড়ের মধ্যে মেয়েটি দুটো টিকিট মুঠোয় ধরে কান চেপে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে চেয়েছিল। কাকে টিকিট দেবে ঠিক করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বহু লোক পাঁচ দশটাকার নোট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চীৎকার করছিল—'আমি দশ দেব', 'আমি পাঁচ', 'আমি আগে ওকে

ধরেছি'। নয়ন দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে যায়। দু-চারজনকে হিঁচড়ে সরিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর একপলক চিন্তা না করে বিনা দ্বিধায় মেয়েটির কনুই চেপে ধরে একটু জোরের সঙ্গে ভীড়টা কেটে বেরিয়ে আসে। বিশ-ত্রিশজন বোকার মত চেয়ে দেখে। নয়ন লবীর এক কোণে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে যথার্থ দামে টিকিট দুটো নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ একটিও কথা বলে নি। বরং দু একজন শ্রদ্ধা-প্রশংসার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

নয়ন আর চেঁচাল না। চেঁচিয়ে লাভ নেই। চা-ওলা লোকটা এই ভীড়ে নয়নকে আলাদা করে চিনবে না। চেনাতে হলে কিছু করতে হবে। ভীড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নয়ন জানে।

বাঁশের বেড়াটা কেউ ডিঙোয়নি ভদ্রতাবশতঃ। নয়ন এক পলকও দ্বিধা না করে বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। চোখের নিমেষে চা-ওলার হাত থেকে কেটলীটা কেড়ে নিল। ঝুড়ি থেকে একটা ভাঁড় তুলে চা ঢালতে লাগল।

বাইরে লোকেরা একটু সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বুঝল, অরাজকতার ইংগিত, লুটের গন্ধ। পরমুহূর্তেই হাজারটা মানুষ পার হয়ে আসতে লাগল বাঁশের বেড়া। মড় মড় করে বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। দৌড়, পায়ের আওয়াজ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ইতর একপাল ছেলে কাটলেটের থালাটা কয়েকটা থাবায় উড়িয়ে নিল, চপের ঝুড়ি থেকে কে একমুঠো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। কেকের বয়ামটার দিকে বাড়ানো হাতগুলো খাব্‌লা মেরে দলা পাকানো কেক তুলে নিচ্ছে মুঠো ভরে। কে একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা হারামীরা তিনগুণ দাম নেয়। লোট্‌ শালাদের। মেরে তক্তা করে দে।' তিনটে পশ্চিমা বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর লুট আর লুট।

নয়ন ভীড় ছেড়ে কষ্টে বাইরে এল! এক ভাঁড় চায়ের অর্ধেক তখনও তার হাতে ধরা। একটু দূর থেকে সে লুটের দৃশ্যটা দেখল দাঁড়িয়ে। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে গ্যালারীর ছায়া পার হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। খেলা দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না তার।

কাকা মুর্গী নিয়ে এল ঠিকই, তবে পরদিন নয়। এল দিন পনেরো পর। হাতে প্রকাণ্ড পা বাঁধা লাল মুর্গী, অন্ততঃ এক কেজি মাংস হবে, অন্যহাতে মিষ্টির বড় বাক্স। সঙ্গে ঝাঁকামুটের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আনাজপাতি। মহার্ঘ নতুন ফুলকপি, বড় বেগুন থেকে শুরু করে ঘিয়ের কৌটো পর্যন্ত। কাকার পরনে ফিনফিনে ধুতী, পাঞ্জাবী। একেবারে বরকর্তা। মুখে অপরাধী হাসি।

বাইরের ঘরে শ্যামার বাবা বসেছিল। রবিবারের সকাল দশটা। শ্যামার বাবার হাতে খবরের কাগজ, পাশে চা। ছোটভাইকে ঢুকতে দেখে একটু তাকাল। জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে একবার বলল—এত সব! কী ব্যাপার? আর কোন কথা হল না। কোনদিনই কথাবার্তা তেমন হয় না। হলেও কাকার মাতলামীর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বাবা। আজও ব্যাপার দেখে আবার খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

জিনিসপত্র রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে কাকা মাকে বলল—বৌদি, একটা কথা আছে।

—কী কথা?

—বলছি। বলে কাকা এসে শ্যামার ঘরে উঁকি মারে।

মুখ বাড়িয়ে বলে—উনুনটা ধরা তো শ্যামা।

ঘর গোছাচ্ছিল শ্যামা, মুখ ফিরিয়ে কাকাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—কেন?

—তুই ধরা তো। কেন, সে খাওয়ার সময়ে বুঝবি।

শ্যামা মুখখানা ভার রেখেই বলল—এত সব কিনে এনেছ কেন? এমনিতে তো বল তোমার পয়সা নেই।

কাকা একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলল—নেই তো নেই, তা বলে মাঝে-মধ্যে একটু খাওয়া-দাওয়া করব না। গরীবেরা তো খেয়েই মরে।

শ্যামা একটু খর গলায় বলে—পয়সা পাও কোথায়?

কাকা একটু থমকে যায়। সকলেই জানে, শ্যামা নরম মেয়ে। তার গলায় ঝাঁঝ খুব কম শোনা যায়।

কাকা থমকে থাকে একটু, তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে—যেখান থেকেই পাই তাতে তোর কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

—কোথা থেকে পয়সা পাও সেটা আগে বল, নইলে ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা খাব না।

—তুই না খাস খাওয়ার লোক আছে, চেঁচাস না।

—আমি চেঁচাব। ওসব এ বাড়িতে কেউ খাবে না, তোমার লজ্জা করে না, নিজের দাদা ভাইঝি সবাইকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকের কাছে যা তা বলে যাও! নিজেকে কী ভাব তুমি? তোমাকে বাবা মা ভয় পেতে পারে আমি পাই না। তুমি ওসব নিয়ে চলে যাও।

—কী বললি! বলে কাকা তড়পাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌধুরীর মুখটা তেমন খোলে না। কথা হারিয়ে যায়। মদ খেলে হুড় হুড় করে কথা আসে। তবু কাকা তোতলাতে তোতলাতে বলে—তোর বাড়ি যে বের করে দিবি? আমার দাদার বাড়ি—

রান্নঘর থেকে মা উঠে এসে দু'জনের মাঝখানে পড়ে। তড়িৎ চৌধুরীর পিঠে হাত রেখে বলে—এই ঠাকুরপো, আমি তোলা উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। শ্যামা, তোর না আজ কমলাদের বাসায় যাওয়ার কথা! যা, ঘুরে আয়।

—যখন সময় হবে যাব। তুমি কাকাকে চলে যেতে বল।

—ছিঃ, কী সব বলছিস!

তড়িৎ চৌধুরী স্তিমিত গলায় বলে—শুনছেন বৌদি, শ্যামার কথা। সেই ছোট্ট নরম সরম শ্যামা আর নেই। আজকাল ভোটটোট দেয়, বয়স্থা হয়েছে—বলে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করে কাকা।

—হয়েছিই তো। বেঁচে থাকলে সকলেরই বয়স হয়। একমাত্র তোমারই বয়সবুদ্ধি হয় না। কোন্ আক্কেলে তুমি রাস্তার লোকের কাছে নয়নের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা বললে? আমি তোমার ভাইঝি না? ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে, কে বলেছে তোমাকে যে নয়নের সঙ্গে আমার ভাব?

—চুপ কর শ্যামা। মা ধমক দেয়।

কিন্তু শ্যামার চুপ করার মত অবস্থা নয়। তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে মার দিকে চেয়ে বলে—তুমি জানো না, এ সবই নয়নের কারসাজি। এ জিনিসপত্র এ সবই নয়ন পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস কর।

—নয়ন! ভারী অবাক হয় কাকা—নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্ক

কী? কী যা তা বলছিস।

—ঠিকই বলছি। তুমি চলে যাও।

মা কাকার পিঠে হাত রেখে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে—ও পাগল মেয়ে। তুমি চল তো ঠাক্‌রপো, কী কথা বলবে বলছিলে যে!

একা ঘরে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃঝুম।

গোলমাল শুনে বাবা উঠে এসেছিল। আবার ফিরে গিয়ে একটা প্রেসারের ট্যাবলেট খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। বাড়িটা আবার চুপচাপ হয়ে যায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।

শ্যামার জানালার পাশেই বাড়িতে মেথর আসবার গলি। সেইখানে বসে কাকা মুর্গী কাটল। ধুতী পাঞ্জাবি ছেড়ে গামছা পরে নিয়েছে। মুর্গীটার 'কঁ-কঁ' ডাক , তারপরই ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় শ্যামা।

গলিমুখে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মা কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

—শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে তো দেরী আছে? মা জিজ্ঞেস করে।

—দেরী কি! আজকাল একমাস অশৌচ আর কে মানছে? গতকালই শ্রাদ্ধ চুকে গেল। পনেরো দিনে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—তা উকিলবাবু রেখে-টেখে গেল কেমন?

—পাঁচ সাত লাখ তো শুনেছি সাদা টাকাই। পাঁচটা ইন্সিওরেন্স থেকে আরো লাখ দুই পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের লকার-টকার তো এখনও খোলাই হয় নি, বাড়িতে স্টীলের আলমারিতেও না হোক আরো দু'আড়াই লাখ পড়ে আছে। দুঁদে উকিল ছিল. দু'হাতে লুটেছে। দু'খানা বাড়ি—

এরপর মার গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায়।

চোখ জ্বালা। বুকে একটা ভয় বেড়ালের থাবার মতো আলতো বসে আছে। শ্যামা সামান্য সেজে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে অন্যমনস্ক ভাবে বসে থাকা বাবাকে কেবল বলে গেল—বাবা, কমলাদির বাড়ি যাচ্ছি। এ বেলা ফিরব না!

—হুঁ।

বাইরে আজ শীতের বাতাস দিচ্ছে। তার সঙ্গে নরম রোদ। পার্কটা হেঁটে পার হতে ভারী ভাল লাগছিল শ্যামার। বড় রাস্তায় এসে ফাঁকা

ট্রামে উঠে বসল।

কমলাদি দরজা খুলেই বলে—কত দেরী করলি। সকালে আসার কথা ছিল। তোর শঙ্করদা তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র আড্ডা দিতে বেরোল। আয়।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে চাপানো প্রেসার কুকার। মাংসের গন্ধে ভুর-ভুর করছে চারদিক। ঘরের মধ্যে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে শ্যামা। খাট পালং, আলমারী, টেলিফোন সব সুন্দর সাজানো। বেশ আছে ওরা। বাড়িটা ঠাণ্ডা, শান্ত, ভালবাসার চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো।

—শ্যামা, মাংসটা চেখে যা! কমলাদি ডাকে।

—যাই।

রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসে শ্যামা। টুকটাক নানা কথা হতে থাকে!

—ঝাল বড্ড কম দিয়েছ। পানসে!

—কী করি বল! ওর যে গ্যাসট্রিক। অনেকটা আদাবাটা দিয়েছি।

—তোমাদের বড্ড সাহেবী রান্না!

—ওর তো এরকমই পছন্দ, সেদ্ধ, নির্ঝাল। আমি মাঝে মাঝে আলাদা ঝাল গরগরে করে রেঁধে নিই। কিন্তু রোজ তো ইচ্ছে করে না, তাই আমারও কেমন এইসব বিস্বাদ রান্নাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে পার্সোনালিটি থাকে না, জানিস! কর বিয়ে, বুঝবি।

শ্যামা ঠোঁট ওল্টায়—বয়ে গেছে বিয়ে করতে। চাকরি খুঁজছি।

—খোঁজ। চাকরি করলে আরো ভাল বিয়ে হবে। আজকাল সবাই চাকরে মেয়ে চায়।

—ইস্, বিয়ে করলে চাকরি করতে বয়ে গেছে।

—ও কথা বলিস না। আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চলে নাকি। চললেও শখ-শৌখীনতা কিছু করা যায় না। আমারই মাঝে মাঝে চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

—আমার ভাল লাগে না। বিয়ে করলে হাত পা ছড়িয়ে সংসার করব—সেই ভাল। বৌকে সুখে রাখতে পারে না যে মানুষ, তাকে বিয়েই করব না।

কমলাদি কপির ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বলে—ভাগ্যিস তোর তবে

সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। শুনেছি লোকের দানে তার দিন চলে। কী অবস্থা হত তোর!

শ্যামার বুকের ভিতর কোথায় যেন যন্ত্রপাতি নড়াচড়া শুরু করে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। ভারী ঝামেলা। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না সে। উঠে গিয়ে বেসিনে হাত মুখ ধোয়।

শঙ্করদা দুপুর পার করে ফিরল। হাসি ঠাট্টায় খাওয়ার পাট চুকতে গড়িয়ে গেল বেলা। তিনজনে ফিস খেলল খানিকক্ষণ। তারপর গড়াল। খাটে কমলাদি আর শ্যামা, ইজিচেয়ারে শঙ্করদা।

শ্যামা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলে—শঙ্করদা!

—উঁ।

—আমার একটা চাকরি দরকার।

—কেন?

—খুব দরকার।

সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা সিগারেট লম্বালম্বি ঠুকতে ঠুকতে শঙ্করদা বলে—বিয়ের পর চাকরি কোরো, ডেগমাস্টারী।

—বিয়ে করব না।

—কে বলল করবে না।

—আমিই বলছি।

—কিন্তু তোমার জন্য একটা পাত্র যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি আজকালের মধ্যেই কথাটা পাড়তে তোমাদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা।

শ্যামা একটু হাসে, চোখ দুটো দুই আঙুলে চেপে রেখে বলে—এক পাত্রপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে সকালেই কাকা এসেছে।

—পাত্র কী করে?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে—কিছু করে না। বাপ বড়লোক ছিল, মরেছে, ফলে ছেলে এখন বড়লোক হয়েছে। বয়সে ছোট, জাতও এক নয়।

—সে কী! শঙ্করদা চমকে বলে—এ কেমন বিয়ের প্রস্তাব তোমার কাকা আনলেন?

কমলাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পিঠের তলা থেকে নিজের আঁচলটা ছাড়িয়ে এনে শ্যামা পাশ ফিরে বলে—আপনার পাত্রটি কেমন শুনি!

শঙ্করদা শ্যামার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে—এ পাত্র ভালই। আমাদের বন্ধুর মত তবে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ইঞ্জিনীয়ার। মুস্কিল হচ্ছে কিছু দাবী-দাওয়া করবে। হাজার তিনেক নগদ।

শ্যামা চোখ বুজে নিঃঝুম পড়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে—তার চেয়ে চাকরিটাই ভাল লাগবে আমার। বিয়েটা থাক।

শঙ্করদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, মাথা হেলিয়ে শ্যামার দিকে চেয়ে। তারপর বলে—শ্যামা।

—উঁ।

—একটা সত্যিকথা বলবে?

—কী?

—তুমি কাউকে ভালবাস।

—দূর।

—বাস, কিন্তু কোন কারণে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। হয়তো সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি কিনা বল।

—না।

—তবে ফ্যাক্টটা কী?

—কিছু না।

—সেই সন্ন্যাসী ডাক্তারকেই তোমার পছন্দ নয় তো শ্যামা। ভেবে দেখ।

আবার সেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া। তার শরীরের ভিতরে একটা লিভার ওঠে নামে, হুইল ঘোরে, ধক্ ধক্ করে স্টার্ট নেয় ইঞ্জিন। শ্যামা তার কেঁপে-ওঠা হাত আঁচলে ঢাকে, বালিশে মুখ লুকোয়।

—কী হল?

—কিছু না।

শঙ্করদা নীরবে সিগারেট খায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে—আমি এর মধ্যে আরো ভাল করে খোঁজ নিয়েছি শ্যামা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তুমি সেই সন্ন্যাসীর ঘর করতে পারবে না সত্যিই।

শ্যামা চুপ করে থাকে।

শঙ্করদা বলে—তার বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। লোকের দেওয়া জিনিসে তার সংসার চলবে, তার ধারণা লোকের সেবা করে মানুষের

অযাচিত দান পাওয়াই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত! সে তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টাও করবে না। প্রতিদিন তোমার রাত ভোর হবে হাঁড়ির চিন্তায়, ভিক্ষায় চলবে পেট। স্বামীর সঙ্গও পাবে না তুমি। সে লোকটা উদয়াস্ত যাজন করে বেড়ায়, ছ'মাস ন'মাস বাইরে বাইরে ঘোরে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে একটু—এমন স্বভাব নয়। তার জীবনে উন্নতি নেই, প্রমোশন নেই, ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্ল্যাক মানি—কিছু নেই। তার কাছ থেকে কোনও উপহারও কোনদিন পাবে কিনা সন্দেহ। ফুল্লরার বারোমাসের গীত হবে তোমার শ্লোগান। পারবে শ্যামা?

শ্যামার চোখভরে জল আসে। কিছু বলে না।

শঙ্করদা মাথা নেড়ে বলে—পারবে না। ওরকম জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে? যার গতি হয় না সে হয়তো নেবে, কিন্তু তুমি নেবে কেন? আজকালকার মেয়ে তুমি, তোমার এতটা সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়! থাকলে বুঝব তুমি বোকা।

হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প মেসিনের মত ঝলকে ঝলকে জল তুলে আনছে চোখে। বুকটা ব্যথা করে। আস্তে আস্তে কান্নায় শরীরটা কেঁপে ওঠে। পারবে না শ্যামা। জানে, পারবে না। ঐ জীবন তার নয়। তবু সেই দূরবর্তী মানুষটার ছবি কেন ছুঁয়ে থাকে তাকে।

শঙ্করদা মৃদু গলায় বলে—আমি অনেক ভেবেছি। মানুষটাকে আমারও বড় ভাল লাগে শ্যামা। লোকটা আমাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে আমি এক সময়ে ওর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কমলা দিল না। বলল—যদি ওর মতই তোমারও অবস্থা হয়। সেটা অবশ্য হত না। ওদের আশ্রমের অনেক লোকই ভাল কাজকর্ম করে, বড় চাকরি করে, সংসারও করে। দীক্ষা নিতে ভয় পেলাম। তুমি কেঁদ না, সব শুনে যদি রাজি থাক, তবে বল ওর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

শ্যামা সময় নিয়ে সামলে উঠে বসল। তারপর মাথা নেড়ে বলে—না শঙ্করদা। ঐ জীবন আমি পারব না।

—আমিও তাই বলি। তাহলে ইঞ্জিনিয়ারের সম্বন্ধটা করব কি শ্যামা? তুমি মত দিলে সামনের রবিবার তোমাকে ওরা দেখতে যাবে।

শ্যামা নিজের কোলে মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বিকেলের দিকে কমলাদিকে ঠেলে তোলে শঙ্করদা—এই, চা করবে না?

—আমি করছি। বলে শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল যখন তখনই টেলিফোনের রিং শুনতে পেল। সারাদিন আজ টেলিফোনটা বাজে নি। শব্দটা তাই নতুন লাগল শ্যামার কাছে। হঠাৎ দমকলের আওয়াজের মত। নিশুতরাতে বুক কেঁপে ওঠে।

শঙ্করদা চেঁচিয়ে বলল—শ্যামা, তোমার ফোন।

একটু চমকায় শ্যামা। নয়ন নয় তো।

নয়নই। টেলিফোন তুলেই শ্যামা মিষ্টি একটা পাখীর ডাক শোনে। তারপরই নয়ন বলে—শ্যামা।

—বলছি।

—কী করছ?

—কিছু না।

—একটা জিনিস শোন।

—কী?

—শোন না। কান পেতে থাক।

শ্যামা কান পাতল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না তারপর একটা শ্বাস ছাড়ার মত বাতাসের শব্দ হয়।

—শুনেছ।

—কিসের শব্দ?

—সেই সাপটা!

শ্যামা হিম হয়ে যায়।

—শ্যামা!

—বল।

—সাপটার দাঁত উঠেছে। আজ সকালে দেখলাম, ছোট্ট হুলের মত দেখা যাচ্ছে।

শ্যামা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—সেটা আমাকে বলে কী হবে?

—ইনফর্মেশনটা দিয়ে রাখলাম।

—আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি—

—ছেড় না। তাহলে আবার ফোন করব! তোমার দিদি জামাইবাবুর কাছে তোমার তাহলে প্রেষ্টিজ থাকবে না।

—কী বলতে চাও বল।

—আমার বাঁ হাতে টেলিফোন, ডান হাতে সাপের গলা ধরে আছি। ওটা বিড়ে পাকিয়ে আমার কোলে পড়ে আছে। খুব রেগে আছে ইদানীং। দিনরাত আমি খোঁচাই। ঘুম থেকে টেনে তুলি। খেলা করি! কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র ও আমাকে কামড়াবে। এক্ষুণি কামড়াতে পারে। পাকা ম্যাচিওরড্ গোখরো। বিষের থলি ভরভরন্ত—বুঝলে?

শ্যামার হাত কাঁপতে থাকে। বলে—বুঝেছি।

নয়ন বলল—তোমার কাকা একটা খবর দিয়ে গেল এই মাত্র।

—কী খবর?

—তোমার মা বাবা রাজি। কাকা রাজি করিয়েছে। তাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম।

শ্যামা আস্তে করে বলে—তাতে কী হল?

—কিছুই না শ্যামা, তুমি রাজি না হলে কিছুই না। আমি জানি। তবে তোমার বাবার মত পাওয়া গেছে—সেটাও কম কথা নয়। তুমি ভয় পেয়েছিলে!

—আমি রাজি নই।

—তোমাকে রাজি করানোর জনাই এই টেলিফোন। শ্যামা, তুমি রাজি না হলে আমি আমার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করে দেব। সাপটা তৈরী আছে। এখন ভেবেচিন্তে বল। আমি ইয়ার্কী করছি না।

—নয়ন! আত্মবিস্মৃতের মত নামটা উচ্চারণ করে শ্যামা। এতক্ষণ নামটা উচ্চারণ করে নি পাছে কমলাদি আর শঙ্করদা জেনে ফেলে।

নয়ন ধীর গলায় বলে—বল শ্যামা, শুনছি।

—তুমি কি পাগল?

—হতেও পারি। আমি যে কী তা ভেবে পাই না। তবে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না শ্যামা, অপেক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি সেদিন একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলে। সেই থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি এক্ষুণি জানতে চাই। বল।

—তা হয় না।

—তবে ছেড়ে দিই?

—আঃ নয়ন।

ওপাশে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। তারপর রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ।

শ্যামা খুব সাবধানে টেলিফোনটা রাখল। তারপর টেবিলটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—কী হয়েছে রে? বিছানা ছেড়ে কমলাদি উঠে আসে।

—ওকে বোধ হয় সাপে কামড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে শ্যামা।

—কাকে?

—নয়নকে।

—সে কী! কী বলছিস যা তা?

—কী জানি! শ্যামা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে চারদিকে টালুমালু চেয়ে বলে—ইয়ার্কীও হতে পারে!

—তুই এদিকে আয় তো, বিছানায় বোস। ওগো, তুমি পাখাটা আস্তে করে ছেড়ে দাও তো!

ইয়ার্কীই। সাপের শব্দটা টেলিফোনে হুবহু নকল করেছিল নয়ন। শ্যামাকে টেলিফোন করার সময়ে সাপটা তার কাছেই ছিল না।

গতরাতে নয়ন দশটা সোনেরিল খেয়েছিল গুণে গুণে। ঘুম আসে নি। ইম্‌মিউনিটি এসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সব ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অবিরল জেগে থাকবে নয়ন, একটা অস্পষ্ট ভয় বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

কাল রাতে একটা ব্যাঙকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের ছুঁচের খোঁচায় আধমরা করে সাপটাকে খেতে দিয়েছিল নয়ন। খুব খিদে ছিল ওটার। যখন মুখটা তুলে ব্যাঙটাকে ধরল, তখনই নয়ন লক্ষ্য করে সাপটার সামনের দুটো দাঁত হুলের মত জেগে উঠেছে। আগে লক্ষ্য করে নি সে। লক্ষ্য করে গাটা একটু শিরশির করেছিল তার! নয়নের সব অত্যাচারের কথা ও কি মনে রেখেছে? কে জানে! ঝাঁপিটা সাবধানে আবার চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে

সে। খোলে নি।

শ্যামা রাজি হল না। হবে না। জানত নয়ন। দিন আর রাতের দুজন নার্স মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে নয়ন। উপহার দেয়। সুন্দর সব কথা বলে। ভাড়াটে মেয়েদের কাছেও ঘুরে এসেছে সে এর মধ্যে কয়েকবার। কিন্তু জুড়োয় না। কিছুতেই জুড়োয় না নয়ন। শরীরের মধ্যে কী একটা তার নেই! সে কি ক্লোরোফিল? ভিটামিন? ক্যালসিয়াম? ফেলে-রাখা মেটেরিয়ামেডিকা, অ্যানাটমির বই খুলে খুলে জেগে দেখে সে। কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে ভাবে, সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা মোনাকোতে চলে যাবে। সেখানে সারারাত ফুর্তি করার অঢেল জায়গা। মদ খাবে, নাচবে, জুয়া খেলবে, মেয়েছেলে পাল্টে দেখবে রোজ। বিদেশে সারারাত শহর জেগে থাকে। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে না সে।

কয়েকদিন বাইরে ঘুরে আসে সে। তার ঘরে এসে এক গভীর রাতে সাপের ঝুঁড়ির ঢাকনাটা খোলে।

প্রস্তুত ছিল না নয়ন। অপ্রত্যাশিত সাপটা ঝাঁপির ঢাকনা খোলা মাত্র লক্ লক্ করে জেগে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছে কি যে ও এখন সশস্ত্র! একটা চকিত লাফে সরে যায় নয়ন। সাপটা শরীর ক্রমশঃ উঁচু থেকে উঁচুতে তুলে ধরতে থাকে। নয়নের বুক সমান উঁচু তার তীব্র ফণা। মিটমিটে চোখে নয়নের চোখ আটকে রাখে মায়াবী সম্মোহনে কিছুক্ষণ। তার শিকরের মত চেরা জিভ দ্রুত নড়তে থাকে। অসম্ভব ফোঁস ফোঁসানীতে ভরে যায় ঘর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়ন। তারপর ধীরে ধীরে সাহসভরে অভ্যাসবশতঃ সে তার দস্তানা-পরা হাতটা এগিয়ে দেয়।

আক্রমণ। প্রতি আক্রমণ। নয়নই জেতে। এক সময়ে ছোবল দেওয়ার মুখে ধরে ফেলে ঘাড়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে হাসে। ধীরে ধীরে ঝাঁপির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় সাপটাকে। দস্তানা খুলে সিগারেট ধরায়। বিছানায় বসে থাকে জেগে। সারা রাত। কখনও বা মুঠো মুঠো সোনেরিল খেয়ে দেখে। বৃথা।

একদিন শ্যামার কাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল নয়ন, শ্যামার বিয়ের কথা চলছে।

নয়ন উদাস গলায় বলে—কার সঙ্গে?

—খবর পাই-নি। তবে এক পার্টি ওকে দেখে পছন্দ করে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। কিছু একটা করা উচিত, তার মনে হয়। কিন্তু বড় গভীর ক্লান্তি তার আজকাল।

মাঝে মাঝে এমন হয়, পুরোনো ব্র্যাণ্ডের সিগারেটটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়ে ব্র্যাণ্ডটা পাল্টে নেয়। তেমনই কিছু একটা ভাবল নয়ন, ব্র্যাণ্ডটা পাল্টে নেবে কিনা। তারপর আর সেই ভাবনাটাও রইল না। সম্পূর্ণ শূন্য মাথায় সে বসে রইল।

সে বুঝতে পারে, শ্যামা নয়, কিছু নয়, একটু ঘুম ছাড়া সে আর কি চায় না।

সাপটাকে জগদীশের কাছে দিয়ে আসবে, ভেবেছিল! কিন্তু দিল না নয়ন। রেখে দিল। থাক। সে আজকাল ইঞ্জেকশন নেয় নিজে নিজে। তারপর ঘুমোয়। একদিন যখন ইঞ্জেকশনের ক্রিয়াও কমে আসবে তখন সেই ভয়াবহ রাত্রিগুলোতে কে জেগে থাকবে তার সঙ্গে? তখন ভয়ঙ্কর ঐ দাঁতওলা সাপটাকেই জাগাবে সে।

কে জানে ওর দাঁতেই শেষ ঘুমের ওষুধটা রয়ে গেছে কিনা!

সমাপ্ত